সময়ের উপকরণ : মেয়েদের স্মৃতিকথা

চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়)

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

Samayer Upakaran : Meyeder Smritikatha
by Dr. Chitrita Bandyopadhyay (Roy)

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০০

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
অক্ষর লেজার
১০ বৃন্দাবন বোস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা-৭০০ ০০৪

আমার

মা কে

সূচি

নির্বাচিত পঞ্চাশ বছর—কি এবং কেন?

স্বাধীনতা ও দেশভাগকে মাঝখানে রেখে পঞ্চাশ বছরের পরিবর্তমান কালপর্বে রাজনৈতিক এবং আর্থ সামাজিক টানাপোড়েনের মধ্যে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া, পথ চলার ইতিহাসেরই খোঁজ আমার গবেষণা নিবন্ধ। অন্তঃপুরের দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসা, নতুন যুগের নতুন ভাবনার স্পর্শে সমস্ত বাধা দুহাতে ঠেলে সরিয়ে, পায়ের নীচের শক্ত মাটিতে দুটি পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েরাই তো এ যুগের মেয়ে। বিশ শতকের নব্য পৃথিবীর নতুন অধিবাসী তারা। শতাব্দীর শুরু থেকেই আরম্ভ হয়েছিল তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মানবতার স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা। নারীর মানসিক উত্তরণের ইতিহাস, আত্ম-মূল্যায়নের দলিল—তার লেখা আত্মকথা-স্মৃতিকথা।

এখন প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে মেয়েদের লেখা আত্মকথা এবং স্মৃতিকথাই কেন আমি গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিলাম? আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পুরুষদের থেকে অনেক আলাদা। পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে মেয়েরা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। উনিশ শতকে ব্রাহ্ম সমাজের উদার পরিমণ্ডলে স্বামী, পিতা বা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয়ের সাহায্যে অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে বা কখনো বাইরে বেরিয়ে নিরাপদ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মেয়েরা। মেয়েদের জগতটি তাই পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র। তার জীবনযাত্রার ধরন, মূল্যবোধ এবং ভাবনাও স্বতন্ত্র। তাদের লেখার মধ্যে থেকে উঠে আসে সমাজ জীবনের এক অন্তর্গত ইতিহাস। আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, মেয়েদের যখন লেখাপড়ার সঙ্গে সদ্য পরিচিতি, সেসময়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনীটির রচয়িতা একজন মহিলা—রাসসুন্দরী (প্রকাশকাল—১৮৬৬)। সেদিক থেকেও বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের লেখা আত্মকথা-স্মৃতিকথার একটি বিশেষ মূল্য আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, সময় নির্বাচন নিয়ে। ১৯৩০ই বা কেন? কেন তার আগে বা পরে নয়। এখানে বলতে হয় যে, ১৯৩০ সালটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ শতকের সূচনাতেই শুরু হল বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। গড়ে উঠল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন—চিন্তাশীল বিদগ্ধ বাঙালি এগিয়ে এলেন আন্দোলনের সমর্থনে, পালিত হল হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের রাখীবন্ধন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে অরন্ধন। এই আন্দোলনে সংযুক্ত পুরুষের সহযোগী রূপে এগিয়ে এল মেয়েরা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গান্ধীজীর অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন। রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কার বিরোধী আন্দোলন এবং সমাজ পুনর্গঠনের কাজও তিনি শুরু করেছিলেন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে এবং অহিংসা অসহযোগের পথে মেয়েদের তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশের দশক থেকে যে আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছিল, ত্রিশের দশকে তার ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। ত্রিশের শুরু থেকেই লবণ করের বিরুদ্ধে শুরু হয় লবণ আইন আন্দোলন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা গ্রেপ্তার হলে, বেরিয়ে এল মেয়েরা। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে

মেয়েরা সেই আরব্ধ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার পথে এগিয়ে এল। স্বাধীনতার প্রয়োজনে মেয়েদের কাছে গান্ধীজীর সাহায্যের আহ্বান সার্থক রূপ নিল ত্রিশের লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে। সর্বভারতীয় মেয়েদের পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার মেয়েরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বেরিয়ে এল। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের পথ তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলল। সমাজের সর্বস্তরের সমস্ত বয়সের মেয়েরাই ঘর ছেড়ে পথে নামল। রক্ষণশীল হিন্দু বিধবারাও হাজার সংস্কারের নিগড় ভেঙে আন্দোলনে সামিল হয়েছে, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগের ডাকই নয়, সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিপদ সঙ্কুল পথেও এগিয়ে যেতে লাগল একটি দুটি করে মেয়েরা। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় থেকেই মূলত মেয়েদেরই আগ্রহে মাস্টারদা সূর্য সেন বাধ্য হচ্ছেন প্রত্যক্ষ বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা ভাবতে। এর আগেও মেয়েরা ছিল কিন্তু সহযোগী রূপে, সাহায্যকারীর ভূমিকায়। ত্রিশের দশক থেকেই স্কুল-কলেজে পড়া কিশোরী তরুণীরা বিপদকে তুচ্ছ করে পলাতক গোপন জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা মেনে নিয়েই এগিয়ে আসতে লাগল। সাইকেল চালানো, সাঁতার শেখা ও অন্যান্য শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেদের সেই পথের উপযোগী করে তুলতে লাগল। এই সময় থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে মেয়েদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের এবং একক অভিযানের একের পর এক ঘটনা ঘটতে লাগল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং কল্পনা দত্তের লেখা থেকে জানা যায়, বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত পুরুষদের দ্বিধা ছিল মেয়েদের এই পথে নিয়ে আসায়। প্রথমে তাঁরা কিছুতেই মেয়েদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে চাননি। ক্রমশ শিক্ষিত নির্ভীক মেয়েদের প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি তাদের নতিস্বীকার করতে বাধ্য করেছে। অবশ্য এর আগে বিভিন্ন যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে মেয়েদের, শরীরচর্চার মাধ্যমে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হয়েছে। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পারিবারিক নিরাপত্তার আশ্রয় তারা ছেড়েছে নির্দ্বিধায়। সমস্ত পিছুটান, স্নেহের বন্ধন অস্বীকার করে গ্রহণ করেছে অনিশ্চয়তার জীবন। প্রয়োজনে জীবন দিয়ে সে প্রমাণ করেছে, দেশের প্রয়োজনে মেয়েরা নিজেদের জীবন দিতেও পিছপা নয়। প্রীতিলতা ইউরোপীয়ান ক্লাব অভিযানের পর সমস্ত সঙ্গীদের নিরাপদে পাঠিয়ে নিজে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছিলেন। তাঁর লেখায় প্রীতিলতা বলেছেন, নিজের জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মেয়েরা আর কোনভাবেই নিজেদের পিছনে ফেলে রাখবে না। নিজের যোগ্যতায় সহযোদ্ধা পুরুষ বিপ্লবীর সমস্থানটি অধিকার করে নেবে। দেশ তাদের আহ্বান জানাচ্ছে আর তাদের পিছিয়ে থাকার সময় নেই। প্রীতিলতা, কল্পনা দত্তের পর এই পথে এগিয়ে এসেছে একের পর এক মেয়েরা। নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে, প্রাণের বিনিময়ে, রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থাপন করেছে একের পর এক মাইলস্টোন। জাতীয় আন্দোলনের এই দুটি প্রধান পথ ছাড়াও মার্কস্‌বাদ প্রভাবিত কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং তাদের পরিচালিত প্রগতি আন্দোলন, সমাজ বদলের আন্দোলনেও যুক্ত হয়ে পড়েছে মেয়েরা। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ঘরের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের বন্ধন, স্নেহের বন্ধন—মেয়ে হিসেবে শারীরিক এবং মানসিক সীমাবদ্ধতাও তারা অতিক্রম করেছে। সামগ্রিকভাবে বাঙালি মেয়েদের জন্য নিষিদ্ধ জগতের

দ্বারোদঘাটন সম্ভব হয়েছে এই ত্রিশের দশক থেকেই। সমাজ এবং জীবনের সংক্ষেত্রেই একটি মুক্তির জোয়ার এসেছিল তখন।

অন্তঃপুরের অর্গলমুক্তির যে সাধনা শুরু হয়েছিল উনিশ শতক থেকে, তারই সার্থক রূপ লক্ষ্য করা যায় ত্রিশের দশকে। গত শতাব্দীতে শিক্ষিত পুরুষের চেষ্টায় মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে। সংস্কারপন্থী নব্যশিক্ষিত পুরুষ পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে বাইরের পৃথিবীতে মেয়েদের পরিচিত করে তুলেছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে মেয়েরা। ১৮৭৬-এ কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়) এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছেন, পরের বছর চন্দ্রমুখী বসু এবং এরপর একটি দুটি করে মেয়েরা এগিয়ে আসতে লাগল শিক্ষাজগতে। উচ্চশিক্ষার দরজাও বহু চেষ্টায় খুলে গেল মেয়েদের সামনে। মেয়েরা চাকরি করতেও শুরু করেছে। তবে উচ্চশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মেয়েদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই মুষ্টিমেয়। সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে এদের তেমন যোগ ছিল না। উনিশ শতকের শেষার্ধে দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা প্রায়ই অবিবাহিত থাকছে অথবা বেশি বয়সে বিয়ে করছে এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিয়ের পর কর্মক্ষেত্র থেকে সংসারে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়েদের পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব হচ্ছে না। স্বাধীন জীবিকাই সম্ভবত তাদের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেছে—বিশেষত বিয়ের ক্ষেত্রে, যৌথ জীবনের ক্ষেত্রে। সমকালীন শিক্ষিত মেয়েদের মানসিকতাও এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা সভা সমিতিতে যাচ্ছে, স্বামী নির্বাচনের অধিকার চাইছে অথচ সার্বিক স্বাধীনতার ধারণা তাদের অত্যন্ত অস্বচ্ছ। গোলাম মুর্শিদের মতে, "তাঁরা চিরকালীন দাসত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন কিন্তু একমাত্র অবরোধ মোচনকেই মুক্তির প্রধান উপায় বলে গণ্য করেন।"[১] মেয়েদের জন্য কিছু কিছু নির্দিষ্ট জীবিকা, শিক্ষকতা বা চিকিৎসক হওয়া ছাড়া আর কিছু তাঁরা ভাবছেন না। সবেতনে পুরুষের সঙ্গে অফিসে চাকরি নেওয়ার কথাও তাঁরা ভাবতে পারছেন না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন সে উপলব্ধিতে তখনও তাঁরা পৌঁছান নি। সরলাদেবী চাকরি নিচ্ছেন (১৮৯৫) কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের জন্য নয়, পুরুষের মত আয় করবার সখে এবং কয়েক মাসের মধ্যে সেই সখ মিটে যাচ্ছে। বিনোদিনী সেনগুপ্ত (১৯০০) মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলছেন কিন্তু স্বামীর অবর্তমানে মেয়েদের প্রয়োজনের কথা ভেবে। একই কথা বলেছেন কৃষ্ণভাবিনী দাসও। 'সামাজিক মর্যাদা' এবং 'অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন'কে একে অপরের পরিপূরক ভাবার মত সচেতনতা তখনও তাঁদের মধ্যে আসেনি। বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে শিক্ষিত বাঙালি মেয়ের সংখ্যা যথেষ্ট এবং কর্মজীবী মহিলার সংখ্যাও কয়েকশত, তবুও সচেতনতা জাগছে না। তাঁরা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলছেন কিন্তু আর্থিক স্বাবলম্বনের কথা বলছেন না।

সমাজের আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরাও এ সম্পর্কে আশ্চর্যরকম নীরব অথবা বিরোধী। পাশ্চাত্য ভাবধারা পুষ্ট কৃষ্ণভাবিনী দাস পাশ্চাত্যে মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রশংসা করছেন অথচ এদেশে বাঙালি মেয়েদের জন্য তার প্রয়োজন স্বীকার করছেন না। তাঁরা

চার দেওয়ালের বাইরে বেরোতে চাইছেন কিন্তু ঐতিহ্য ও সংস্কারের পিছুটান ছাড়তে পারছেন না। অধিকাংশ শিক্ষিত এবং সচেতন মেয়েরাই তখন, 'ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী'। উনিশ শতকের মহিলা আত্মজীবনীকাররা প্রায় সকলেই দেশাচারের সমালোচনা করেছেন কিন্তু এর অলঙ্ঘনীয়তার কথাও বলেছেন। সমাজে বাস করে সামাজিক প্রথা অস্বীকার করা যে সম্ভব নয় একথা তাঁরা সকলেই বলেছেন। প্রথা ও সংস্কারের পিছুটান তাঁদের সমাজ নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে বেরোতে দেয়নি। শিক্ষা তাদের পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। আর তাদের স্বাধীনতা নিজেদের জীবন দিয়ে অর্জিত নয়, পুরুষের কাছে উপহার পাওয়া। ফলে এই স্বাধীনতায় যথার্থ সুফল পাওয়া সম্ভব হয়নি তাদের জীবনে।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও এই ধারারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিশ শতকের প্রথম থেকেই দ্রুত পরিবর্তমান সময়টি ছাপ ফেলে যায় সমাজ রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে। ১৯০৫ থেকে বঙ্গভঙ্গ তথা স্বাধীনতা আন্দোলন দেশে এক স্বতন্ত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। পরাধীন জাতির রাজনৈতিক চেতনার বলয়টি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। ক্রমপর্বিক বিকাশের ধারায় এগিয়ে চলতে শুরু করল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৬) পরোক্ষ অভিঘাত ছুঁয়ে গেল এদেশের সমাজ-অর্থনীতি—শুরু হল অর্থনৈতিক সংকট, বেকারী, মুদ্রাস্ফীতি। বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভও ক্রমশ বাড়তে লাগল। অহিংস ও সহিংস পথে একের পর এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল। আন্দোলনের পথে প্রয়োজন হল দেশের মেয়েদেরও। দেশের দ্রুত পরিবর্তমান প্রেক্ষাপট আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাশীল নারীর মনন এবং জীবনেও নিয়ে এসেছিল পরিবর্তনের জোয়ার। একটি দুটি করে মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরোতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষা, বাইরের জগতের সংস্পর্শ তৈরি করছিল সামাজিক দায়িত্ববোধ। সময়ের অভিঘাতে সামাজিক প্রয়োজনে এবং শিক্ষার কারণে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণের তাগিদও তাঁরা ক্রমশ অনুভব করছিলেন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলেছিল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে—তার দায় বহন করতে হচ্ছিল মেয়েদেরকেও।

আমাদের দেশের পটভূমিকায় মেয়েদের সামাজিক অবস্থা এবং অবস্থান পুরুষের থেকে অনেক আলাদা হলেও সময়ের অভিঘাত তাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে দিল না। তাদের মধ্যেও জেগে উঠল এক স্বতন্ত্র চেতনা। এই মেয়েরা মানসিকতায় অনেক এগিয়ে গেল গত শতাব্দীর পূর্বসূরীদের তুলনায়। শিক্ষা, সচেতনতা তাদের নতুনভাবে ভাবতে শেখাল, তাদের নিজেদের চেতনার জগতেই শুরু হল আত্মমূল্যায়ন, জেগে উঠল সমাজ মানুষের দায়বদ্ধতা। ক্রমশ জীবনের সবক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেল, খুঁজে নিল নিজেদের সঠিক অবস্থানটি। অহল্যার পাষাণমুক্তিতে সূচিত হল ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়—পরিবর্তিত সমাজ জীবনের অন্তর্গত প্রকোষ্ঠে। '৩০-র ধাক্কা মেয়েদের বাইরের জগতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে নিয়ে এল।

ত্রিশের দশকে ইতিহাসের যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল, ক্রমশ এগিয়ে চলতে লাগল

পরের পাঁচটি দশকের ঘটনাময়তায় পরিপুষ্ট হয়ে। এল একের পর এক ধাক্কা—স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা মত ও পথের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দেশ গঠনের মহান ব্রতে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যর্থতা। রাজনৈতিক মত-পার্থক্য ও ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও ক্ষোভ। এরই মধ্যে অর্ধশতাব্দী পরের আশির দশকের সূচনা—অগ্রগতির ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল।

পঞ্চাশ বছরের বিভিন্ন অভিঘাত, ত্রিশের দশকের নতুন পথ চলতে শুরু করা বাঙালি মেয়েকে বাস্তবের ধাক্কার পর ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে চুরে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ করে দিল। স্বাধীনতার পূর্বের দাঙ্গা ও মন্বন্তর সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল বাঙালি মেয়েদের জীবন এবং মূল্যবোধ, সংস্কার ও ভাবনায়। পোড় খাওয়া, ঠুনকো সম্মানের সংস্কার হারানো মেয়েগুলির জীবনদৃষ্টি বদলে গেল, শিখল জীবনের নতুন মন্ত্র। জগতের সঙ্গে তৈরি হল তাদের নতুন সম্পর্ক—অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য, দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য, পায়ের নীচের শক্ত মাটির জন্য তারা জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হল। এই নারী পুরুষের অনুগামী নয়, সহযাত্রী, কোথাও সে একা এবং অদ্বিতীয়। দেশভাগ এবং পরবর্তী ত্রিশ বছরের দেশগঠন এবং জীবনধারণের সংগ্রামে মেয়েরা পুরুষের সমানাধিকারে চলে এসেছে। তারা রাজনীতি করেছে, মানবাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে, নিজেদের এবং পরিবারের জন্য মুখের গ্রাস ছিনিয়ে এনেছে। অস্তিত্বের জন্য, টিকে থাকার জন্য লড়াই করেছে। সম্মানের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য গ্রহণ করেছে যে কোন ধরনের জীবিকা। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু-ছিন্নমূল মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনে শুরু হয় মেয়েদের বৃত্তিজীবিতা। সম্মানের সঙ্গে অর্থোপার্জনের জন্য লড়াই। অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে মেয়েদের জন্য জীবিকার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী হতে লাগল। অফিস ক্লাবে নাটক করতে শুরু করল, যাত্রা পালাতেও অভিনয় করতে লাগল তারা।

গণনাট্যে, স্বাধীনতা-উত্তর গ্রুপ থিয়েটারগুলিতে অনেক মেয়ে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল গ্রুপ থিয়েটারগুলি। বাংলা নাটকের একটি নতুন ধারা তৈরি হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক বৃত্তিজীবিতার প্রতিফলন দেখা গেল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। বাংলা মঞ্চ গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন পথ খুঁজে পেল।

১৯৩০—১৯৮০, এই পঞ্চাশ বছরের কালপর্বে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তমান গতি প্রভাবিত করেছে সমাজ এবং অর্থনীতিকে। আমাদের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা '৪৭-এর স্বাধীনতা এবং দেশভাগ। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুর চাপে ভেঙে পড়ল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি। সেই ধাক্কা বাঙালি মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে এনে ফেলল। সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল তাদের জীবন। ৫০-বছরের প্রথম পর্ব তাই '৪৭-র স্বাধীনতা পর্যন্ত। স্বাধীনতার পর তৈরি হল নতুন জাতীয় সরকার। দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তুর চাপ, স্বজন হারানোর ব্যথা সবই সত্যি, তবুও তো বহু আকাঙ্ক্ষার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর এল অনেক বেশি দায়িত্ব, অনেক কর্তব্য—দেশ গঠনের মহান দায়িত্ব, তৈরি হল জাতীয় সরকার কংগ্রেসের নেতৃত্বে।

পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হল রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শুরু হল স্বাধীন ভারতের পথচলা—গড়ে উঠল নতুন শাসনতন্ত্র, সংবিধান। আইনের চোখে স্বীকৃত হল নারী পুরুষের সমানাধিকার। ঘটনার চাপে বাস্তব ক্ষেত্রেও বদলে গেছে বাঙালি মেয়েদের জীবন-ভাবনা, মূল্যবোধ, জীবনযাপন পদ্ধতিও। মেয়েদের অধিকার রক্ষায় অনেকগুলি আইন পাশ হল। তবে সংবিধানে সমানাধিকারের স্বীকৃতি, অধিকার রক্ষামূলক আইন সত্যিই কতটা পরিবর্তন আনতে পারল মেয়েদের জীবনে। বন্ধ করতে পারল কি সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন, অবমাননা, লাঞ্ছনা? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের মূলগত পরিবর্তন কখনও সম্ভব হয় না। শিক্ষা, রাজনৈতিক সচেতনতা কিছু সংখ্যক মেয়েকে নতুন জীবনবোধে অভিষিক্ত করল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সংগঠিত হতে লাগল একের পর এক আন্দোলন—উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন, মানবাধিকার রক্ষায় আন্দোলন চলতে লাগল '৫০, '৬০-এর দশক জুড়ে, সমস্ত ক্ষেত্রেই মেয়েদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। দেশের দ্রুত পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ছাপ ফেলে ছিল মেয়েদের জীবনে। পঞ্চাশ-ষাটের সমস্ত আন্দোলনেই যুক্ত ছিল মেয়েরা। সমস্ত আন্দোলনে তারা সামিল হয়েছে, মিছিল করেছে, সমাবেশ করেছে, মেয়েদের সংগঠিত করে তোলার চেষ্টা করেছে। দুস্থ মেয়েদের জীবিকা সংস্থানের জন্য গড়ে তুলেছেন একের পর এক আন্দোলন। ষাটের দশক থেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও শুরু হল বিভিন্ন পরিবর্তন, অন্তর্কলহে ভাগ হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টি। নেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস দলও বিভক্ত হয়ে পড়ল। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গেও ছিল কংগ্রেস সরকার, তবে বিধান রায়ের মৃত্যুর পর থেকেই কংগ্রেস প্রশাসনের স্থিতিশীলতার উপর মানুষের আস্থা কমতে লাগল। নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হল বামপন্থী শরিক দলের যুক্তফ্রন্ট সরকার। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী ভেদে দুটি ভাগ হয়ে গেছে। বামপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামে পরিচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি সংসদীয় গণতন্ত্রে যাবার পর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও বিভিন্ন মতভেদ শুরু হল। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জোতদার এবং ভাগচাষীদের বিরোধ, কৃষকদের জমি বণ্টন প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনের পথ নিয়েও শুরু হয়ে যায় বিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-দের মধ্যে অতি বামমনস্করা কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু এই মতবাদ গৃহীত না হওয়ায় উগ্রপন্থীরা বহিষ্কৃত হয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে এবং '৫০-এর দশকের একদম শেষে গড়ে উঠল সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী এক পৃথক গোষ্ঠী, সি.পি.আই. (এম. এল.) নামে। এদের সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবনা, 'সত্তর দশক মুক্তির দশক'-এর আহ্বান আকৃষ্ট করল অস্থির যুবসমাজকে—কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীকে। প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দু চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে তারা এগিয়ে এল সমাজটাকে বদলে দিতে, বেছে নিল অনিশ্চয়তার গোপন জীবন, নিরাপত্তাহীনতা। '৭০-দশকে শুরু হল ঘরে-বাইরে মুক্তির যুদ্ধ। একদিকে '৬৯ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গেছে নকশালবাদীদের সংগ্রাম, অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তানে '৭১-এ শুরু

হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে বহু জীবনের বিনিময়ে স্বাধীন হল পূর্বপাকিস্তান। গঠিত হল ভাষার ভিত্তিতে এক নতুন রাষ্ট্র—বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গে যুব বিপ্লবীদের আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করতে লাগল প্রশাসন। অবশ্য নকশালপন্থীদের আন্দোলন পারস্পরিক মতভেদে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে, শিক্ষিত মেধাবী যুবক-যুবতীদের পাশাপাশি অতি সহজেই দলে ঢুকে পড়ল কিছু সমাজবিরোধী—শহরে নকশালদের নামে শুরু হল সন্ত্রাসের রাজত্ব। প্রশাসন প্রথম থেকেই তাদের বিরুদ্ধে, কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও তাদের সমর্থন জানায়নি। আর শেষপর্যন্ত নকশালবাদী আন্দোলন যখন শ্রেণী শত্রুর হত্যার নামে যথেচ্ছ ব্যক্তিহত্যায় পর্যবসিত হল—সাধারণ মানুষের সমর্থনও তারা হারাল। যদিও শহরে নকশাল আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের রাজনীতি, খুন-জখম-হত্যা, স্কুল-কলেজ পোড়ান, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য-র সঙ্গেই মানুষ পরিচিত ছিলেন। অবশ্য তাদের এই ধারণা গড়ে ওঠার মূলে ছিল প্রশাসনের বিশেষ কৌশল। তারা সুকৌশলে নকশাল আন্দোলনের এক ভিন্নতর ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। কংগ্রেস প্রশাসন, বামপন্থী বিরোধী পক্ষের সমর্থনে কঠোর হাতে দমন করলেন নকশালদের। '৭২-থেকেই স্তিমিত হয়ে পড়ল নকশালবাড়ি আন্দোলন, থামিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল দেশের এক সম্ভাবনাময় যুবশক্তি, একটি প্রজন্ম। যৌবন-তারুণ্য-কৈশোরই যে ছিল তখন অপরাধ। এইভাবে যে একটি প্রজন্মকে শেষ করে দেওয়া হল, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা আর সম্ভব হল না। সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হল যুবশক্তির মেরুদণ্ড। পরবর্তীকালে দেখা গেল বিপ্লবের পরিবর্তে আপোষের রাজনীতি, সুবিধাবাদের রাজনীতি, পাওয়ার রাজনীতি। তখন পুলিশী অত্যাচারে আক্ষরিক অর্থে অনেকের মেরুদণ্ড ভেঙেছে কিন্তু এদের দমন করতে গিয়ে ভেঙেছে জাতির মেরুদণ্ড। বিপ্লব করতে ভুলে গেছে বাঙালির পরবর্তী প্রজন্ম—ভুলে গেছে প্রতিবাদ করতে, স্বপ্ন দেখতে, আদর্শের জন্য ঝুঁকি নিতে। এখনকার রাজনীতি স্বার্থের খাতিরে রঙ বদলায়, মত বদলায়—আদর্শ-মূল্যবোধ কথাগুলি obsolete হয়ে গেছে। '৭০-এর বিপ্লবের পরিসমাপ্তি, নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে, উত্তর- স্বাধীনতা কালপর্বের আর একটি অধ্যায়। '৭২ থেকে '৮০—আট বছর নিয়ে হয়েছে আর একটি নতুন পর্ব।

রাষ্ট্রপতি শাসনের পর জরুরী অবস্থার অবসানে ১৯৭২ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কংগ্রেসী শাসন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বৈরাচারিতা, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন সমাজ ও অর্থনীতিতে। অব্যবহিত পূর্বের নিঃশেষিত যুব বিপ্লবীদের জায়গা নিয়েছে সমাজবিরোধীরা, শুরু হয়েছে 'মস্তানরাজ'। এই পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে কণ্ঠরোধ করা হয়। এরই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় '৭৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসী শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ থেকে, শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসনকালের, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। দীর্ঘ একুশ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে বামপন্থী ভাবধারার চরিত্র বদলেছে। তবে সেই ইতিহাস রচনা করতে গেলে আমাদের ভাবীকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। '৮০-এর সূচনাতেই আমাদের ৫০ বছরের সময়কালের সমাপ্তি। দীর্ঘ পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসনের স্বৈরাচারিতার পর

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে '৬০-এর দশকের পাঁচমিশেলী যুক্তফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে ফিরিয়ে এনেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) কে, সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রয়োজনে স্থায়ী সরকার গঠনের জন্য।

১৯৮০—সেই সন্ধিক্ষণ। জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বাঙালি মেয়েদের পথচলা অনেক স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে। আক্ষরিক অর্থে জীবনের সব ক্ষেত্রেই তখন তাদের অবাধ গতি। সামাজিক প্রয়োজনে, পারিবারিক দায় মেটাতে, দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক পুরুষের সঙ্গে একই তালে একই ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে এসেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার দূরধিগম্য ক্ষেত্রগুলিতেও। ১৯৩০-এ রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ধাক্কায় মেয়েরা নিজের শক্তিতে নিজের ক্ষমতায় ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, নিজেকে শরিক করে তুলেছিল সেই সংগ্রামের—অর্ধশতাব্দীর অভিঘাত, তাদের সম্পূর্ণরূপে বদলে দিল। জাতীয় আন্দোলনের আহ্বানে, স্বাধীনতা সংগ্রামে শরিক হয়ে যে পথচলা তাদের শুরু হয়ে ছিল, সেই 'চরৈবেতি'ই হয়ে উঠল তাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

১ গোলাম মুর্শিদ, "সংকোচের বিহ্বলতা", পৃঃ ৯৯।

ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এল

১৯৩০ (২৬ জানুয়ারি) : সারা দেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

(৫ এপ্রিল) : গান্ধীজী কর্তৃক ডাণ্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু।

(এপ্রিল) : কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘট।

(১৮ এপ্রিল) : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।

(মে) : সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ধরসানা লবণ গোলা দখল অভিযান।

(মে-জুন) : ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ইয়ং কমরেডস লীগ এর নেতৃত্বে জমিদার, তালুকদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের সম্মিলিত আন্দোলন।

(৭ জুন) : সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ।

(৮ ডিসেম্বর) : বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তিন বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্তের প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান।

১৯৩১ (২৬ জানুয়ারি) : কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য নারীপুরুষ নির্বিশেষে বিরাট মিছিল নিয়ে ময়দান অভিযান ও গ্রেপ্তার এবং শেষ পর্যন্ত দলিত পিষ্ট হয়ে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের পতাকা উত্তোলন।

(৪ মার্চ) : গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষর।

(২৪ মার্চ) : কানপুরে ভয়ানক হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা।

(৮ এপ্রিল) : মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট জেমস্ পেডি হত্যা।

(২২ জুলাই) : বোম্বাই-এর অস্থায়ী গভর্ণর আর্নেস্ট হটসনকে গুলি করেন ফার্গুসন কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র বলবন্ত গোগ্‌টে।

(১৪ ডিসেম্বর) : কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি.জি.বি. স্টিভেন্সকে হত্যা করেন কুমিল্লারই স্কুলের দুই ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।

১৯৩২ (৪ জানুয়ারি) : কংগ্রেস ও তার সমর্থক সমস্ত সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হল, গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(৬ ফেব্রুয়ারি) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সেনেট হলে গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন বীণা দাস।

১৯৩২ (৩০ এপ্রিল) মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রবার্ট ডগলাসকে হত্যা করেন বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

(২৪ সেপ্টেম্বর) : চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ।

(১৭ অক্টোবর) : মেদিনীপুরে প্রজা আন্দোলনের নেত্রী রাণী গুইদালো সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

১৯৩৩ (২ সেপ্টেম্বর) : মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বি. ই. জে. বার্জকে গুলিতে নিহত করেন মৃগেন দত্ত ও অনাথ পাঁজা।

: আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দীদের অনশন ধর্মঘট। সাধারণ মানুষ, ছাত্র যুবক সকলেই এই ধর্মঘটের সমর্থক ছিলেন।

১৯৩৪ (৮ মে) : দার্জিলিং-এ লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার গভর্ণর জন এন্ডারসনকে গুলি করেন অবনী ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জী। তাঁদের অন্য দুই সঙ্গী ছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার এবং মনোরঞ্জন ব্যানার্জী।

(মে) : গান্ধীজী এক বিবৃতিতে বিনা শর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এরপরই কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

(জুলাই) : কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বেআইনী ঘোষিত হয়।

(অক্টোবর) : (আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় কংগ্রেসী কিছু নেতা ও সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মায়। তাদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে আগ্রহী হন।) সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয় বোম্বাইতে। সেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত হয় 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি'।

১৯৩৫ : ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ শাসনের জন্য নতুন সংবিধান ঘোষণা করেন।

১৯৩৬ (জানুয়ারি) : কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মীরাট সম্মেলন। জয়প্রকাশ নারায়ণকে সম্পাদক করে একটি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠন তৈরির প্রস্তাব পাশ।

(এপ্রিল) : লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনের সময় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সম্মেলন থেকে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত কিষাণ সভা'।

১৯৩৬ (এপ্রিল) : লক্ষ্ণৌতে উত্তরপ্রদেশ ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গঠিত হয়।

: লক্ষ্ণৌতে মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে লেখকদের সম্মেলনে গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'।

(জুলাই) : প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ'।

: স্পেনের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জেনালের ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ ঘোষণা।

: ফ্রাঙ্কোকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত দিকেই সমর্থন জানায় হিটলার ও মুসোলিনী।

: ব্রিটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ থেকে সাহায্য করে।

: স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে দেশ-বিদেশের কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

: ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে রোমাঁ রল্যাঁ ও আঁরি বারবুসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধবিরোধী সঙ্ঘ।

(ডিসেম্বর) : ফৈজপুর কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু, জার্মানিতে ফ্যাসিজমের জয়লাভের পর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সচেতন করতে, সাম্রাজ্যবাদ রুখতে, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে এক শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গড়ার কথা বলেন।

(১৯৩৬-এর অধিবেশনেই নেহরু প্রথম গণসংযোগ ও কৃষকদের দাবীর প্রসঙ্গে কথা বলেন। যদিও 'নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য ও প্রজা সম্মেলন' স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৭-এ বোম্বাইতে, কিন্তু '৩৬ এর আগে পর্যন্ত এই সঙ্ঘ ছিল নিতান্ত নিষ্ক্রিয়।)

১৯৩৭ (২৬ ফেব্রুয়ারি— ১৩ মে) : ৭৪ দিনের বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট হয় বাংলাদেশের চটকলে।

(জুলাই) : নির্বাচনে জয়ী হয়ে এবং গভর্ণরের যথেষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ না করার প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কিছুদিন পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং আসামে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

: বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি।

(জুলাই) : আন্দামান সেলুলার জেলের বন্দীরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করে। তাদের সমর্থনে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৯৩৮		: সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।
১৯৩৯	(এপ্রিল)	: সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কংগ্রেসের মধ্যেই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পৃথক দল গড়ে তোলেন। তখন কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, বামপন্থী এবং সহজানন্দ প্রমুখ ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাম-সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে সুভাষচন্দ্র দল থেকে অপসারিত হন এবং ৬ বছরের জন্য কংগ্রেসের কোনো পদাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ হয়।
		: মুসলমান নারীরা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করেন।
১৯৪১	(২২ জুন)	: জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করায় বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে ফ্যাসিস্ট জনযুদ্ধ বলে ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি তখন যুদ্ধের বিরোধিতা না করার সিদ্ধান্ত নেয়।
১৯৪২	(জুলাই)	: কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।
	(৯ আগস্ট)	: অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে।
	(১৭ ডিসেম্বর)	: ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়ে তাম্রলিপ্তে জাতীয় সরকার গঠিত হয়।
১৯৪৩	(১৬-১৭ই জানুয়ারি)	: সুভাষচন্দ্র অন্তরীণ অবস্থায় কলকাতা থেকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে দেশত্যাগ করেন।
		: জার্মানিতে তিনি একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন।
	(ডিসেম্বর)	: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন।
		: বাংলাদেশে ভয়ানক মন্বন্তর হয়।
১৯৪৫	(মে)	: যুদ্ধাবিরতি।
১৯৪৬	(মে)	: 'রাণী ঝাঁসী ব্যাটেলিয়ান, প্রথম নারী সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনীতে।
	(২১ নভেম্বর)	: আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তির দাবীতে বিরাট মিছিল বের হয়। পুলিশের গুলিতে এক ছাত্রের মৃত্যুতে পরদিন সর্বব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল হয়।

১৯৪৬	(১০ ফেব্রুয়ারি)	:	আই. এন. এ. ক্যাপ্টেন রশিদ আলির বিচার এবং প্রতিবাদে কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট।
	(১৮ ফেব্রুয়ারি)	:	বোম্বাই ও করাচীর নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ।
	(২৯ জুলাই)	:	ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ভারত ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতাল পালন।
	(১৬ আগস্ট)	:	মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে কলকাতায় শুরু হয় এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
		:	এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে নোয়াখালিতে।
	(সেপ্টেম্বর)	:	বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা তেভাগা সংগ্রামের ডাক দেয়।
১৯৪৭	(২১ জানুয়ারি)	:	ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামেব সমর্থনে ভিয়েতনাম দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতায় বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশন।
	(১৪ আগস্ট)	:	মধ্যরাত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর।
	(১৫ আগস্ট)	:	ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক ডোমিনিয়ন গড়া হল, এবং খণ্ডিত ভারতবর্ষে এল পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।
		:	দেবদাসী প্রথা বন্ধ করার জন্য 'মাদ্রাজ দেবদাসী প্রিভেনশন অ্যান্ড ডেডিকেশন অ্যাক্ট' পাস হয়।

১

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভাবিত নতুন চিন্তা চেতনার অভিঘাত, উনিশ শতকে বাঙালির অন্তঃপুরের বন্ধ দুয়ারে ঘা মেরে খোলার কাজে লেগেছিল। অজ্ঞানতার চৌকাঠ পেরিয়ে একটি দুটি করে মেয়ে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছিল। সেই চেষ্টার নেপথ্যে রয়েছে অনেক যন্ত্রণা, অনেক সংগ্রাম। তবুও তারা চেষ্টা করেছিল অন্ধ কুসংস্কারের শক্ত নিগড়টিকে ভাঙতে। সহজেই তারা সফল হয়নি কিন্তু হালও ছাড়েনি। তাদের এই সংগ্রামের কাহিনী ইতিহাস লিখে রাখেনি ; লেখা রয়েছে মেয়েদেরই অনুভূতির আলোয়, তাদের লেখা আত্মকথা-স্মৃতিকথায়। মেয়েদের লেখা আত্মকথা, স্মৃতিকথার ধারা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও, তার অধিকাংশই ছিল অন্তঃপুরিকাদের কথা। বিশ শতকের রাজনৈতিক, সামাজিক অভিঘাতের ঝোড়ো হাওয়া যথার্থই অন্তঃপুরকে বাইরে এনে ফেলেছিল—এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিই মেয়েদের ঘর থেকে বেরোতে সাহায্য করল। তাদের এক বিরাট অংশ যোগ দিয়েছিল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, অন্যদিকে ছিল সমাজসেবা, সাহিত্যসৃষ্টি ও বিভিন্ন শিল্প-কলা—চলচ্চিত্র শিল্পেও যুক্ত হচ্ছিল বাঙালি মেয়েরা।

বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে রচিত বাঙালি মেয়েদের আত্মকথা, স্মৃতিকথায় উঠে আসে সেই সময়টি, সমকাল—সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক নানা পরিবর্তন, সঙ্কট, ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং পরিবর্তিত চিন্তা চেতনার ধারা। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত কিছুই জড়িয়ে ছিল তাদের জীবনের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, চলার প্রতিটি পদক্ষেপে। (১৯৩০–৪৭)—কালপর্বে পাওয়া মেয়েদের লেখায় উঠে এসেছে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের উত্তাল বাংলা, পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়, স্বাধীনতার জন্য পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের সংগ্রামের ইতিহাস—দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, দেশের ভেঙে পড়া অর্থনীতি, মানুষের হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ। ১৯৪৩-এ বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর মন্বন্তর ও ভেঙে পড়া সামাজিক কাঠামোয় মানুষের অমানুষ হয়ে ওঠার কাহিনী, সে সময়ের শিক্ষিত চেতনাসম্পন্ন অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে। কোথাও গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে আবার কখনও বা কাজের জগতে সম্পূর্ণভাবে টেনে নিয়েছে এই সমস্ত ঘটনা। অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের শিকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেয়েরা শিখেছে অস্তিত্বের লড়াই, টিকে থাকার সংগ্রাম। তাদের সাহায্য করেছেন এই সমস্ত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা।

বিশ শতকের সূচনা, অখণ্ড বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই শতকে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ধাক্কায় বাঙালি প্রথম রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গ রোধ করার প্রয়োজনে যথার্থ রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হন। এই আন্দোলনই ক্রমশ সচেতনভাবে ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হতে হতে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হল। বিশের দশক থেকে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে।

অনুভূতিসম্পন্ন সচেতন দেশবাসীর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল দেশের স্বাধীনতা। বাঙালি মেয়েরাও আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকল না, স্বাধীনতার লক্ষ্যে পুরুষের সঙ্গী হয়ে পথে নামল বাংলার মেয়েরাও। বীণা দাশের কথায়, "রক্ত বিপ্লবের পথে মাতৃভূমির শৃঙ্খল-

মোচনের সাধনায় বাঙলার মেয়েদের দানও তুচ্ছ নয়। অমারাত্রির অন্ধকার অন্তরে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে সেই প্রাণ দেওয়া নেওয়ার দুর্গম পথে ও পরীক্ষায় বাঙলার মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল। মুক্তিযজ্ঞের হোমাগ্নিতে সর্বপ্রিয় বস্তুকে ইন্ধন করে আত্মদানের পূর্ণাহুতি দ্বারা ব্রতসাঙ্গ করার সাধনায় তারাও কোনদিনই পিছনে পড়ে থাকেনি।"[১] উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার মেয়েদের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করে তুলছিল। তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশের পরিস্থিতি, তাদের সামাজিক অবস্থান এবং অন্তঃপুরের বন্দীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিল, এগিয়ে আসছিল অবরোধ মোচন করে। এতে সাহায্য করেছিল মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা। উচ্চশিক্ষা একদিকে যেমন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথা ভাবতে শেখাচ্ছিল, অন্যদিকে রাজনৈতিক বোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছিল।

বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই রাজনৈতিক ভাবনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর মানুষকে সার্বিকভাবে সচেতন করে তুলল। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস সূচনা থেকেই ছিল শিক্ষিত সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষের সংগঠন। সেই সংগঠনে একটি দু'টি করে হলেও মেয়েরা এসে যোগ দিচ্ছিল কিন্তু তারা সকলেই ছিল সমাজের আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর মানুষ—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই মুষ্টিমেয় কয়েকজন। গান্ধীজীই প্রথম তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহের কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, পর্দানশীন-আলোকপ্রাপ্ত নির্বিশেষে সমস্ত নারীকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ডাক দিলেন। কমলা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "এল আইন অমান্য ও লবণ সত্যাগ্রহের ডাক। ১৯৩০ সালের মধ্যে স্বাধীনতার দাবি না মানলে আন্দোলন হবে—এই ছিল কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের মুখ্য দাবি—সেইভাবেই দেশবাসী ও কর্মীরা তৈরি হচ্ছিলেন। আমাদের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দও এতে সামিল হলেন এই কুখ্যাত লবণকর বসাবার প্রতিবাদে। অগণিত নরনারী—বিশেষ করে বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মহিলা সত্যাগ্রহী কারাবরণ করে মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার কায়েম করলেন। এদের মধ্যে শিক্ষিত কৃষক রমণী, উচ্চ-নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও ছিলেন যাঁরা গান্ধীজীর আদর্শে সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন।"[২] তিনি চেয়েছিলেন মেয়েরা তাদের সুপ্ত আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করুক। তিনি মনে করতেন, "Woman is sacrifice personified when she does a thing in the right spirit, she moves mountains."[৩] তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে অহিংসা সংগ্রাম পুরুষের তুলনায় নারীর নেতৃত্বে অনেক বেশি সার্থক হয়ে উঠবে—"অহিংসা যদি আমাদের মূলনীতি হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে।"[৪] ডাণ্ডীতে লবণ আইন অমান্য করার ফলে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হলে, জেলে যাবার আগে তাঁর সেই আরব্ধ আন্দোলন সম্পূর্ণ করার কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও তিনি এগিয়ে আসতে বলেন। আশালতা সেনের 'সেকালের কথা'য় এই সময়ের কথা পাই—"সত্যাগ্রহী সেবিকা দলের অধিকাংশ মহিলা কর্মীই সেকেলে নিরীহ পরিবারের লোক। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁদের খুবই কম ছিল। তবু যখন গান্ধীজীর ডাক এল তখন এই সব 'অবলা'রা পৃথিবীর সবচেয়ে

শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভয় পেলেন না। পুলিশের লাঠি, গুলি, জেল, তাঁদের দমাতে পারলো না।"[৫] গান্ধীজীর প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলন পদ্ধতিই এটা সম্ভবপর করেছিল। খাদি ও মাদক বর্জন আন্দোলনেও গান্ধীজী মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা বলেন, "এই আন্দোলন (খাদি ও মাদক বর্জন) কেবল মহিলাদের দ্বারাই আরম্ভ করা হবে। এর বৈশিষ্ট্য হল তারাই এটা নিয়ন্ত্রিত করবে। ......পুরুষেরা পুরোপুরি তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করবে।'[৬] এইভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নারীমুক্তি আন্দোলন একধারায় মিশে যায় গান্ধীজীর আহ্বানে। আশালতা সেনের কথায়, "১৯২০ সালের পরে ভারতে যে নারী জাগরণ হয়েছে, তার অনেকটা কৃতিত্ব গান্ধীজীর প্রাপ্য।"[৭]

অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রামোন্নয়ন গ্রামসংস্কার এবং অ স্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজেও গান্ধীজী মেয়েদের এগিয়ে দিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্কুল-কলেজের ছাত্রী থেকে শুরু করে রক্ষণশীল হিন্দু বিধবারাও এগিয়ে এলেন বিভিন্ন গঠনমূলক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে। রেনুকা রায়, তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, যে সমস্ত মেয়েরা এই গ্রামসংস্কারের কাজে যুক্ত ছিলেন, গান্ধীজী নিজে যাঁদের হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দিতেন, নিয়মিত সময় অন্তর গান্ধীজীকে তাঁদের কাজের রিপোর্ট পাঠাতে হতো, "প্রতি পনেরো দিন অন্তর গান্ধীজীকে আমাদের কাজের রিপোর্ট পাঠাতে হ'ত। সুদূর ওয়ার্ধায় থেকেও তিনি কড়া হাতে কাজ আদায় করতেন, কিছুই তার চোখ এড়াত না।"[৮]

১৯৩০-র এপ্রিলে কলকাতায় শুরু হয় গাড়োয়ান ধর্মঘট। বঙ্কিম মুখার্জী, আব্দুল মোমিন, স্বামী বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে শুরু হয় এই আন্দোলন। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা গোটা হ্যারিসন রোড অবরোধ করে পুলিশের সঙ্গে ব্যারিকেড সংগ্রাম চালায়। পুলিশের গুলিতে সেদিন ৫ জন গাড়োয়ান সমেত মোট ৭ জন হিন্দু-মুসলমান নিহত হন। তাদের মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল বের হয় কলকাতার রাস্তায়। এই আন্দোলনে ছাত্রদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। কমলা মুখোপাধ্যায়ের '১৯২৯-৩১' এর স্মৃতিতে উঠে এসেছে এই গাড়োয়ান ধর্মঘটের কথা—"এর মধ্যে ১ এপ্রিল ১৯৩০ সালের গাড়োয়ান ধর্মঘট বিশেষভাবে আমাদের অভিভূত করেছিল। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা এক অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তাদের গাড়ির চাকা খুলে হাওড়া থেকে শিয়ালদহতে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। লাঠি গুলি চলে—কয়েকজন মারাও যায়। নেতারা গ্রেপ্তার হন। অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যেই মীমাংসা হয়। ছাত্ররাও বিশেষ করে সিটি কলেজের ছাত্ররা বিশেষ উত্তেজিত হয় পুলিশের বিরুদ্ধে। এই সময়কার ছাত্রদের দৃঢ় প্রতিরোধ—প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পুলিশের লাঠিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত রেলিং-এর উপর থেকে (এখন যেখানে পুরনো বইয়ের দোকানগুলি) স্থান ত্যাগ করত না—এই দৃশ্য ও অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃশ্য আজও ভুলিনি।"[৯]

বিশের দশক এবং তার কিছু আগে থেকেই বাংলার মেয়েরা বিভিন্ন মহিলা সংগঠন তৈরির কাজে লাগে। মহাত্মা গান্ধীর ডাণ্ডী যাত্রার পরদিন ১৩ মার্চ, ১৯৩০ এ কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত কলকাতার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মহিলা স্থাপন করেন, 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'। সভাপতি ছিলেন উর্মিলা দেবী, সহকারী সভাপতি মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী

গঙ্গোপাধ্যায়, নিস্তারিনী দেবী প্রমুখ। সম্পাদিকা শান্তি দাস (কবীর), কার্যকরী সমিতির সদস্য সরলাবালা সরকার, অম্বালিকা দেবী, জ্যোৎস্না মিত্র, ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, সুরমা দাশগুপ্ত প্রমুখ। সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, পিকেটিং এবং বিদেশী কাপড় বর্জনে এঁদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। বড়বাজার, চাঁদনি, গ্রান্ট স্ট্রীটে এবং হগ মার্কেটের বিভিন্ন বিদেশী কাপড়ের দোকানে সমিতির মেয়েরা পিকেটিং করতেন। সমিতির কার্যধারা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় সরলাবালা সরকারের হারানো অতীতে—"অতি প্রত্যুষ হইতে এই সকল কাটরা নারী সত্যাগ্রহী দলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। ইহাদের ভিতর বার-তের বৎসর বয়স্কা বালিকা, বাঙালী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী সকল শ্রেণীর নারীরাই থাকিতেন। ইঁহাদের কাজ ছিল দোকানে দোকানে কোনো বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় না হয় সেজন্য পাহারা দেওয়া। কোনো কাপড়ের গাঁটে বিদেশী মাল আছে সন্দেহ হইলে তাহা ধরা হইত। অবশ্য এই সত্যাগ্রহে বলপ্রয়োগ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, চোখের সম্মুখে বিদেশী মাল বিক্রয় হইতে দেখিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষের নিকট হাতজোড় করিয়া যুক্তি প্রদর্শনে তাঁহাদের মন ভিজাইতে হইবে, ইহাই ছিল সত্যাগ্রহের নিয়ম। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রমও যে একেবারে হইত না, তাহা নয়। তবে এই নারী সত্যাগ্রহী দলকে কাটরার সমস্ত লোকই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখিতেন, এমনকি কতকটা ভয়ও করিতেন। পারতপক্ষে ইহাদের কথায় তাঁহারা কোনো আপত্তি তুলিতেন না।"[১০] নিরক্ষর, পর্দানশীন গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা পিকেটিং করত। পুলিশ দলে দলে নারী সত্যাগ্রহীদের কারারুদ্ধ করে, তবুও তারা নিরস্ত হয়নি।

১৯৩০-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুদিনে কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘের কর্মীরা মোহিনী দেবী, শান্তি দাস, বিমল প্রতিভা দেবী, উর্মিলা দেবী প্রমুখের নেতৃত্বে দেশবন্ধু পার্কের দিকে মিছিল করে এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। পুরুষ ভলান্টিয়ারদের তারা সরিয়ে দিলে, মেয়েরাই এগিয়ে যায়। সেখানে তারা সভা করে এবং সভা শেষে মিছিল করে বেরিয়ে আসার সময় বেথুনের ছাত্রী ভলান্টিয়ার ইলা সেন মিছিলের পাশে পাশে এগিয়ে আসা এক ঘোড়সওয়ার পুলিশের হাত চেপে ধরেন, যাতে সে মারতে না পারে। সার্জেন্ট থামছে না, ইলা সেনও কখনও শূন্যে উঠছেন, কখনও নামছেন কিন্তু সার্জেন্টের হাতের বেটন' তিনি ছাড়েননি। কমলা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "দেশবন্ধুর মৃত্যুদিবসে দেশবন্ধু পার্কে যাবার সময় পুলিশ বাহিনী পুরুষ ভলান্টিয়ারদের হটিয়ে দেয়। তখন মহিলারাই অগ্রসর হন নির্ভীকভাবে এবং একজন দাদা গিয়ে তালাবন্ধ পার্কের দরজা খুলে দেয় রেলিং টপকিয়ে। পরে এক মহতী সভা হয়। আসার সময় মিছিলের দুপাশে ঘোড়সওয়ার সার্জেন্ট বেটন হাতে আসছিল। ইলা সেন এক সার্জেন্টের হাত চেপে ধরেন যাতে সে মারতে না পারে। সার্জেন্ট চলা থামায় না—ফলে ইলা সেন কখনও কখনও শূন্যে উঠে যাচ্ছেন। কখনও নামছেন। কিন্তু বেটন ছাড়ছেন না। আমরা ঐসব অভূতপূর্ব সাহস ও দৃশ্য থেকে মুগ্ধ হচ্ছি ও অনুপ্রাণিত হচ্ছি।"[১১] ত্রিশের দশকের শুরুতেই বাঙালি অবাঙালি মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে। তারা পুলিশের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের লাঠি-বন্দুকের মোকাবিলা করেছে। কখনও কখনও পুরুষ সহকর্মীদের পাশে রেখে তারাই এগিয়ে গেছে, বিপদের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু পিছিয়ে আসেনি।

সারা দেশে ১৯৩০-র ২৬ জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় পতাকা তুলে আইন অমান্য করে। পরের বছর ২৬ জানুয়ারি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, স্বাধীনতা দিবসে অক্‌টরলোনি মনুমেন্টে জাতীয় পতাকা তোলা হবে। বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ-মহিলারা মনুমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল জাতীয় পতাকা হাতে। তখনকার কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসুও ছিলেন সেই শোভাযাত্রায়। পুলিশ এগিয়ে এসে বাধা দিল। লাঠির আঘাত করে সুভাষচন্দ্রের হাত থেকে জাতীয় পতাকা কেড়ে নিল তারা, তাঁকে এগোতে দিল না, বাধা পেল অন্য পুরুষ ভলান্টিয়াররাও। মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা পুলিশের আঘাত সহ্য করে, মানুষের পায়ের চাপে দলিত পিষ্ট হয়েও এগিয়ে গেলেন মনুমেন্টের দিকে, উড়িয়ে দিলেন জাতীয় পতাকা মনুমেন্টের উপর। প্রত্যক্ষদর্শী তখনকার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী কমলা মুখোপাধ্যায়ের লেখায় রয়েছে সেদিনের বিস্তৃত বিবরণ—"১৯৩১ সালের ঘটনাটি স্মরণীয়। কংগ্রেস থেকেই বোধহয় স্থির হয় অক্‌টরলোনি মনুমেন্টে (এখনকার শহিদ মিনার) ২৬ জানুয়ারি পতাকা উত্তোলন করা হবে। সেই অনুসারে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা পুরুষ বিভিন্ন স্থান থেকে ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র বসুও একটি জাতীয় পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন—বেটনধারী পুলিশ পতাকা ছিনিয়ে লাঠির আঘাত করে হাতে, তিনি মনুমেন্টে পৌঁছতে পারেননি। তিনি বোধ হয় তখন করপোরেশনের Chief Executive Officer ছিলেন। কিন্তু মহিলারা—? মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরা পিষ্ট হয়ে পদদলিত হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। তাদের মধ্যে দুই-একজন উঠে দৌড়ে মনুমেন্টে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন। এইসব অজ্ঞাত বীরাঙ্গনাদের কে মনে রেখেছে?"[১২]

সরলাবালা সরকারের স্মৃতিকথায় কারাবরণকারী প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কার কথা জানা যায়। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ইন্দুমতী সম্পর্কে কমলা

> *"আমার যতদূর স্মরণ হয়, সর্বপ্রথম জেলে যান পদ্মরাজ জৈনের কন্যা ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা। ইহার পূর্বে গ্রেপ্তার যদিও হইয়াছে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের ছাড়িয়াও দেওয়া হইয়াছে। ইন্দুমতীর মোকদ্দমা ব্যাঙ্কশাল কোর্টের রক্‌সবার্গের এজলাসে হইয়াছিল বলিয়াই আমার স্মরণ হইতেছে। অভিযুক্ত আসামীটি বালিকা মাত্র, আর এই বালিকাই প্রবল-প্রতাপ ব্রিটিশ সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারিণী।"*
>
> *সরলাবালা সরকার— 'হারানো অতীত,' পৃঃ ৮৮১।*

মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "বেথুনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা উল্লেখনীয়া—হিন্দিতে আবেদন লিখে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আবেদন। 'তোমরা বিদেশি শাসকদের সাহায্য করো না'। ফলে চার মাস কারাদণ্ড।"[১৩] প্রচণ্ড নিগ্রহ সত্ত্বেও নারী সত্যাগ্রহীদের অক্লান্ত চেষ্টায় বাজার থেকে বিলিতি কাপড় প্রায় উধাও হয়ে গেল। সরলাবালা সরকার এবং আরও কয়েকজন সত্যাগ্রহী নেত্রী কলকাতা ছাড়া মফস্বলে গিয়েও সত্যাগ্রহ প্রচার করেন। এরকম বহু অভিজ্ঞতার কাহিনী সরলাবালা তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—"মাঝে-মাঝে এই লেখিকাকেও কুষ্টিয়া-কুমারখালি এবং হাওড়া-আমতা লাইনের

অনেকগুলি গ্রামে যাইতে হইয়াছে।"[১৪] তাঁর মতে "বস্তুত পল্লী অঞ্চলে যে উৎসাহ ও জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা দেখা গিয়াছে, শহরকে তাহার তুলনায় নিষ্প্রাণ বলিলে অসঙ্গত হয় না। পল্লীর কুলবধূরা পর্যন্ত এই উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক সভায় এত নারী সমাবেশ হইত যে, স্থান সঙ্কুলান কঠিন হইত। চাষীগৃহের নারীরাও এই সমস্ত সভায় যোগদান করিত।"[১৫] সত্যাগ্রহী সমিতির কলকাতা থেকে যাওয়া মেয়েদের প্রভাবে মফস্বলে বিভিন্ন জেলায় মেয়েরা লবণ আইন ভঙ্গ করে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঢাকা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্টে মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত হয়। আশালতা সেনের 'সেকালের কথা'য় তাঁর স্মৃতির পাতা থেকে উঠে আসা এ সময়কার অনেক টুকরো ছবি পাওয়া যায়। ঢাকার সরমা গুপ্ত ও আশালতা সেন, বাঁকুড়ার সুরমা

চারুশীলা দেবী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কমলা দাসগুপ্ত বলেছেন, "১৯৩০ সালে লবণ আইন অমান্যের সময় তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নরঘাটে একটা জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল, বক্তা চারুশীলা দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। এই মিটিং ভেঙে দেবার জন্য মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। পেডি আদেশ দিলেন, '১৪৪ ধারা আছে, মিটিং কোরো না।' জ্যোতির্ময়ী দেবী পুলিসের বাধা অগ্রাহ্য করে জনতাকে আহ্বান করে বললেন, 'যাঁরা বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা এই সভায় এগিয়ে আসুন। যাঁরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেন তাঁরা ফিরে যান।' এই আহ্বান শুনে সাবিত্রী নামে তমলুকের এক সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী যোড়শী পতিতা এসে বললেন, 'আমরা বুকের রক্ত দেব কিন্তু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করব না।' তাঁর পশ্চাতে প্রায় আটশত গ্রাম্য মেয়ে ও বউ কোলে-পিঠে সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, তাঁরাও এই সভা রক্ষা করবার জন্য জীবন বিসর্জন করবেন। তাঁরা পুরুষদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সভা সাঙ্গ করে তাঁরা সকলে মিলে লবণ তৈরির ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন। সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী এই সময় জনতার উপর লাঠি চার্জ করে।

একটি দশ বছরের বালকের চোখে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিজেই আঘাত হেনে রক্তাক্ত করে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ পতিতা নারী সাবিত্রী ছুটে এসে নিজের পরনের খদ্দরের শাড়ি ছিঁড়ে তার চোখে বেঁধে কোলে নিয়ে বসলেন। এ দৃশ্য সেদিন মেদিনীপুরের জনসাধারণকে বিস্মিত ও বিচলিত করে তুলেছিল। পেডি সেদিন সেখানে প্রায় একঘণ্টা লাঠি চার্জের হুকুম জারী রেখেছিলেন।"—কমলা দাসগুপ্ত, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', পৃঃ ৬৮।

ও সুষমা পালিত, কুমিল্লার হেমপ্রভা মজুমদারের নেতৃত্বে ঐসব অঞ্চলের মেয়েরা অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হয়। আশালতা সেনের কথায়, "১৯৩০ সালে গান্ধীজী কুখ্যাত লবণ আইন অমান্যের জন্য যখন ডাণ্ডী অভিযান শুরু করলেন তখন গণআন্দোলন শুরু হল। তাঁর প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য ১৯৩০-এর মার্চ মাসে আমি, সরমা ও সরযূ গুপ্তার সাহায্যে 'সত্যাগ্রহী সেবিকা দল' গঠন করলাম। এপ্রিল মাসে আমরা কয়েকজন আমার জন্মভূমি নোয়াখালির সমুদ্রতটে লবণ আইন অমান্য করার জন্য গেলাম। সেখান থেকে কিছু নোনা জল ঢাকায় নিয়ে এসে সেখানকার বিখ্যাত করোনেশন পার্কে সর্বসমক্ষে নুন তৈরি করে সেই আইন আবার অমান্য করলাম। ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ হাজার-হাজার লোক দাঁড়িয়ে দেখল

কমলা মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"মেদিনীপুরের কাঁথির মেয়েরা যে লবণ বেআইনীভাবে নির্ভীকতার সঙ্গে তৈরি করত তা কলকাতায় আসত এবং আমরা খদ্দর এবং ঐ নিষিদ্ধ লবণ কলেজে, হস্টেলে, রাস্তায় বিক্রি করতাম।"—কমলা মুখোপাধ্যায়—কিছু স্মৃতি—১৯২৯-৩১, চতুষ্পর্ণী, বর্তমান।

এবং জয়ধ্বনি দিয়ে অনুমোদন জানালো, কে কার আগে জেলে যাবে এজন্য যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। মেয়েদের ভিতর প্রথম গ্রেপ্তার হলেন সরযূ গুপ্তা, কামিনী বসু, প্রতিভা সেন এবং সুনীতি বসু। তাঁরা সবাই রক্ষণশীল পরিবারের মহিলা। প্রথম তিনজন আবার গোঁড়া হিন্দু বিধবা। হিন্দু বিধবার নিরামিষ খাবার নিজেরা রান্না করে নেবার অধিকার যতদিন জেল কর্তৃপক্ষ না দিলেন ততদিন তাঁরা অনশনে রইলেন"।[১৬] কুমিল্লার লাবণ্যলতা চন্দ পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে সরকারি বিভাগের শিক্ষিকার পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গে মেয়েরাও সত্যাগ্রহে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এইভাবে গান্ধীজীর অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সর্বশ্রেণীর মেয়েদের ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে আলোর পৃথিবীর মধ্যে নিয়ে এসেছিল। দেশের নাগরিক হিসেবে তারা দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

নারী সত্যাগ্রহী সমিতির আগেই বিশের দশকে আরও দুটি মহিলা সংগঠনের কথা জানা যায়—'দীপালি সঙ্ঘ' ও 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ'। দুটি সঙ্ঘই মেয়েদের শিক্ষা, সচেতনতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে লিপ্ত ছিল। এই সমস্ত সংগঠনগুলি সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারময় অচল স্থবিরত্বে আঘাত করে সমাজকে কিছুটা সচল করেছিল। সমাজ রথের প্রায় অচল চাকাটিকে কিছুটা সচল করে সমাজকে খানিকটা এগিয়ে দিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী তথা কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি ত্রিশের দশক থেকে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যুব বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই সময় সমগ্র বাংলাদেশে ছোট-বড় অসংখ্য বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল—যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসঙ্ঘ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দলগুলির উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল সব জায়গাতেই ছোটো ছোটো বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। সে সময়ের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই কোন না কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বীণা দাসের কথায়, "আমাদের সময় কলেজে যারা পড়তো তাদের মধ্যে বোধহয় বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই কোনো না কোনোভাবে সে সময়কার বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কেউ সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে জড়াত, কেউ কিছুটা পিছনে থেকে, কিছুটা সাবধানে সাহায্য করে যেত।"[১৭] এই সমস্ত তরুণ প্রাণ অহিংস সত্যাগ্রহের পাশাপাশি প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের পথই বেছে নিয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও বিশেষ সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু করে। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম যুব আন্দোলনের কল্পনা দত্ত (জোশী), প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কুমিল্লার দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি দাশ ও সুনীতি চৌধুরী, কলকাতার বীণা দাস, যশোহরের প্রথম মহিলা ঈশান স্কলার শান্তিসুধা ঘোষ, কমলা দাশগুপ্ত, উজ্জ্বলা মজুমদার (রক্ষিত রায়) পারুল মুখার্জী, সুহাসিনী গাঙ্গুলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপ্লবী ছেলেরা প্রথম থেকেই তাদের আন্দোলনের পথে, বিভিন্ন

বিপদসঙ্কুল কাজে বাড়ির মেয়েদের সহায়তা পেয়েছিল। তবে প্রত্যক্ষভাবে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা তাঁরা ঠিক ভাবতে পারেনি। কল্পনা দত্ত "চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে জানিয়েছেন, 'চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের দ্বিতীয় পর্যায়ে' গেরিলা যুদ্ধের সময় মাস্টারদা মেয়েদেরও সংগঠনের কাজে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। সেই সময়েই তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এঁরা ছাড়াও চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার সময় থেকেই অনন্ত সিং-এর দিদি ইন্দুমতী সিং তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন থেকেই তিনি লাঠি চালানো, যুযুৎসা বিদ্যা, গুলি ছোঁড়া ইত্যাদিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন"।[১৮] বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেবার পর থেকেই কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতাকে নানাভাবে বিভিন্ন ট্রেনিং -এর মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় ছাত্রী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন, শরীর শিক্ষার জন্য সিমলা ব্যায়াম সমিতিতেও যোগ দেন। কল্পনা দত্তের কথায়,—"আমি নিজেকে মনে করে নিয়েছিলাম আমিও একজন বিপ্লবী এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনেই আমি যোগ দেব। শুনেছিলাম বিপ্লবী নেতাদের ধারণা ছিল সমাজের যে স্তরে আমাদের পরিবারের স্থান—সেই পরিবার থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে কেউ আসতে পারে তাঁরা ভাবতেই পারেন না। শুরু হোল আমার একলব্যের সাধনা—চট্টগ্রামের বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে আমি প্রতিষ্ঠিত করব নিজেকে। আর তাদের ভুল ধারণা ভাঙব"।[১৯]

প্রথমে 'মাস্টারদা' কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতার উপর যৌথভাবে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ভার দেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয় না এবং বাড়ি ফিরতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কল্পনা দত্ত। শেষ পর্যন্ত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার নেতৃত্বে ৭ জন তরুণ বিপ্লবী এই ক্লাব আক্রমণ করেছিলেন। কল্পনা দত্তের ভাষ্যেই পাওয়া যায় এই অভিযানের বর্ণনা—"২৪শে সেপ্টেম্বর যুগপৎ আক্রমণে ক্লাব ঘরের সব আলো বোমার ও বন্দুকের আঘাতে নিবে গেল। ঘরময় অন্ধকার। সাহেবদের ভয়ার্ত চীৎকার আর ইতস্তত ছুটোছুটির শব্দই শোনা যাচ্ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাচগানের আসর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল—ঘরে রইল শুধু গোঙানি ও কান্না। বিপ্লবীরা ফিরে গেল নিজের আস্তানায় সাতজনই—শুধু ফিরল না তাদের নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ক্লাব ঘরের বাইরে এসে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে নিল।"[২০] প্রীতি চেয়েছিলেন দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করে দেশের মেয়েদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত রেখে যেতে। মেয়েরাও যে দেশের প্রয়োজনে একটি ছেলের মতই নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে, এটাই তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন দেশবাসীর কাছে। পাহাড়তলীর ক্লাব অভিযানের আগে তাই প্রীতিলতা মাস্টারদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন পটাশিয়াম সায়ানাইড এবং প্রয়োজনে মৃত্যুর অনুমতি। মৃত্যুর পর প্রীতিলতার শার্টের পকেট থেকে একটি ঘোষণাপত্র পাওয়া যায়,—সেখানে তিনি উত্তরসূরীদের জন্য জানিয়ে গেছেন তাঁর স্বপ্নের কথা, "Females are determined that they will no more lag behind, but they will stand side by side with their brothers in any activities, however, dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all danger and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands."[২১]

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটতে লাগল। দুই কিশোরী শান্তি ও সুনীতি কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করলেন। শান্তি নিজেই বলেছেন, "সুনীতি ও আমি কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিপ্লবী শক্তির অভিযানকেই রূপায়িত করলাম। ১৪ই ডিসেম্বর আমরা লিখলাম বাংলার রক্ত বিপ্লবের ইতিহাস এক নতুন পৃষ্ঠা"।[২২] কমলা দাশগুপ্তও বাঙালি মেয়েদের এই মরিয়া হয়ে ওঠা চাঞ্চল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। এই ঘটনার আগে মেয়েরা কখনও এভাবে সামনে এগিয়ে এসে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে অংশ নেয়নি। "এমনি ফুটন্ত

কমলা দাশগুপ্তের কথায়, "সেনেট হলে গভর্ণর জ্যাকসান যখন তাঁর কন্‌ভোকেশনের অভিভাষণটা পড়ছিলেন, তখন বীণা তার আসন থেকে উঠে এসে গভর্ণরকে গুলি করে। ঠিক কানের পাশ দিয়ে গুলিটা চলে যায়। গভর্ণর নাকি তৎক্ষণাৎ মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, সামান্য একটুর জন্য লাগেনি। সৈনিকের জাত! অতি সতর্ক কান! সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল সুরাওয়ার্দি ডায়াস থেকে নেমে ছুটে এসে বীণার গলাটা টিপে ধরে প্রাণপণে বসিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। বীণা সেই অবস্থাতেই বাকি গুলি কটা ছুড়তে থাকে। যে ক'টা গুলি রিভলবারে পোরা ছিল সব ক'টাই সে ছুড়েছিল। গভর্ণরের গায়ে হয়তো লাগেনি, কিন্তু গুলি থাকতে তার হাতকে বাধা দিতে কারো সাধ্য ছিল না। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তির মূলে ফাটল ধরাতে সেই গুলি ছুটেছিল, গুলি না চললে আজ বীণার চলবে কেন?" —রক্তের অক্ষরে, পৃঃ ৪৭।

মেয়ের আগুন জ্বালানো কাহিনী যেন বাংলাদেশকে অগ্নিযুগের চরম সীমায় নিয়ে চললো।"[২৩] এই ইতিহাসে আরেকটি পৃষ্ঠা সংযোজন করলেন বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে গভর্ণর জ্যাকসনকে গুলি করে। এঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত, স্কুল-কলেজের ছাত্রী, আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মানুষ। কিন্তু এঁদের নেপথ্যেও ছিলেন আরো অনেকে, যাঁদের কথা আজ আর কেউ মনে করেন না। যাঁরা আড়ালে থেকে এই সমস্ত দুর্দান্ত ছেলেমেয়েগুলি, যারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে, ভবিষ্যৎ অগ্রাহ্য করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত—তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, বুক দিয়ে আড়াল করেছেন, খাবার দিয়েছেন, নানাভাবে খবরাখবর পৌঁছে দিয়েছেন পুলিশের চোখ এড়িয়ে। তাঁরা কিন্তু কেউই এদের মতো শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মানুষ ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের অজ্ঞ গৃহবধূ, রক্ষণশীল হিন্দু বিধবা বা অতি দরিদ্র সাধারণ ঘরের মেয়ে-বৌ। পুলিশের অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন কিন্তু কখনও পুলিশকে এই সমস্ত বিপ্লবীদের খোঁজ দেননি। এরকমই একজন ক্ষীরোদাসুন্দরী—তিনি পলাতক বিপ্লবীদের মা ও গৃহকর্ত্রী সেজে বিভিন্ন জায়গায় তাদের আত্মগোপনে সাহায্য করতেন। সাতটি মসার পিস্তল রাখার অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল দুকড়িবালা দেবীকে, কিন্তু শত জেরাতেও মাসিমার মুখ থেকে বের করতে পারল না, কে দিয়েছে তাকে পিস্তল-গুলি। গ্রামের মেয়ে গ্রামের বৌ দুকড়িবালা দেবী কোলের শিশু বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয় দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।......বন্দী জীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও প্রতিদিন আধমণ

ডাল ভাঙতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবাকে চিঠি লিখলেন, তিনি ভালোই আছেন, তাঁর জন্য যেন তাঁরা চিন্তা না করেন, শুধু বাচ্চাদের যেন তাঁরা দেখেন, শিশুরা যেন না কাঁদে।"[২৪] চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবী সূর্য সেনকে আশ্রয় দেবার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। জেলের মধ্যেই হারিয়েছেন একমাত্র পুত্রকে। একই জেলে থাকা সত্ত্বেও জীবিত অবস্থায় তাকে দেখার সুযোগ পাননি—"মুক্তি পাবার পরও সাবিত্রী দেবীকে পুলিশ রেহাই দেয়নি। অনেক কষ্ট ও নির্যাতন তাঁকে প্রতি পদে সইতে হয়। মাস্টারদার প্রতি সাবিত্রী দেবীর অটুট শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর মনোবলের পাথেয়। তারই পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি বাকী জীবনে তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে। সমস্ত পীড়ন তিনি নীরবে সহ্য করে গেছেন।"[২৫]

'৩৪-এর পর থেকে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এল। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই গুটিকয় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ছেলেমেয়ে টিকে থাকতে পারল না। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অনেকের মৃত্যু হল, বাকিরা প্রায় সকলেই ধরা পড়ল। অনেকের ফাঁসি হল, কেউ কেউ বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কারাগারের অন্ধকার প্রাচীরের আড়ালেই কেটে গেল তাদের জীবনের মহামূল্যবান মুহূর্তগুলি। তাদের এই আত্মত্যাগ, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন বৃথা যায়নি, মানুষকে কিছুটা নাড়িয়ে দিয়ে গেল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই সংগ্রাম দেশের মানুষকে সচেতন করে তুলল।

ইংরেজ শাসকদের ধারণা ছিল যে প্রচণ্ড দমননীতিতেই বিপ্লবীদের সংগ্রামী স্পৃহা দূর হয়ে যাবে কিন্তু এই সমস্ত দুর্দান্ত বিপ্লবীরা কারাগারের অন্তরালে অথবা সাগরপারের সেলুলার জেলে বসে পরবর্তী কাজের কথা ভাবতে লাগলেন। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পরিবর্তে দেশের মানুষের মধ্যে গণচেতনা জাগানো ও তাদের জাগ্রত করার ভাবনা তাঁদের মধ্যে কাজ করছিল। তাঁরা ভাবছিলেন এই ভাবেই অচল অনড় সমাজের স্থবিরত্ব দূর করে দেশবাসীকে মুক্তি সংগ্রামের পথে উদ্বুদ্ধ করা যাবে। অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস এবং সোভিয়েত বলশেভিক আন্দোলন তাদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করল। কল্পনা দত্ত বলেছেন যে, কোন জেলে অনেক রাজবন্দী মেয়েরা একত্রিত হলে তাঁরা কোলের লেখা, শ'-এর লেখা সোস্যালিজম্ এবং কমিউনিজম্ সম্পর্কে বিভিন্ন বইপত্র পড়তেন। সেই সমস্ত বইগুলির যুক্তিতর্ক তাঁদের তরুণ বিপ্লবী মনকে নাড়া দিত—"চিন্তাধারা যখন এইভাবে চলছে, তখন রম্যাঁ রল্যাঁর 'আই উইল নট রেস্ট' বইটি হাতে এলো। এর আগে তাঁরই লেখা 'সোল এন্চান্টেড' ও 'জাঁ ক্রিস্তোফ' বই দুটি পড়ে তাঁর লেখার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। 'আই উইল নট রেস্ট' শুধু যে রাশিয়ার বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা এনে দিল তা নয়, লেনিনকেও পূজা করতে আরম্ভ করলাম।"[২৬] সোভিয়েত বিপ্লবের ধারা ও বিস্তার শুধুমাত্র বিপ্লবী যুব সম্প্রদায়কেই নয়, দেশের রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাবিদ্‌দেরও আকৃষ্ট করল। কমিউনিস্ট ভাবধারা দেশের যুব সমাজের সামনে এক নতুন ছবি তুলে ধরলো। তাঁরা অনুভব করলেন যে বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যোগসাধন প্রয়োজন, যেখানে ধনী দরিদ্রের বৈষম্যের প্রাচীরটা ভেঙে পড়বে। ভারতীয় নারীরও সত্যিকারের মুক্তি সম্ভব হবে এই শোষণ মুক্ত সমাজে। বিশের দশক থেকেই গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনে কলকারখানায়

শ্রমিক এবং সমাজের তথাকথিত নীচের তলার ঝাড়ুদার, মেথরদের সংগঠিত করার কাজেও মেয়েরা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা তাদের প্রচলিত সংস্কার ভুলে মানবিক কারণেই যুক্ত হয়ে পড়েন সমাজের খেটে খাওয়া মানুষগুলিকে সচেতন করার কাজে। বিশের দশকের শুরুতে শ্রমিক নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্ত-র কথা প্রথম শোনা যায়, শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। সমগ্র দশক জুড়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করা, তাদের সচেতন করার জন্য, অধিকার আদায়ের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা প্রভৃতি নানাবিধ কাজে লিপ্ত ছিলেন তিনি।

বিশের দশকের শেষের দিকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন মোহিনী দেবীর দ্বিতীয় কন্যা প্রভাবতী দাশগুপ্তা। অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন চাকরি নেননি বা শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত হননি। তিনি সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষগুলিকে সংগঠিত করার কাজে মন দেন। "প্রথমে ঝাড়ুদার ও জমাদারদের সংগঠিত করার কাজে এবং পরে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।"[২৭]

ঝাড়ুদার ও জমাদারদের চাকরির নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বের অভাব, অত্যন্ত কম মাইনের বিরুদ্ধে তাঁরা ক্রমশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, আন্দোলনে নামতে চায়। কলকাতায় তখন ঝাড়ুদার ও জমাদারের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। তাদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন তৈরি হল— 'দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল'। প্রেসিডেন্ট হলেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত। কেশোরাম কটন মিলের শ্রমিক ইউনিয়নেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। ১৯২৮-২৯-এ চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটেও সর্বতোভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখানেও প্রভাবতী ছিলেন জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। এই সময়ই চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের অন্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে তিনি সরে আসেন শ্রমিক আন্দোলন থেকে, কিন্তু এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ধরণী গোস্বামী তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "১৯৩৪-এ প্রভাবতী আর শ্রমিক আন্দোলনে নেই ; তবুও দেখতাম ওদের বাড়ির উঠোনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে ছাঁটাই হওয়া বহু শ্রমিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, পরামর্শ চাইত। প্রভাবতী আন্দোলন থেকে সরে গেলেও শ্রমিকদের উপর থেকে তাঁর প্রভাব সরে গেল না।"[২৮]

কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট সাকিনা বেগম কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের কাজ করতে গিয়েই পরিচিত হন, সমাজের নীচের তলার মানুষগুলির সঙ্গে। তাদের অভাব-অভিযোগ শুনলেই, চেষ্টা করতেন প্রতিকারের। ১৯৪০-এ মহার্ঘ ভাতার দাবীতে কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার ও মেথরদের ধর্মঘটে কর্পোরেশনের অন্যান্য শ্রমিকরাও যোগ দেয়। ধর্মঘটে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন সাকিনা বেগম। এই সময় শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে করতে 'সাকিনা বেগম ধর্মঘটী শ্রমিকদের অবিসংবাদী নেত্রীতে পরিণত হন।'[২৯] তিনি শ্রমিকদের সপক্ষে কর্পোরেশনের কাউন্সিলের সভায় তাঁর মতামত জানান—ধর্মঘট শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাকিনা বেগম কর্পোরেশন কাউন্সিলের সভায় স্পষ্টভাবে বলেন, "কর্পোরেশনের শ্রমিকরা প্রায় অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায়। বারবার এরা এদের অভাব অভিযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের

চেষ্টা করেছে, আর আমরা সবসময়ই তা অগ্রাহ্য করেছি। অন্য কোন পথ না পেয়ে শ্রমিকরা আজ ধর্মঘট শুরু করেছে। এ সমস্যাটাকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।"[৩০] প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিকদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। শ্রমিক নেত্রী সাকিনা বেগম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাহায্যে সাকিনা বেগমের সভানেতৃত্বে গঠিত হয় ঝাড়ুদারদের নিয়ে নতুন ইউনিয়ন। প্রায় দশ হাজার শ্রমিক এই ইউনিয়নের সভ্য হন। সাকিনা বেগম সর্বদাই জমাদার-ঝাড়ুদারদের অভাব অভিযোগের দিকে খেয়াল রাখতেন। তিনি তাদের বস্তিগুলিতে গিয়ে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেন, বিপদে-আপদে সাহস জোগাতেন। তাঁকে বলা হত 'ধাঙড়রানী'।

কর্পোরেশন আগের ধর্মঘটে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় শ্রমিকরা ১৯৪০-র আগস্টে আবার ধর্মঘট করলে পুলিশ অত্যন্ত নির্যাতন করে তাদের উপর। সাকিনা বেগমকেও গ্রেপ্তার করা হয়। প্রচণ্ড নির্যাতনে ধর্মঘট ভেঙে যায়। সাকিনা বেগম এক মাস পরে ছাড়া পেলেও মেয়রের নির্দেশে তাঁকে কার্শিয়াঙে অন্তরিন করে রাখা হয়।

চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সুধা রায় নীহারেন্দু মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত লেবার পার্টিতে যোগ দেন। পরে আবার কমিউনিস্ট পার্টিতে ফিরে আসেন। তিনি চটকল শ্রমিক ও ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন, তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন ডক লেবার বোর্ডের প্রথম মহিলা সদস্য। ডক মজুর ইউনিয়নেরও তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্মী। রেণু চক্রবর্তী সুধা রায়ের স্মৃতিচারণে বলেন, "সুধাদির সাংগঠনিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় যখন তিনি চটকল শ্রমিকদের মধ্যে এবং 'ডক' শ্রমিকদের সংগঠনের কাজ শুরু করেন। প্রভাবতী দাশগুপ্ত, বেগম সাকিনা ময়াইদজাদার পর সুধাদিই শ্রমিকদের মধ্যে এমনভাবে কাজ করেছিলেন। চোস্ত হিন্দিতে তিনি বক্তৃতা দিতে শিখেছিলেন, এবং ইউ. টি. ইউ. সি-র একসময় সম্পাদকের পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ডক মজুর ইউনিয়নের একজন প্রধান কর্মী এবং তিনি ডক লেবার বোর্ডে প্রথম মহিলা সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত হন। যখন আমরা রাজনীতি করতে নেমেছি, তখন সুধাদিকে আমরা দেখেছি একজন প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নিস্ট হিসাবে।"[৩১]

বিশের দশকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত পুরুষের সংখ্যাই ছিল নিতান্ত নগণ্য। সে সময়ে শ্রমিক এবং ঝাড়ুদার-জমাদার সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রভাবতী দাশগুপ্ত, সাকিনা বেগম বা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী সুধা রায়ের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমাজ এবং রাজনীতির সবক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে এগিয়ে এসেছে মেয়েরা। যোগ দিয়েছে মানবাধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলনে—তাদেরই পূর্বসূরী রূপে স্মরণ করতে হয় এঁদের। সমাজের প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে একক প্রচেষ্টায় এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো সফল হননি, শেষ রক্ষা করতে পারেননি কিন্তু নারীর নতুন পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁরাই ছিলেন প্রথম যাত্রী।

১৯২৯-'৩০ থেকেই কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের সূচনা হয়। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশীয় প্রজা আন্দোলনের সমর্থনে, শ্রমিক মজদুরদের নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরির কথা বলেন। "১৯৩৪ সালে প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের

মধ্যে সমাজতান্ত্রিকতার স্থান দেবার ইঙ্গিত দিলেন। ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবে, বিভিন্ন নেতাদের উক্তিতেও এই একই সুর ফুটে উঠতে লাগল।"[৩২] বীণা দাসের লেখায় এই সময়কার রাজনৈতিক সংঘাতের এক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই রাশিয়ার কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী একটি দল গড়ে তুলতে চাইছিলেন। তিনি মনে করতেন, "এখন আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেবার সময় এসেছে, সে ক্ষমতা যাতে গণ-প্রতিষ্ঠানের হাতে যায় তাই আমাদের দেখতে হবে। রাশিয়ায় ওদের স্লোগান ছিল—'অল পাওয়ার টু সোভিয়েটস্'। আমাদের দেশে সোভিয়েট নেই, কিন্তু অনুরূপ গণ-প্রতিষ্ঠান রয়েছে গ্রামে-গ্রামে প্রাইমারি কংগ্রেসগুলি। সেই কংগ্রেসগুলিকেই আমাদের প্রাণবন্ত করতে হবে। 'অ্যাকটিভাইজ দি প্রাইমারি কংগ্রেস কমিটিজ'—এই হওয়া উচিত আমাদের স্লোগান।'[৩৩] সেই সময় চিন্তাবিদ্‌রা অনেকেই ভাবছিলেন 'ভারতের জল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, এখানকার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কম্যুনিজমকে এদেশের মাটিতে রোপন করা যায় কিনা...."[৩৪]। পাশাপাশি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় মানুষের ক্ষোভ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। তখন কংগ্রেসেরই কোন কোন কর্মী ও নেতা মিলে 'সর্বভারতীয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি' গঠন করেন ১৯৩৪-এ। পরবর্তীকালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করলে, ঐ সমস্ত দলগুলি মিলে গঠিত হল বাম সমন্বয় কমিটি।

বিপ্লবী আন্দোলনে অভিযুক্ত বন্দীরাও ক্রমশ মুক্তি পেতে লাগল ১৯৩৬-'৩৭ থেকে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেওয়া। কল্পনা দত্ত (জোশী) বলেছেন, জেলে থাকতে থাকতে তার কেবলই মনে হত, "ফেলে রেখে আসা অসমাপ্ত কাজ করতে হবে, দোষ ত্রুটি আমাদের যা ছিল তা দূর করতে হবে, আমাদের কাজ আরো সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য—চিন্তার ধারা ছিল এই রকমই।"[৩৫] এঁদের কেউ যোগ দিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে আবার কেউ বা কংগ্রেসে। তবে কমিউনিস্টদের সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁদেরই নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন, দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনও দানা বাঁধতে লাগলো। কংগ্রেসও সেই সময় গণসংযোগের মাধ্যমে কাজ করার কথা ভাবছিল। বীণা দাস যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে। তাঁর প্রথম কাজ শুরু হল টালিগঞ্জের চালকল শ্রমিকদের মধ্যে। বীণা দাস বলেছেন, "জেলের বাইরে শ্রমিকদের কাজে আমার হাতেখড়ি হল টালিগঞ্জের কলে। মেয়ে শ্রমিকদের অবস্থা ওখানে খুবই খারাপ। ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটে, মাঝে ভাত খাবার জন্য অল্পক্ষণের বিরতি। দিনে পাঁচ আনা, সাড়ে পাঁচ আনা রোজগার।"[৩৬] কল্পনা দত্ত (জোশী) কাজ করতেন কমিউনিস্টদের সঙ্গে। কমিউনিজম্ সম্পর্কে পড়াশোনা, সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে গোপন মিটিং, তারপর কলকাতায় এসে পার্টির আদেশে কিষাণ সভা অফিস ও ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অফিসে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এই সমস্ত আন্দোলনগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি বন্দীমুক্তি আন্দোলনেও মেয়েরা, বিশেষ করে ছাত্রীরা ক্রমশ বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করল। রেণু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'ব্রিটিশরাজ যাদের

সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে যেসব বিপ্লবীদের জেলে বন্দী রেখেছে তাদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং মেয়েরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে কিছু বন্দীরা ছাড়া পেলেন কিন্তু অনেকেই জেলখানায় আটক রয়ে গেলেন। নানা রাজনৈতিক মতবাদের মেয়েরা এই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে একত্রে সমবেত হলেন। ৯৮ নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে একটা অফিস খোলা হল। ওখান থেকেই মহিলা রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের আন্দোলন সংগঠিত করতেন। একত্র হয়ে সকলে মিলে কংগ্রেস মহিলা সঙ্ঘ গড়ে তুললেন। ওতে ছিলেন শ্রীসঙ্ঘের লীলা রায়, যুগান্তর গ্রুপের বীণা দাস ও কমলা দাশগুপ্ত, যুগান্তরের ভূতপূর্ব সদস্যা কমলা চ্যাটার্জী, যিনি পরে গোপন যুগের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা হলেন এবং আরও নানা মতের মেয়েরা।"[৩৭] কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বন্দী মুক্তির দাবীতে রাসবিহারী এভিনিউ-র মোড়ে মেয়েদের একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। লতিকা সেন, কমলা চ্যাটার্জী, মনিকুন্তলা সেন প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েরা, শ্রীসঙ্ঘের লীলা রায় ও তাঁর সহকর্মীরা, গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেত্রী লাবণ্যলতা চন্দ—সকলেই এ সভায় যোগ দেন, সাধারণ মানুষের কাছে রাজবন্দীদের মুক্তির কথা বলেন। সে সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। মানুষের মনে দাগ কাটে মেয়েদের বক্তব্য, তাঁদের দাবী। সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনও এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। সেই সময় আন্দোলনকারীরা এক মস্ত বড় মিছিলের আয়োজন করে। মণিকুন্তলা সেনের কথায় "বন্দীমুক্তির মিছিলটা খুব বড়ই হলো। ছাত্র-ছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যতদূর মনে পড়ে শ্রমিকরাও বেশ বড় সংখ্যায় এসেছিলেন। আমরা মেয়েরাও কম ছিলাম না।"[৩৮] এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ছাত্রদের ডাকা বড় বড় সভা ও মিছিলে ছাত্রীরাও বহু সংখ্যায় যোগ দিতে শুরু করল। কারণ ছাত্রীরাও তখন স্কুল-কলেজে সংগঠিত হচ্ছিল। ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ার কথা মনে হয় সকলেরই। মণিকুন্তলা সেনের কথায় জানা যায় এই ছাত্রী সংগঠন সারা ভারতেই রূপ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র ফেডারেশনে অসংখ্য ছাত্রদের সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দিতে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক ছাত্রী তখন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাদের পরিবার থেকে, অভিভাবকদের থেকেও বাধা আসতো। সর্দা আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়সের নিম্নসীমা অনেক বেড়ে যাওয়ায় অধিক সংখ্যায় মেয়েরা উচ্চশিক্ষার জন্য আসতে শুরু করল। তবে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনেও ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনায় অভিভাবকদের তেমন সায় ছিল না, ফলে সহশিক্ষাও তেমন প্রচলিত

সহশিক্ষা প্রসঙ্গে শান্তিসুধার কথা উল্লেখ করা যায়। ম্যাট্রিকুলেশনে অত্যন্ত ভাল ফল করায় বরিশালের বি. এম. কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাঁর জন্য ১৯২৪-এ। শান্তিসুধা এবং তাঁর দুই সহপাঠিনীর বি. এম. কলেজে প্রবেশই বাংলাদেশে সহশিক্ষার প্রথম সার্থক সূত্রপাত বলা যেতে পারে। আবার এই কলেজেই ১৪ বছর পর বাংলাদেশে ছেলেদের কলেজে প্রথম বাঙালি মহিলা অধ্যাপক হিসেবে পড়াতে শুরু করেন শান্তিসুধা।

হয়নি। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন (A. I. S. F.) ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক কমিটি গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখনকার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল দলমত নির্বিশেষে

'সংগ্রামী ও সমাজের আমূল পরিবর্তনকামী মেয়েরা'। 'কারণ শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। বলতে গেলে এরাই নারী-সমাজের পুরোবর্তিনী'।[৩৯] এরই ফলে ১৯৪০-এ লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় ছাত্রী সম্মেলন। মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিকথায় এই সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সম্মেলনের সভানেত্রী ছিলেন রেণু চক্রবর্তী, উদ্বোধক সরোজিনী নাইডু। তিনি সেখানে উপস্থিত মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন, "দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদেরই হাতে, যদি তোমরা গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়েমী অলসতায় জীবনের অপচয় না করো।......ছাত্রদের সঙ্গে সম্মিলিত হও এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রবাহধারার সঙ্গে যুক্ত হও।"[৪০] এই সময় রেণু চক্রবর্তী ও মণিকুন্তলা সেন সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে দেখা করে সংগঠন তৈরির ইচ্ছার কথা জানালে তিনি তাঁদেরকে এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে যোগ দেবার কথা বলেন। সব প্রদেশেই ওদের সংগঠন ছিল। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁরা অনেকেই সদস্য হন। মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, সুধা রায়, কল্যাণী দাস, ফুলরেনু দত্ত (গুহ), নলিনী দাস এবং আরও কয়েকজন কার্যকরী কমিটিতে যেতে পেরেছিলেন। সে সময় এ. আই. ডব্লিউ. সি.-র পরিচালনায় কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। 'সেদিনের কথা'য় তাঁদের কাজের বিবরণী পাওয়া যায়।

ছাত্রী সম্মেলনে সরোজিনী নাইডুর আহ্বান বৃথা যায়নি। দলে দলে ছাত্রীরা এগিয়ে এসেছিল দেশের কাজে, বিভিন্ন সংগঠন তৈরির কাজে। সে সময়ে ছাত্রীরাই ছিল মহিলা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত অংশ। লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাওয়ায় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি এই সমস্ত মেয়েদের অনেক বেশি পীড়া দিত, বিদ্রোহী করে তুলতো। পরবর্তীকালে এরাই বাংলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে সংগ্রামী মহিলা গণসংগঠন গড়ে তুলেছিল।

জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করার দুদিন পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৩৯-র ১ সেপ্টেম্বর। এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গেই ভারতের বড়লাট, কোনো জনপ্রতিনিধির সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভারতকে যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে জড়িত বলে ঘোষণা করেন। ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৯-র ৩ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষও যুক্ত হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ৩ সেপ্টেম্বর এক অর্ডিন্যান্সে ঘোষণা করা হয় অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ ভারতের শান্তিরক্ষা ও যুদ্ধ চালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ, সর্ববিধ প্রচার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যবস্থা হয় বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তারের। ২ অক্টোবর ১৯৩৯ ইংরেজ সরকারের এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বোম্বাইতে ৯০,০০০ শ্রমিক একদিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট করল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৯-র অক্টোবরে বড়লাটের কাছে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের যথাযথ জবাব না পেয়ে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিল। এদিকে এর আগেই কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-বাম সংঘাতের ফলে ১৯৩৯-র এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি কংগ্রেসের মধ্যেই ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। তখন কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, রায়পন্থী এবং সহজানন্দ প্রমুখ নেতা ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একত্রে এক বাম সমন্বয় কমিটি

৯ জুলাই কংগ্রেস নেতৃত্বের উত্তরোত্তর অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে সভা সমাবেশের ডাক দেয়। এর ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করা হয় ছয় বছরের জন্য, তাঁর কংগ্রেসের কোনো পদাধিকারী হওয়া নিষিদ্ধ হয়।

এই সময় থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে—

১। কংগ্রেস পরিচালিত ১৯৪২-র আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

২। জার্মানি ও জাপান থেকে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত আই. এন. এ. আন্দোলন।

৩। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধ আন্দোলন।

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৯-র ৩ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষও যুক্ত হয়ে পড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। চল্লিশের মাঝামাঝি নাগাদ ইউরোপের অধিকাংশই দখল করে নিল হিটলার বাহিনী। ১৯৪১-এ সোভিয়েত রাশিয়াও আক্রান্ত হল। ইউরোপে নাৎসী বাহিনীর তাণ্ডবের পাশাপাশি এশিয়ায় শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী তাণ্ডব। ফ্যাসিবাদী জাপান আক্রমণ করে চীনকে। জাপানীরা ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভারত সীমান্তে এগিয়ে আসতে থাকে। যুদ্ধ একেবারে আমাদের দরজায় এসে পৌঁছে গেল। মণিকুন্তলা সেনের কথায়, "১৯৪১ সালের শেষের দিকে জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করল ও খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করল। এরপর ঝড়ের বেগে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা ব্রহ্মসীমান্তে পৌঁছে গেল।" বাংলায় এই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের কথা উঠে এসেছে বীণা দাস, শান্তিসুধাদের স্মৃতিকথায়। বীণা দাস বলেছেন, "......১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে, একদিন প্রত্যূষের খবরের কাগজ হঠাৎ ঘরে-ঘরে খবর বহন করে আনল যে জাপান প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অবতরণ করেছে। ঘাড়ের এত কাছে যুদ্ধ, মাথার উপর ঘন ঘন বমার ঘুরছে। আকাশ বিদীর্ণ করে বেজে উঠছে সাইরেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় স্লিটট্রেঞ্চ আর ব্যাফ্‌ল্ ওআল, আর গাছ দিয়ে সাজানো কামানের ক্যামফ্লাজ।"[৪২] ইংরেজ সৈন্য নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশে এসে ঘাঁটি তৈরি করে। ফলে উপকূল ভাগের সমস্ত নৌকা ধ্বংস করে দেওয়া হয়, চাষ আবাদও নিষিদ্ধ করা হয়। জাপান রেঙ্গুন অধিকার করার পর সেখান থেকে চাল পাবার সম্ভাবনাও বন্ধ হয়ে গেল। হাজার হাজার জেলে, কৃষক কর্মহীন হয়ে পড়ল। যুদ্ধের জন্য চাঁদা দিতেও জনসাধারণের উপর চাপ সৃষ্টি করা হল। মজুতদারদের তৎপরতায় মানুষের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ যা পাওয়া যাচ্ছিল, তা'ও গুদামজাত হল। শুরু হল কালোবাজারী, জিনিষপত্রের দাম হল আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যুদ্ধের আশঙ্কা, খাদ্যবস্ত্রের অভাব মিলে মানুষ না খেতে পেয়ে মরতে লাগল, কত মেয়ে কাপড়ের অভাবে আত্মহত্যা করল। অন্যদিকে জাপানী আক্রমণের ভয়ে মানুষ কলকাতা ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করল প্রাণভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে। অন্যদিকে ব্রহ্মদেশ থেকে দলে দলে মানুষ জাপানী আক্রমণের ভয়ে কলকাতার দিকে ছুটে আসতে লাগলো। শান্তিসুধার লেখায় এই সময়কার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"বিশ্বযুদ্ধ দেখতে দেখতে ঘরের দোরে হানা দিতে আরম্ভ করেছে। জাপানী সৈন্যদল মিত্রশক্তিকে বিপর্যস্ত করে ব্রহ্মদেশ দখল করে নিল। সুভাষ বসুর অধীনে

আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরাকানের পথে এগিয়ে আসছে। ব্রহ্মদেশ থেকে হাজার হাজার নরনারী প্রাণভয়ে আরাকানের পর্বত, জঙ্গল ডিঙিয়ে ভারতবর্ষের দিকে ছুটছে। এমনকি জাপানীরা বিমানযোগে কলকাতার বুকে বোমা ফেলে

"এঁদের এই পলায়ন-বৃত্তি আরো দৃঢ় হল যখন বর্মা-প্রত্যাগত লোকদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে লাগল। দলে-দলে, কাতারে-কাতারে মানুষ জাহাজ নৌকো বোঝাই করে অথবা মাইলের পর মাইল পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে আধমরা শরীরটাকে কোনোরকমে এনে ফেলতে লাগলো কলকাতায়। তাদের মুখে শোনা গেল ওখানকার কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের কাহিনী; কেবল শেতাঙ্গদের জন্যেই কেমন করে সমস্ত এয়ার প্যাসেজ রাতারাতি বুক হয়ে গিয়েছিল এবং একটি শেতাঙ্গও যতদিন ওখানে ছিল কর্তৃপক্ষের কেমন ব্যস্ততার অন্ত ছিল না। আর কালা-আদমীদের ভাগ্যে জুটেছিল খালি অমানুষিক অপমান আর অবহেলা। কিভাবে 'শাদা রাস্তা' আর 'কালা রাস্তা'র সৃষ্টি হল, কেমন করে বাঙালী কর্মচারী ও তাদের পরিবারদের দ্বিধামাত্র না করে ফেলে রেখে তেলকলের সাহেবরা অফিসের সব টাকা, মেমসাহেব আর পালিত কুকুর নিয়ে মোটরে করে শাদা রাস্তা দিয়ে ভারতের দিকে চলল।"

(বীণা দাস—শৃঙ্খল ঝঙ্কার, পৃঃ ৯৫)

বসল। সে এক মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। বাঙালীরা কলকাতা মহানগরী ছেড়ে ছোটো ছোটো মফঃস্বল শহরে এবং মফঃস্বল শহরবাসীগণ আরো অন্তরালবর্তী গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ে ধনপ্রাণ বাঁচাতে ছুটলেন। ধনী ব্যক্তিগণ একেবারে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কাশী, গয়া ইত্যাদি উত্তর ভারতের দিকে পলায়ন করলেন। ব্রিটিশ সরকার জাপানী বোমার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কলকাতা মহানগরীতে বড়ো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ অট্টালিকার সামনে Baffle Wall গড়ে তুলেছেন। আমাদের বরিশালের মতো খোলামেলা মফঃস্বল শহরে বাড়িগুলির প্রাঙ্গণে নানা প্যাটার্নের Zigzag Trench খনন কাজে ব্যস্ত—যাতে আকাশে উড়োজাহাজ দেখামাত্রই, অথবা সাংকেতিক সাইরেন ধ্বনি শোনামাত্র সুড়ুক করে ট্রেঞ্চের তলায় ঢুকে পড়ে আশ্রয় নিতে পারি।"[৪৩] বীণা দাস কলকাতা থেকে কাতারে কাতারে মানুষের পালিয়ে যাবার অন্যতম কারণ হিসেবে বর্মা থেকে আসা মানুষগুলির উপর সেখানকার কর্তৃপক্ষের অমানবিক অত্যাচারের উল্লেখ করেছেন।

এই বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ শাসকরা তাদের আত্মরক্ষার দায়ভাগ ভারতবাসীকে নিতে বললে কংগ্রেস বেঁকে বসল। গান্ধীজী জানালেন একমাত্র 'স্বাধীনতার শর্তে'ই তাঁরা এই যুদ্ধে ইংরেজকে সহায়তা দিতে পারেন। মণিকুন্তলা সেন, কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখের স্মৃতিকথায় এই সময়কার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ক্রীপস মিশন ভারতে এলেন। তবে তাদের শর্তাধীন স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল না। "১৯৪২-র ৮ আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হল। গান্ধীজীর প্রস্তাব পাশ হল—'কুইট ইন্ডিয়া—ভারত ছাড়ো।' "কমলা দাশগুপ্তের কথায়, '১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। উদ্বেলিত জনসাধারণকে আর আটকে রাখা যাচ্ছে না। সংগ্রামের ক্ষেত্র তখন পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত, দেরি করলে সময় বয়ে যাবে, ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যাবে। ৮ আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল। সহজ ছোট্ট ভাষায়

গান্ধীজীর প্রস্তাব পাস হল—'কুইট ইন্ডিয়া—ভারত ছাড়ো'।"[৪৪] গত কুড়ি বছরের সঞ্চিত শক্তি নিয়ে যেন মরিয়া হয়ে আন্দোলনে নেমে পড়লেন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। দেশের সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলা হল যদি তাদের নির্দেশ দেবার অবকাশ না থাকে, "তখন সংগ্রামরত প্রতিটি নরনারী নিজেই নিজের নেতৃত্ব করে সংগ্রাম পরিচালিত করে যাবে। এবারে স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে।"[৪৫] গান্ধীজী বললেন, যদি সমগ্র বিশ্ব, সারা ভারতবর্ষও তাঁকে ফিরে যেতে বলেন তবুও তিনি এগিয়ে চলবেন—"আমি এবং কংগ্রেস আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, 'Congress will do or die'—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।"[৪৬] গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল সমগ্র দেশবাসী। আন্দোলন শুরুর মুখেই গান্ধীজী সহ

শান্তিসুধার কথায়,

"১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট গান্ধীজী ব্রিটেনকে দিলেন চরম নির্দেশ 'ভারত ছাড়ো'। এবং আমাদের জন্য রেখে গেলেন 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র আহ্বান। সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ হলেন কারাগারের অন্তরালে।

৯ আগস্ট। আর বসে থাকা চলে না। এবার আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার দিন এসেছে। বি. এম. কলেজে আর একজন অধ্যাপক ছিলেন প্রফুল্ল রঞ্জন চক্রবর্তী। তিনিও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং পুলিশের চিহ্নিত ও পূর্ব লাঞ্ছিত। তিনিও অধীর হয়ে উঠলেন। কলেজের অধ্যাপকদের কক্ষে আমরা দুজনে আলোচনায় রত হলাম, কোন্ পন্থায় কাজ আরম্ভ করা যায়। কলেজের ছাত্রগণ কলেজে ও বাড়িতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল পথনির্দেশের জন্য। কোন্ পথের নির্দেশ দেব? পথ কি আমরাই জানি? গান্ধীজী শুধু বিরাট আত্মাহুতির আহ্বান জানিয়ে গেলেন, আর বলে গেলেন,—সময় নেই, তোমরা দেশবাসিগণ যে যেভাবে পার নিজ নিজ বিবেকের আলোতে মশাল জ্বালিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।"

—শান্তিসুধা ঘোষ, জীবনের রঙ্গমঞ্চে, পঃ ৮৬।

অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতাকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করলেও আন্দোলন প্রচণ্ড উদ্দীপনায় সমগ্র দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। কমলা দাশগুপ্তের স্মৃতিতে, "নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতি যেন খেপে উঠলো। ঠিক বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো সমস্ত দেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়লো। হাল ধরতে সেদিন নেতার প্রয়োজন হয়নি। সবাই নিজেই নিজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী বলেছেন, 'কুইট ইন্ডিয়া' সমগ্র জাতিও পণ করেছে ইংরেজকে 'কুইট ইন্ডিয়া' করিয়েই ছাড়বে। গান্ধীজী বলেছেন, 'do or die' আমরা পেয়েছি তার অনুলিপি। এবং পেলাম একটা বিরাট প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে রয়েছে থানা দখল করে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার ধারা।"[৪৭] শুরু হল ব্রিটিশ সরকারের চূড়ান্ত নির্যাতন। বেপরোয়াভাবে চললো লাঠিচার্জ, গুলি, কংগ্রেস বেআইনী হল, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হল, সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হল। '৪২-এর আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গ্রেপ্তার হবার পর গান্ধীপন্থী বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ সক্রিয় হয়ে উঠল। এখানে মেয়েদের ভূমিকাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমলা মুখোপাধ্যায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বাংলার মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন, "বহু মহিলা কুমিল্লা, বরিশাল, নোয়াখালি, বাঁকুড়া, কাঁথি, আরামবাগে এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। সিউড়ির শতদল সরকার প্রভৃতি

বহু মহিলারা বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থেকে গুপ্তভাবে প্রকাশিত ইস্তাহার বিলি করেছেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের প্রধান বাড়ির দেওয়ালে ইস্তাহার এঁকে মুদ্রিত করে সেখানকার মহিলা ও অন্যান্য কর্মীদের মারফৎ বিলি করেছেন জেলার বিভিন্ন স্থানে। সিউড়ীর মহিলারা ১৯৩০ এর আন্দোলন থেকেই খুব সক্রিয় ছিলেন—তাছাড়া গঠনমূলক কাজের ফলে বহু মহিলা তাদের দলভূক্ত ছিলেন। এর মধ্যে সুরমা ও সুষমা পালিতদের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত, কৃষক ও খেটেখাওয়া পরিবারের মেয়েরাও তাদের পরিবারের অন্যান্যদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন ও কারাবরণ করেন—স্থানাভাবে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া গেল না। কলকাতায় বহু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাশ বয়কট করে নানাভাবে '৪২-এর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল বটে, ট্রাম ইত্যাদিও পোড়ান হয় তবে গ্রামের তুলনায় তার তীব্রতা কম। পুলিশের অত্যাচার ও কিছু রাজনৈতিক দলের (কম্যুনিস্ট পার্টি) অন্য ধরনের যুদ্ধমুখী প্রচারই এর কারণ।

বি. ডি. দলের হেলেনা দত্ত, বহুদিন পর্যন্ত বাইরে থাকতে পেরেছিলেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন গ্রামে নৌকা করে ঘুরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়ে গেছেন, গ্রেপ্তার হবার পূর্ব পর্যন্ত।"[৪৮] বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলায় চলেছে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। মেদিনীপুর তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম থানা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। তমলুক থানা অধিকার করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন আট হাজার বিদ্রোহী। এগিয়ে এলেন ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী থানা দখল করতে। পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করল। কিন্তু কোন বাধাই বাধা নয়, এগিয়ে চললেন তিনি। মাতঙ্গিনী হাজরার অভিযানের জীবন্ত বর্ণনা পাই কমলা দাশগুপ্তের স্মৃতিকথায়—"শহরের আর একদিক থেকে আসছে আর একটি বিপুল বাহিনী। তার নেতৃত্ব করছেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তিয়াত্তর বর্ষীয়া বৃদ্ধা থানা দখল করতে চলেছেন। ইংরেজ গুলি বর্ষণ করতে লাগলো। একে-একে মাতঙ্গিনী হাজরার দু'খানা হাতই গুলিবিদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তখনো দৃঢ় মুষ্টিতে উঁচু করে ধরা আছে কংগ্রেসের জাতীয় পতাকা, তখনো এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সৈন্যদের আহ্বান করে বলে চলেছেন তিনি, 'ভাইয়ের বুকে গুলি চালিও না, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করো।' তার উত্তরে আর একটি গুলি এসে তাঁর ক্ষীণ দেহটিকে ধরাশায়ী করে দিলো। রক্তাপ্লুত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে তখনো উঁচু হয়ে উড়ছে জাতীয় পতাকা।"[৪৯] মাতঙ্গিনী হাজরার মতোই মেদিনীপুরে পুরুষের পাশাপাশি সমান সংখ্যায় এগিয়ে এসেছিল মেয়েরাও, দেশের স্বাধীনতা আদায় করে নিতে। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিও এই আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় ছিল। তাদের নেতৃত্বে ক্ষিপ্ত জনগণ বেললাইন উপড়ে, স্টেশন-পোস্ট অফিস সমস্ত জ্বালিয়ে দিল। গভর্ণমেন্টের গুদাম লুঠ করে, টেলিগ্রাফের তার কেটে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিতে শুরু করল। কৃষকেরা জমিদারের কাছারি লুঠ করল, শ্রমিকেরা ধর্মঘট করল, ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল-কলেজে পিকেটিং শুরু করল। কমলা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "আগস্ট আন্দোলন যদিও দেশের সর্বত্র সমানভাবে হয়নি, কিন্তু যেখানে যেখানে যে প্রদেশে হয়েছে তার ব্যাপকতা ছিল খুব বেশী। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী নয়—কৃষক ভূমিহীন চাষী ও সাধারণ লোক, উপজাতি গোষ্ঠী বহু

জায়গায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সরকারি অফিস, থানা প্রভৃতিতে জাতীয় পতাকা তুলেছে, রেললাইন তুলে ফেলেছে, টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, ব্রিটিশ শাসনের যা কিছু প্রতীক তাকে ধ্বংস করেছে—মৃত্যুর বা গুলির পরোয়া না করে—এইটাই এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। সিপাহী বিদ্রোহের চাইতেও এই আন্দোলন বহু শ্রেণীর মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল যাতে ব্রিটিশ শাসকরা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। মনে রাখতে হবে কংগ্রেস নেতারা তখন সবাই কারাগারের অন্তরালে—যাঁরা বাইরে ছিলেন—তাঁরাও কিছুদিনের মধ্যে ধরা পড়ে যান। তখন জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়—। কী ছিল তাদের লক্ষ্য—? চিরদিন শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়েছিল তাঁরা—এটাই এবারকার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন সরকার গঠিত হয় তারাই বিচার, খাদ্য বণ্টনের ভার নেয়—ট্যাক্স আদায় করে—কোনও কোনও স্থানে ১৯৪৫ সাল অবধি সেই স্বায়ত্তশাসন চালু ছিল—তবে বেশীরভাগ স্থানেই ১/২ বছরের মধ্যেই আন্দোলনের তীব্রতা কমে যায়—নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর গুলি চালনা ও অত্যাচারের সামনে নিরস্ত্র জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে পারেনি—মনে হয় যদি সমগ্র দেশের লোক সামিল হত—তাহলে হয়তো একটা অঘটন ঘটে যেতে পারতো—দেশ বিভাগ হয়তো হত না।”[৫০] কমলা মুখোপাধ্যায়ের লেখায় সোস্যালিস্টদের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়,—“উপরের সারির কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হলে নেতৃত্ব চলে যায়—কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের হাতে। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তার কয়েকজন সঙ্গী জেল থেকে পালিয়ে গুপ্তভাবে আন্দোলন চালনা করেন। সুচেতা কৃপালনী, অরুণা আসফ আলি খুব সক্রিয়ছিলেন, বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সুচেতা কিছুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হন—অরুণা আসফ আলী বহুদিন পলাতক থেকে আন্দোলনে সাহায্য ও চালনা করেছেন—সমর্থকের অভাব হয়নি—বিড়লা প্রমুখ শিল্পপতিরা থেকে সাধারণ মানুষ আশ্রয় ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন।......বোম্বাই-এর তখনকার আগস্টক্রান্তি ময়দানে (গোয়ালিয়র ট্যাঙ্কে) ৯ই পতাকা তোলার কথা ছিল মৌলানা আজাদের। তাঁরা তো সব গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখন স্বল্প পরিচিতা অরুণা আসফ আলী পতাকা তুললেন। বোম্বাই-এর উমা সেন মেহতা গুপ্ত বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করে যোগাযোগ রাখতেন—ইনি এঁর অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিশদভাবে লিখছেন। এদের আর একজন সহকারিণী ছিলেন জয়াবতী সাঙভি।”[৫১]

গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৩ (১৬-১৭ জানুয়ারি)-এ গোপনে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কলকাতার বাড়ি থেকে পেশোয়ার হয়ে কাবুলে পৌঁছান ২৬ জানুয়ারি। পেশোয়ার থেকে উপজাতি এলাকা পেরিয়ে কাবুল যাওয়ার পথে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিলেন জগতরাম তলোয়ার। কাবুলে ৪৫ দিন তাঁকে গোপনে রেখে জগতরামই এক ইটালিয়ান বিমানে তাঁকে রোম-বার্লিনের পথে রওনা করে দেন। জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, ‘ভাই বান্দ’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে রেডিওতে বলা শুরু করেন। কাজের সুবিধার জন্য ’৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি জার্মানি ছেড়ে গোপনে সাবমেরিনে সুমাত্রা দ্বীপে পৌঁছান। ৪ জুলাই ১৯৪৩ বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁকে নেতৃত্বে অভিষিক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল

আর্মির সর্বোচ্চ সেনাপতি নির্বাচিত হন এবং একটি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। আই. এন. এ.-র অংশ হিসেবে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের পরিচালনায় ঝাঁসি রেজিমেন্ট নামে একটি নারী বাহিনীও গড়ে তোলা হয়। হেনা চৌধুরীর নিবন্ধে ঝাঁসি রানি বাহিনীর কয়েকজন নারী সৈনিকের কথা জানা যায়। সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় মিলিটারি ট্রেনিং দিয়ে নেতাজি মেয়েদের তৈরি করেছিলেন। লক্ষ্মী স্বামীনাথন এবং জানকী থিবার্সের নেতৃত্বে মিলিটারি ট্রেনিং পাওয়া, সামরিক পোষাকে সুসজ্জিত মেয়েরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। ঝাঁসি রানি বাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট প্রতিমা সেন বলেছেন যে নেতাজী বলতেন, "আমার আজাদ্ হিন্দ ফৌজ যদি কখনও ভারত অধিকার করে তবে ঝাঁসির রানি বাহিনী থাকবে সর্বাগ্রে।"[৫২] অরুণা চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও মেয়েরা কিভাবে ট্রেনিং-এর মাধ্যমে উপযুক্ত সৈনিক হয়ে উঠত, তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৪৩-র ডিসেম্বর মাসে মাত্র ১৪/১৫ বছর বয়সে তিনি যোগ দিয়েছিলেন আজাদ্-হিন্দ্-ফৌজে। তাঁদের ক্যাম্পে বারো জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র বাঙালি মেয়ে। তাঁর নিজের কথায়— "তখন আমার বয়স ১৪/১৫ বছর। ঝাঁসির রানি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম নিদারুণ স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা নিয়ে নয়, তখন যুদ্ধের জন্য স্কুল বন্ধ, করার কিছু নেই। তাই যোগ দিয়েছিলাম রাসবিহারী বসুর ইনডিপেনডেন্স লিগ-এ। ইতিমধ্যে একদিন সেখানে নেতাজি এলেন। মা'ও গেলেন সঙ্গে। মনে আছে মা নেতাজির ফান্ডে নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন। তারপর নেতাজির আহ্বানে আমরা যোগ দিলাম ঝাঁসির রানি বাহিনীতে। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর। আমাদের ক্যাম্পে ১২ জন মেয়ের মধ্যে আমিই একমাত্র বাঙালি ছিলাম। পুরোপুরি সামরিক কায়দায় নেতাজি আমাদের তৈরি করেছিলেন। ম্যাপ রিডিং, পিটি, রাইফেল ও বন্দুক ছোঁড়ার ট্রেনিং, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস ও জিওগ্রাফি সবই আমাদের শিখতে ও পড়তে হত। আমি বরাবরই সব বিষয়ে ফার্স্ট হতাম। তাই খুব তাড়াতাড়ি হাবিলদার থেকে অফিসারের পদে উন্নীত হয়েছিলাম।"[৫৩] লাবণ্য চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'মেমিও বেস ক্যাম্পে'র ওটি নার্স। সেখানে যুদ্ধে আহত 'জোয়ান ভাইদের' সেবা

> *লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়ের নিজের কথায়, "আমি ছিলাম মেমিও বেস ক্যাম্পের ওটি নার্স। কারণ নার্সিং-এর দক্ষতা আমার আগেই ছিল। খুব মনপ্রাণ দিয়ে আমি জোয়ান ভাইদের সেবা করতাম। আর করতাম অপারেশনের সময় ডাক্তারদের সহযোগিতা। নেতাজি মাঝে-মাঝেই হাসপাতাল পরিদর্শন করতে আসতেন।" ঝাঁসি বাহিনীর রানিরা—হেনা চৌধুরী-চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ২২ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃঃ ১০।*

করতেন। অপারেশনের সময় ডাক্তারদের সাহায্য করতেন। তাঁর স্বামী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীতে।

শান্তশ্রী মজুমদারের মা তাঁকে আর তাঁর ছোট বোনকে লক্ষ্মী স্বামীনাথনের কাছে দিয়ে আসেন। রেঙ্গুনের কামায়ুট ক্যাম্পে জানকী থিবার্সের পরিচালনায় তাঁরা ট্রেনিং নিয়েছিলেন। শান্তশ্রী আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর সিক্রেট সার্ভিসে নির্বাচিত হয়েছিলেন—"আমরা দশ-বার জন নির্বাচিত হয়েছিলাম সিক্রেট সার্ভিসের জন্য। মনে আছে স্বয়ং নেতাজি আমাদের সাক্ষাৎকার নেবার সময় বলেছিলেন, ভেবে দ্যাখো তোমরা এ কাজ পারবে কিনা? এ কাজ

যখন করবে তখন বাড়ি বা কোনও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। আর এ কাজ তোমাদের করতে হবে সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে। আমরা রাজি হয়েছিলাম। আর নিজের আঙুল কেটে নেতাজির কপালে জয়তিলক পরিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের এ সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে নেতাজি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।"[৫৪] নেতাজির স্বপ্নে গড়া আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর এক অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছিলো ভারতীয় তথা বাঙালি মেয়েরাও। নেতাজির তত্ত্বাবধানে যথোপযুক্ত ট্রেনিং পেয়ে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলার মুহূর্তে কংগ্রেসের মূল বক্তব্য ছিল যে, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। সুতরাং এতে একটি পয়সা বা লোকও প্রাণ দেবে না। কমিউনিস্ট পার্টিও তখন চেয়েছিল সমস্ত দলের সম্মিলিত নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে, দেশের সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করতে।

> *"মহাসমরের অগ্নিশিখা যতই আকাশচুম্বী হয়ে উঠতে লাগল, ততই ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে স্বাধীনতা নিয়ে দরকষাকষি শক্ত হতে আরম্ভ করল। কংগ্রেস নেতাদের তো কথাই নেই, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিও প্রবলভাবে এই যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠল। তারা দলে-দলে মিছিল, মিটিং ও স্লোগানে নেমেছে। একটি ছবি এখনো পরিষ্কার চোখের সামনে ভাসছে—কলেজের কালীপ্রসন্ন হলে বিরাট ছাত্রসভায় থার্ড ইয়ারের ছাত্রী কম্যুনিস্ট শোভা রায় তর্জনী আস্ফালন করে বক্তৃতা দিচ্ছে—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ সরকারকে এক কানাকড়ি দিয়েও সাহায্য করব না।*
>
> *কিন্তু হরি হরি। যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাশিয়া যখন অকস্মাৎ জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বসল, তখন রাতারাতি চলন-বলন একেবারে পাল্টে গেল। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" নিমেষ মধ্যে "জনযুদ্ধে" পরিণত হল। "Peoples War" ও "জনযুদ্ধ" নাম দিয়ে দুখানি ইংরাজি ও বাংলা সাপ্তাহিক বাজারে আবির্ভূত হয়ে পড়ল। তার মধ্যে রটনা হতে লাগল, সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। তার ভক্তগণ ভারতের বুকে অক্ষশক্তির পঞ্চমবাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতুক অনুভব করলাম তো বটেই, বিস্ময়ে অভিভূত না হয়েও পারিনি। কোন সুস্থ মস্তিষ্ক রাজনীতিক দল বা ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে এমনভাবে নিজ মতবাদ পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে কী করে?"*
>
> *শান্তিসুধা ঘোষ-জীবনের রঙ্গমঞ্চে, পৃঃ ৮৫-৮৬*

হরতাল, ধর্মঘট এবং গণসত্যাগ্রহের মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ বিরোধী প্রচারে নেমেছিল। কিন্তু '৪১-এর জুনে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মত বদলে গেল। মণিকুন্তলা সেনের কথায়, " '৪১ সনের শেষদিকে এল পার্টির নতুন লাইন। এ যুদ্ধ জনতার যুদ্ধ, এ যুদ্ধ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধ। সুতরাং এ যুদ্ধে ইংরেজকে যেভাবে আমরা আক্রমণ করতাম—এখন আর তা করা চলবে না। 'স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও' নামক পুস্তিকায় আমাদের পার্টি লাইন প্রচারিত হলো"[৫৫] কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকেও মণিকুন্তলা নিজে এই পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছেন খুব সুন্দরভাবে, যথেষ্ট যুক্তি সহকারে। পার্টির এই হঠাৎ মত পরিবর্তনে তাঁদের মত কর্মীরা অত্যন্ত মুস্কিলে পড়েছিলেন। '৪২-এ আবার কমিউনিস্ট পার্টির নতুন লাইন বেরলো।

জনযুদ্ধ কাগজে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে নানারকম কটূক্তি ও ব্যঙ্গ শুরু হল। সুভাষচন্দ্রের প্রথমে জার্মানী এবং পরে জাপান যাওয়া কমিউনিস্ট পার্টি ভাল চোখে দেখেননি। কংগ্রেসও তখন সমর্থন করেনি সুভাষচন্দ্রকে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মত তাঁকে আক্রমণ করেনি। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ কমিউনিস্টদের উপর বিরূপ হয়ে উঠল। মণিকুন্তলা সেনের কথায়, 'আগ বাড়িয়ে যে কলঙ্ক তাঁকে আমরা দিলাম—তা তাঁর গায়ে লাগেনি। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।"[৫৬] কমিউনিস্ট পার্টির এই নতুন মত নিয়ে, আবার নতুন করে সাধারণ মানুষকে বোঝাতেও খুব অসুবিধা হচ্ছিল কর্মীদের। মণিকুন্তলা বলেছেন, "সাধারণ লোককে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের ঔচিত্য সম্পর্কে বোঝাতে আমরা সত্যিই হিমসিম খেতাম। কাল যেখানে বলেছি—'এ যুদ্ধে একটি মানুষ, কিংবা একটি পয়সা নয়' আজই আবার কি করে বোঝাই—'এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ'।"[৫৭] কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছেন মণিকুন্তলা, কিন্তু তাঁদের মতবাদ থেকে অনেক দূরে থেকে কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন শান্তিসুধা ঘোষও অনেকটা একই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ও মতবাদকে।

আগস্ট বিপ্লব, মেদিনীপুরে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী প্রচার, সমস্ত কিছুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে আসাম সীমান্তে এগিয়ে আসতে লাগলো সুভাষচন্দ্রের আজাদ্ হিন্দু ফৌজ। এই সমস্ত কিছুকে রোধ করতে পূর্ব পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেল 'Man made famine'—'৪৩-এর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। এই অবস্থাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কমলা দাশগুপ্ত—"এইভাবে বাংলায় পশ্চিমপ্রান্তে মেদিনীপুরে রইলো জাতীয় সরকার। ওদিকে পূর্বপ্রান্তে আসামের সীমান্তে এগিয়ে আসছে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ। যে-কোনো সময়ে তারাও বাংলাদেশে এসে পড়তে পারে। তার ফলে সমস্ত বাংলায় একটা বিদ্রোহী জাতীয় সরকার গড়ে উঠতে পারে। এই সম্ভাবনাকে রোধ করতে ও জাপানকে আটকাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী একটা 'Man made famine' অর্থাৎ মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এনে ফেললো ইংরেজ ১৯৪৩ সালে।"[৫৮] এই দুর্ভিক্ষে ৪/৫ টাকা চালের মণ উঠে গেল ২৮ টাকায়। একদিকে সরকার সৈন্যদের জন্য সমস্ত চাল মজুত করতে শুরু করল, বাদবাকী সবই চলে গেল কালোবাজারে। সেখান থেকে বেশি পয়সা দিয়ে সানন্দে জিনিস কিনতে লাগল পয়সাওয়ালা মানুষ। সাধারণ মানুষ না খেতে পেয়ে মরতে লাগল। গ্রাম উজাড় করে মানুষ চলে আসতে শুরু করল শহরে। গ্রামের কৃষক পরিবার হয়ে উঠল শহরের ফুটপাথবাসী ভিখারী। অন্নের উৎপাদনকারী কৃষক শহরের রাস্তায় ফেন চেয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের মেয়ে বৌদের সম্মান নিলামে উঠল একখানা শাড়ি বা একদিনের খাবারের বিনিময়ে।

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বাংলার কৃষকদের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্ত দিক থেকে বিপর্যস্ত করে দিল। অধিকাংশ কৃষক পরিবারই সমস্ত কিছু হারিয়ে পথের ভিখারী হয়ে পড়ল কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ, সঙ্কট তাঁদের শিখিয়ে দিল বাঁচার লড়াই। ক্রমশ তারা সচেতন হয়ে উঠল, নিজেদের অধিকার আদায় করতে শিখল। তারা বুঝতে পারল যে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে জোতদার, আধিয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেদের

বীণা গুহ'র কথায়," কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির বিস্তৃত গ্রামাঞ্চল জুড়ে। এই আন্দোলনে দিনাজপুর ছিল পুরোভাগে। দিনাজপুর জেলাতেই চারটি অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে শহীদত্ব বরণ করল পাঁচজন মহিলা সহ ৪০ জন কৃষক। আর এই আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে এসে দাঁড়িয়েছিল হাজারো কৃষক বীরাঙ্গনা রমণী। পুরুষ কৃষকদের সঙ্গে তাদের আত্মত্যাগ, সশস্ত্র পুলিশ ফৌজের সঙ্গে সংগ্রাম, তাদের কর্মকুশলতা ও সাংগঠনিক কর্মক্ষমতা ছিল অভূতপূর্ব, অবর্ণনীয়।" বীণা গুহ, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে দিনাজপুরের কৃষক মেয়েদের ভূমিকা ও তেভাগা আন্দোলনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল স্থান', 'চলার পথে' মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ ১৪।

বাঁচার অধিকার আদায় করে নিতে হবে। '৪৩-র ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের তিন বছরের মাথায় ধান কাটার মরসুমে দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদা, মেদিনীপুর, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় শুরু হয় 'তেভাগা আন্দোলন'। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের কৃষকরা এগিয়ে এল ফসলের আধাআধি ভাগের পরিবর্তে দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে। এই আন্দোলনের একদম প্রথম সারিতে এসে দাঁড়াল গ্রামের কৃষক মহিলারা।

প্রথমে এই আন্দোলনে কৃষক মেয়েরা তেমনভাবে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের ঘরের পুরুষরাও চাইত না যে মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে ফসল বাঁচানোর আন্দোলন করুক। তবে তারাও তো পুরুষদের সঙ্গে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাঠে কাজ করত, বীজ বুনত, ফসল ফলাত ; কৃষক সভা তাই তাদেরও আকর্ষণ করত। আড়াল থেকে তারা সভায় নেতাদের বক্তব্য শুনত কিন্তু "পুরুষ কৃষকরা টের পেয়ে হাহা করে উঠতো—আরে আরে ইধে বেটিছাওয়া গুলান কেনে? তোরা কি বুঝবু? যা যা আন্নাঘরে (রা কে ওরা আ বলতো)। বুকভরা অতৃপ্ত বাসনা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেয়েরা চলে আসতো। এই কৃষক মেয়েরা আস্তে আস্তে কৃষক সমিতিতে স্থান করে নিল নিজ অধিকার বলে।"[৫৯] ক্রমশ নিজের অধিকার নিয়ে তারা এগিয়ে আসতে লাগল। কৃষকদের ফসল বাঁচানোর আন্দোলন কৃষক মেয়েদের আর ঘরে থাকতে দিল না, তারা বেরিয়ে এল। তেভাগা আন্দোলনে কৃষক মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলেছেন বীণা গুহ, "তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে গ্রামে গ্রামে। সভা সমাবেশে মিছিলে গ্রামগুলি হয়ে উঠেছে জীবন্ত। এমনি এক সভা চলছে ঠাকুরগাঁর একটি গ্রামে। সভাতে ঢুকে পড়লো গ্রামের ডাকাবুকো কৃষক মহিলা জয়মণি। পেছনে তার এক দঙ্গল মেয়ে। জয়মণি এক কমিউনিস্ট নেতার দিকে তাকিয়ে বলল—হামরা কেনে শুনিম না তুর কথা। হামরা বেটা ছাওয়ালের সঙ্গে মাঠে কাম করি না? জোতদার গুলান হামাদের গায়ের মাংস গুলান ছিঁড়ে খায় না? হামরা লড়াকু। তেভাগার লড়াই—হামাদের সকলের লড়াই। কৃষক নেতা বল্লেন—হ তুমরাও কৃষক সমিতির মেম্বার। তুমরাও ভলন্টিয়ার। বিপুল উল্লাসে কৃষক মেয়েরা আওয়াজ দিল—জান দিব—তবু ধান দিব না। যোগ দিল কৃষক সমিতিতে।"[৬০] এই যুদ্ধে অস্ত্রধারী পুলিশ ও জোতদারের ভাড়াটে গুণ্ডার পরিবর্তে নিরস্ত্র কৃষকদের বাঁচাতেই এগিয়ে এসেছিলেন তাদের ঘরের মেয়ে-বৌরা দা, বঁটি, লঙ্কার গুড়ো নিয়ে।" 'পুলিশ আসছে' টের পেলে মেয়েরাই শঙ্খধ্বনি করে গ্রামবাসীদের

কাছে সংকেত পৌঁছে দিত। ছেলেরা তখন জঙ্গলে চলে যেত। আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও করত ঐ মেয়েরাই। মেয়েদের সঙ্গে পুলিশের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে। ধানের গোলায় আগুন দিলে মেয়েরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন নেভাতে যেত। তারা মার খেত, অত্যাচারে জর্জরিত হত, আবার যা পেত তাই দিয়ে মারত—তবু পুরুষদের সামনের সারিতে আসতে দিত না।"[৬১] এই মেয়েরাই একদিন চোখের সামনে দেখেছে সোনার ধানে ভরে উঠেছে তাদের ঘর, আবার তারাই দুর্ভিক্ষের সময় চোখের সামনে স্বামী সন্তানকে না খেতে পেয়ে শহরের ফুটপাথে শুকিয়ে মরতে দেখেছে। স্বার্থান্বেষী মানুষ ছিনিমিনি খেলেছে তাদের মানসম্মান নিয়ে। ক্ষোভ-জ্বালা-যন্ত্রণা ও অক্ষম অসহায়তার যে আগুন তাদের মধ্যে জ্বলেছিল তা যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তেভাগা আন্দোলনে যুক্ত কৃষক মেয়েদের বুকে। বীণা গুহ বলছেন, 'প্রথম পর্যায়ে কৃষক মেয়ে ভলান্টিয়ারদের কাজ ছিল—আত্মগোপনকারী কৃষক নেতাদের চোখের মণির মত রক্ষা করা। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শহরে গোপনে চিঠিপত্র দলিল প্রভৃতি খবরাখবর আদান-প্রদান করা। জোতদার পুলিশদের কাজের খবর গোপনে সংগ্রহ করে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া, আহত অসুস্থ কমরেডদের সেবা শুশ্রূষা করা। কৃষক নেতারা ভয়ে ভয়ে ভাবতেন তারা এসব কাজ পারবে তো। কিন্তু সব ভয়কে জয় করে এই কাজে অনভিজ্ঞ কৃষক মা মেয়েরা যে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছিল তা অবর্ণনীয়—অভূতপূর্ব।

ক্রমে ক্রমে তারা প্রকাশ্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়ল। একেবারে রাইফেলধারী পুলিশ ফৌজের সাথে সম্মুখ সমরে। জোতদারদের বাড়িতে বেগার খাটত, এবং ক্রীতদাসীর মত জীবন-যাপন করত যে কৃষক মেয়েরা তারাই তেভাগার জোয়ারে কাটা ধানের আঁটি মাথায় করে বীরদর্পে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিজ খেলানে ধান তুলতে শুরু করল। আওয়াজ তুলল—নিজ খেলানে ধান তোল। আধি নয়, তেভাগা চাই। এমনি ছিল কৃষক মেয়েদের অপরিসীম সাহসিকতার নিদর্শন।"[৬২] গ্রামে পুলিশ ঢুকলেই শঙ্খ, ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাই 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলত। সেই শব্দ কানে যাওয়া মাত্র যে যেখানে থাকতো সমস্ত মেয়েরা ঝাঁটা, লাঠি, দা, যা হাতের কাছে পেত নিয়ে এসে পুলিশের পথ আটকে দাঁড়াত। তার সঙ্গে তাদের আঁচলে বাঁধা থাকত ধুলো আর লঙ্কার গুঁড়ো, প্রয়োজনে পুলিশের চোখে ছুঁড়ে মারার জন্য। ধান কাটার সময় অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্যে জোতদাররা কৃষকদের গুলি করে মারধোর করে সরিয়ে দিয়ে ধান নিজেদের গোলায় তুলে নিয়ে যেতে চাইত। সেই সময় মেয়েরা এগিয়ে এসে পুলিশের সঙ্গে বাঘিনীর মত লড়াই করত, জখম হত কিন্তু ভয় পেত না, অধিকার ছাড়ত না। ঠুমনিয়া গ্রামের একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বীণা গুহ—"ধান কাটা চলছে। এবার সশস্ত্র পুলিশবাহিনী কৃষকদের ধান কাটায় বাধা দিতে মাঠে নেমে পড়লো। ধ্বনি উঠল ইনক্লাব—মেয়ে-পুরুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মহিলা নেত্রী দীপশ্বরী পুলিশকে মাঠে নামতে দেখে তড়িত গতিতে গাইন হাতে পুলিশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্যান্য মেয়ের দলও গাইন হাতে দীপশ্বরীকে অনুসরণ করল। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী পিছু হটল। পুলিশ বাহিনীর দিকে গাইন উঠিয়ে দীপশ্বরী এক পা এক পা করে পুলিশের দিকে এগোতে

থাকে—ভীত পুলিশ বাহিনী যতক্ষণ না মাঠ ছেড়ে যায়। গাইন হাতে মেয়ের দলকে এগোতে দেখে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রাণ হাতে করে কোন মতে পালিয়ে বাঁচল। তখন কৃষক মেয়ে-পুরুষের জয়ধ্বনিতে ঠুমনিয়া গ্রাম মুখরিত। পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে প্রথম কৃষক মেয়ে দীপশ্বরীর এই অসম সাহসিকতার ঘটনা গ্রাম-গ্রামান্তরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। উৎসাহ-উদ্দীপনায় কৃষক মহিলারা উদ্বেলিত।"[৬৩] মেদিনীপুরের কেন্দেমারী গ্রামে এরকমই এক ঘটনার কথা জানিয়েছেন রেণু চক্রবর্তী—"মেদিনীপুরের কেন্দেমারী গ্রামে একটা পুলিশ ক্যাম্পের চারদিকের ক্ষেত থেকে কৃষকরা ধান তুলে আনতে গেলে বেদম মার খায় এবং তাদের পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কিষানেরা জমায়েত হতে থাকলে তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়, কাজেই তাদের চলে যেতে হয়। জোতদারদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা এবং পুলিশ স্থির করে যে তারা ধান তুলে নিজেদের গোলায় নিয়ে যাবে। কিন্তু স্বপ্নেও তারা ভাবেনি যে বিমলা মণ্ডল নামে মেয়েটি বঁটি, দা, কুড়ুল, ঝাঁটা হাতে একদল জঙ্গী মেয়েকে নিয়ে এসে চড়াও হবে ওদের ওপর। ওদের আঁচলে বাঁধা আবার ধুলো মেশান লঙ্কার গুঁড়ো। পুলিশ কাছে এলে তাদের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিল। পুলিশ প্রাণ নিয়ে পালাল। ঠিক এই সময়ে তিন-চার দল স্বেচ্ছাসেবক লাঠি হাতে ছুটে এল। পুলিশ পালাতে বাধ্য হল। নির্বিঘ্নে ধান কেটে পঞ্চায়েতের মরাইতে তোলা হল।"[৬৪] কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ময়মনসিংহ জেলার হাজংদের সংগ্রাম। ময়মনসিংহের গ্রামে গ্রামে তখন কৃষক আন্দোলনের জোয়ার। ১৯৩০ থেকেই শুরু হয়েছিল হাজং উপজাতিদের টঙ্ক আন্দোলন। গারো পাহাড়ের দক্ষিণে ৫০ মাইল লম্বা ও ১০ মাইল চওড়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। চল্লিশের দশকে '৪৭-এর কাছাকাছি সময়ে আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে ইস্টার্ন রাইফেল ফৌজ গ্রামে গ্রামে হানা দিতে শুরু করে। কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তার করতে না পেরে, পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে মেয়েদের উপর অত্যাচার করে। নেত্রকোনা মহকুমার বাহেরতলী গ্রামে সরস্বতী নামে একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করলে, হাজং নেত্রী রাসমনির নেতৃত্বে এগিয়ে আসে মেয়েরা। ভূমিহীন নিঃস্ব হাজং নারী রাসমনি হাজং মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট নারী বাহিনী।

হাজং কৃষক নেতা সুরেনের নেতৃত্বেও এক জঙ্গী কৃষক বাহিনী প্রস্তুত হয়। দুটি বাহিনী ছুটছে ব্রিটিশ ফৌজের ছাউনির দিকে। নারীত্বের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে এঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মোকাবিলা করে সশস্ত্র ফৌজের সঙ্গে।

সোমেশ্বরী নদীর তীরে চলে মরণজয়ী সংগ্রাম। নদীর ওপারে আধুনিক অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত ব্রিটিশ ফৌজ। এপারে তীর ধনুক বল্লম পাথরের টুকরো নিয়ে প্রস্তুত হাজং নরনারী। দুদিক থেকে আক্রমণ চালান তারা ফৌজের বিরুদ্ধে। তীর ধনুক আর পাথরের আঘাতে নাজেহাল ব্রিটিশ ফৌজ। মুহুর্মুহু গর্জে উঠেছে বন্দুকের রাইফেলের গুলি। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা

বীণা গুহ এই সময় গ্রামে গ্রামে নারী বাহিনী গড়ে ওঠার কথা জানিয়েছেন—"গ্রামে গ্রামে 'নারী বাহিনী' গড়ে উঠল মহিলা নেত্রীদের নেতৃত্বে। আত্মগোপনকারী নেতাদের গ্রেপ্তার করতে ধান কাটায় বাধা দিতে অথবা নিজ খোলানে ধান তুলতে বাধা দিতে যখনই পুলিশ

ফৌজ বা জোতদারদের গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ করতে আসত—এই নারী বাহিনীই তাদের সঙ্গে অকুতোভয়ে দুর্জয় সাহসে মোকাবিলা করত।

এমনই এক 'নারী বাহিনী' বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিল ২০শে পৌষ আটোয়ারী থানার রামপুর মলানি গ্রামে। "পুরুষরা ধান কাটে এবং মেয়েরা ধানক্ষেতের চারিদিকে আলের উপর দাঁড়িয়ে দা, বঁটি, ঝাঁটা, গাইন হাতে সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেয়। সশস্ত্র ফৌজ মেয়েদের বাধা সত্ত্বেও এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। দুর্ধর্ষ মেয়েরা তখন তাদের হাতিয়ার নিয়ে ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাইন দিয়ে পিটিয়ে ফৌজের ৫/৬টি বন্দুক ভেঙে দেয়। হাজার হাজার মেয়ে ভলান্টিয়ারদের আক্রমণে পরাজিত পুলিশবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। বাহিনী পরিচালনা করে রোহিনী এবং জয়মণি বর্ম্মনী।"

(বীণা গুহ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে দিনাজপুরের কৃষক মেয়েদের ভূমিকা ও তেভাগা আন্দোলনের তাদের গৌরবোজ্জ্বল স্থান, চলার পথে, মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ ২১-২২)।

ব্যাপী চলে অবিশ্রান্ত লড়াই। সোমেশ্বরী নদী রক্তে লাল। রাসমণি আর সুরেন দুই বাহিনীর নেতৃত্ব করেন। অপূর্ব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে চালিয়ে যান লড়াই। অবশেষে রণক্লান্ত অগ্নিকন্যা রাসমণি রণক্ষেত্রে বীরের মত প্রাণদান করেন। বীর নেতা সুরেনও মৃত্যুবরণ করেন। প্রাণদান করেন শঙ্খমনি, রেবতী, নীলমণি ও পদ্মমণি ও আরো কত অজানা বীর নারী। দুইজন ফৌজও নিহত হয়। পালিয়ে যায় অন্যরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে।"[৬৫] বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক মেয়েরা ক্রমশ সংগঠিত হয়ে উঠছিল। আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি তাদের এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিল। পুরুষদের সাহায্য ছাড়াই কৃষক মেয়েরা সংঘবদ্ধভাবে জোতদারদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কোথাও কোথাও বন্দুকধারী জোতদারদের কৌশলে বন্দী করে 'কৃষক আদালতে' হাজির করে। গ্রামে গ্রামে তখন গড়ে উঠেছিল কৃষক আদালত। সেখানে তারা নিজেরা অত্যাচারী জোতদারদের বিচার করত শাস্তি দিত, জরিমানা করত। কোন কোন গ্রামে দেখা গেল জোতদাররা তাদের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে থাকে। নারীবাহিনীর একাধারে ফসল বাঁচানো, জোতদার দমন এবং পুলিশ প্রতিরোধের খবর পাওয়া যেত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এরকমই এক ঘটনার কথা জানা যায় রাণী শঙ্কাইল থানার গুয়া গ্রামে। পুলিশের এক জমাদার সাহেবগ্রামে আত্মগোপনকারীদের ধরার জন্য গ্রাম ঘেরাও করে। বাঘা বর্মণ নামে এক কৃষক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে। ক্ষিপ্ত হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ লাঠি, দা, কুড়ুল, গাইন, তীর, ধনুক নিয়ে পুলিশ সহ জমাদার সাহেবকে গ্রেপ্তার করে। ভীত দারোগা সাহেব পুলিশকে গুলি চালাবার হুকুম দেয়। গুলিতে চারজন আহত হয়। ভাগুনী, রোহিনী ও ফুলেশ্বরীদের নারী বাহিনী নির্বিচারে পুলিশের উপর গাইন চালায়। ফলে ৫/৬ জন পুলিশ বন্দুক ছেড়ে পালিয়ে যায়। নারী বাহিনীও জমাদার সাহেবকে গ্রেপ্তার করে। তাকে একটা স্কুলঘরে আটক রেখে মেয়েরা ফেলে যাওয়া পুলিশদের বন্দুক, লাঠি নিয়ে পাহারা দেয়। ভাগুনী জমাদার সাহেবের বন্দুক কেড়ে কাঁধে ফেলে সারারাত 'বাহিনী'র সাথে বন্দি জমাদারকে সায়েস্তা করে।

গোপন হেড কোয়ার্টারে এই সংবাদ যায়। নেতারা নির্দেশ দেন জমাদারকে ছেড়ে দিতে। ভাগুনী জমাদারকে মুক্ত করার সময় বলে আর যেন কোনদিন ফৌজ গাঁয়ে না

ঢোকে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে তবে জমাদার সাহেব বন্দুক ফিরে পায়। কোনরকমে জীবন নিয়ে ফিরে যায়। গাঁয়ে গাঁয়ে নারী বাহিনীর পুলিশ ফৌজের সঙ্গে কত শত সংঘর্ষই হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।"[৬৬]

তেভাগার আগুন জ্বলে ওঠার কিছুদিন আগে '৪৬-এর জুলাই মাসে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতায় যে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়, সেখানেও মেয়েদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। মণিকুন্তলা সেন বলেছেন, "ধর্মঘট ছিল মূলত ডাক ও তার এবং টেলিফোন অফিসের কর্মচারীদের। কিন্তু সমর্থনে বেরিয়ে এলো স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সমস্ত সরকারি কর্মচারী। বেসরকারি অফিস দপ্তর, পরিবহন, কলকাতা বন্দর, রেল এবং রেডিও অফিস সমস্তই সেদিন ডাক ও তার বিভাগের সমর্থনে অচল হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের প্রচার কেন্দ্র রেডিও স্টেশন আগলে বসেছিল কিছু সাহেব ও পুলিশ বাহিনী। কারণ, রেডিও স্টেশনে তারা ধর্মঘট করতে দেবে না। কিন্তু কলকাতার সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।"[৬৭] কলকাতার বেতার কেন্দ্রটিকে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করেন ছাত্রী ও মেয়েরা। রাস্তা জুড়ে তাঁরা শুয়ে পড়েন। পুলিশ তাদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতে গেলে তাঁরা প্রতিবাদ জানান। পুলিশ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা ফাটে, রেডিও স্টেশন অচল হয়ে যায়। ইংরেজ কর্তাদের মেয়েদের গায়ে হাত তোলার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানান শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ডাক ও তার ধর্মঘটের ১৮ দিন পর ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভয়ঙ্কর মারণযজ্ঞ। ব্রিটিশ শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ বিভাগ, মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী সকলেই ছিলেন দর্শক। কলকাতার বুকে যথেচ্ছভাবে চলেছিল হিন্দু-মুসলমান নির্দোষ মানুষের যথেচ্ছ হত্যা। এই দাঙ্গা বিশেষভাবে বিপন্ন করেছিল হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের—যথেচ্ছভাবে ঘটেছিল নারী হরণ, ধর্ষণ। কলকাতার দাঙ্গার পরই শুরু হয়েছিল নোয়াখালির দাঙ্গা। সেখানেও লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী ধর্ষণই ছিল প্রধান। এরই মধ্যে দিয়ে এসে গেল বহু প্রতীক্ষিত

"......মি. জিন্না মুসলিম ভাইদের আহ্বান জানালেন, আগামী ১৬ আগস্ট ভারতব্যাপী "direct action" এর।

আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম "direct action" !! কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের নানা পর্যায়ে "direct action"-কে নানা ধরনে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি—মোটামুটি একই ধাঁচের। কিন্তু মুসলিম লীগের "direct action"-টি কী রূপ পরিগ্রহ করবে কে জানে? তাদের কাজের ধরনধারণ যে আলাদা।

কিন্তু ১৬ আগস্ট তারিখে শহীদ সুরাবর্দির নেতৃত্বে অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রিত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি কলিকাতা মহানগরীর বুকে যে বীভৎস রূপে নেমে এল, তা আমাদের কারো কল্পনায় আসেনি। উত্তর কলকাতায় মুসলিম অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ; "direct action"-এর প্রথম আঘাত এল সেখান থেকেই। ঘরে বা রাজপথে যেখানেই হিন্দু চোখে পড়েছে, সেখানেই মুসলমান গুণ্ডাদের শাণিত ছোরার কোপ, রক্তাক্ত ধুলার ওপরে মৃত ও আহত দেহের ছড়াছড়ি।" শান্তিসুধা ঘোষ—জীবনের রঙ্গমঞ্চে—পৃঃ ১০০।

স্বাধীনতা, ১৯৪৭-র ১৫ আগস্ট।—কিন্তু সে স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, খণ্ডিত স্বাধীনতা। মুসলিম লীগের 'লড়কে লেঙ্গে' পাকিস্তানের মাতামাতি হানাহানি বৃথা যায়নি। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল অখণ্ড বাংলাদেশ। দলে দলে হিন্দু পরিবার পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে লাগল। ভিটেমাটি, ক্ষেতখামার, গরু-বাছুর, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের কিছু কিছু মানুষও পড়ে থাকল পিছনে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হল উদ্বাস্তু শিবির। পূর্ববাংলার সম্পন্ন গৃহস্থরাও দেশভাগের ধাক্কায় পরিণত হল পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিবারে। দেশ ভাগ ও দুই পারে ভাগ হয়ে যাওয়া পরিবারের যন্ত্রণার জীবন্ত চিত্র পাই শান্তিসুধা ঘোষের জীবনের রঙ্গমঞ্চে। "১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যখন সত্যিসত্যিই পাকিস্তান বাস্তবরূপ ধারণ করল, তখন বাঁধ ভাঙার জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রবল বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা দলে দলে ছুটে চলল পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ভিটেমাটি, ক্ষেতখামার গোরু-বাছুর, টাকাকড়ি, সব পিছনে পড়ে রইল। দেশত্যাগ করল পরিবারের মানুষ কটি আবার এমনও দেখলাম, সব পরিবারের সব মানুষ নড়ল না, চলে গেল শুধু স্ত্রীলোক ও অপোগণ্ড শিশুগণ, প্রবীণ, বৃদ্ধ দুই একজন রয়ে গেলেন, বাড়িঘর জমিজমার পাহারাদাররূপে। এপার ও ওপার দুই পারেই পরিবার ভাগ হয়ে গেল।"[৬৮]

১ শান্তি দাশ, "অরুণ বহ্নি", পৃঃ ৩।
২ কমলা মুখোপাধ্যায়, '১৯২৯-৩১ সাল, কিছু স্মৃতি', চতুষ্পর্ণী", বর্তমান, ২১ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃঃ ১০।
৩ মহাত্মা গান্ধী, 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ২২-১২-'২১।
৪ মহাত্মা গান্ধী, পূর্বোক্ত।
৫ আশালতা সেন, "সেকালের কথা", পৃঃ ২৭-২৮।
৬ মহাত্মা গান্ধী, 'ইয়ং ইন্ডিয়া', ১-৪-'৩০।
৭ আশালতা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
৮ রেণুকা রায়, "স্মৃতিকথা", পৃঃ ৫৭-৫৮।
৯ কমলা মুখোপাধ্যায়, '১৯২৯-৩১ সাল, কিছু স্মৃতি', চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ২১ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃঃ ১০।
১০ সরলাবালা সরকার, "হারানো অতীত", (১ম), পৃঃ ৮৮০।
১১ কমলা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
১২ কমলা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
১৩ কমলা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
১৪ সরলাবালা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮১।
১৫ সরলাবালা সরকার, পূর্বোক্ত।
১৬ আশালতা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।
১৭ বীণা দাস, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ২৯।
১৮ কল্পনা দত্ত (জোশী), "চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান", পৃঃ ৪৭।
১৯ কল্পনা দত্ত (জোশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮-৪৯।

২০ কল্পনা দত্ত (জোশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।
২১ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, 'Long Live Revolution', চট্টগ্রাম বিপ্লবের অগ্নিশিখা, সম্পাদক— শচীন্দ্রনাথ গুহ, পৃঃ ২৮১।
২২ শান্তি দাশ, "অরুণবহ্নি", পৃঃ ১৯-২০।
২৩ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে", পৃঃ ৫১।
২৪ কমলা দাশগুপ্ত, "স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী", পৃঃ ৪২।
২৫ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৯।
২৬ কল্পনা দত্ত (জোশী), 'স্মৃতিকথা', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৯, পৃঃ ৩।
২৭ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, বিস্মৃত প্রায় শ্রমিক নেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্তা, চলার পথে, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৪, পৃঃ ৩৮।
২৮ পূর্বোক্ত, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৫-৫-৮৪।
২৯. মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'ধাঙড় ধর্মঘট (১৯৪০) ও বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা' চলার পথে, শারদীয়া সংখ্যা ১৯৮৭, পৃঃ ২৬।
৩০ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
৩১ রেণু চক্রবর্তী, 'সুধা দি স্মরণে', চলার পথে, জুলাই ১৯৮৭, পৃঃ ৩।
৩২ বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, পৃঃ ৭৬।
৩৩ বীণা দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।
৩৪ বীণা দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪।
৩৫ কল্পনা দত্ত (জোশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।
৩৬ বীণা দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।
৩৭ রেণু চক্রবর্তী, "ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা", পৃঃ ১৯৪০-১৯৫০, পৃঃ ৮।
৩৮ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ৫৩।
৩৯ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।
৪০ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৯৪০-এ লক্ষ্ণৌতে প্রথম ছাত্রী সম্মেলন উপলক্ষে সরোজিনী নাইডুর ভাষণের অংশবিশেষ, পৃঃ ১১।
৪১ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ৫৮।
৪২ বীণা দাস, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ৯৪।
৪৩ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ৮৫।
৪৪ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে", পৃঃ ১৩০।
৪৫ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০।
৪৬ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত।
৪৭ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত।
৪৮ কমলা মুখোপাধ্যায়, 'আগস্ট আন্দোলনের' কথা, পৃঃ ৭।
৪৯ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২।
৫০ কমলা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩।
৫১ কমলা মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩-৪।
৫২ হেনা চৌধুরী, 'ঝাঁসি বাহিনীর রানিরা', চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ২২ জানুয়ারি, ১৯৯৪, পৃঃ ১০।
৫৩ হেনা চৌধুরী, পূর্বোক্ত।

৫৪ হেনা চৌধুরী, পূর্বোক্ত।

৫৫ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ৫৯।

৫৬ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০।

৫৭ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬১।

৫৮ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে", পৃঃ ১০৫।

৫৯ বীণা গুহ, 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে দিনাজপুরের কৃষক মেয়েদের ভূমিকা ও তেভাগা আন্দোলনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল স্থান', চলার পথে মার্চ ১৯৯৩, পৃঃ ১৪।

৬০ বীণা গুহ, পূর্বোক্ত।

৬১ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ১৬২-৬৩।

৬২ বীণা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।

৬৩ বীণা গুহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

৬৪ রেণু চক্রবর্তী, "ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা" ১৯৪০-১৯৫০, পৃঃ ৭৮-৭৯।

৬৫ বীণা গুহ, 'হাজং নেত্রী শহীদ রাসমণি', চলার পথে, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃঃ ২২-২৩।

৬৬ বীণা গুহ, পূর্বোক্ত।

৬৭ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ১৬৭।

৬৮ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১০৮।

২

উনিশ শতক থেকেই সমাজের পিছিয়ে পড়া অর্ধাংশকে এগিয়ে আনার কাজে ব্রতী হয়েছিল শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত পুরুষ। এই শতকের শেষ দিকে মেয়েরা লেখাপড়া শিখছেন, অনেকে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও পাচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর মেয়েরা বা ব্রাহ্ম সমাজের উদার আলোকপ্রাপ্ত পরিবেশে মেয়েরা শিক্ষা ও স্বাধীনতার আস্বাদ পাচ্ছিল। বিশ শতকের শুরুতেও পরিস্থিতি ছিল একই রকম কিন্তু পুরুষের নির্ধারিত পথে যাত্রা শুরু করলেও উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরু থেকেই মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই সার্বিক স্বাধীনতার ভাবনা কাজ করতে শুরু করেছিল। কৃষ্ণভাবিনী দাস, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, মানকুমারী বসু প্রমুখের লেখায় মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উঠে আসছিল। তাঁরা অনুভব করছিলেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সত্যিকারের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে যে নারী স্বামী বা অন্য পুরুষ আত্মীয়ের উপর নির্ভরশীল, তার অন্যান্য স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অর্থহীন। উচ্চশিক্ষাও মেয়েদের সচেতন করে তুলছিল। এই সময় থেকেই ক্রমশ দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মেয়েরা চাকরি নিচ্ছে, সংসার প্রতিপালনের ভার নিচ্ছে! নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠা মেয়েরা তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনেও সামিল হতে চাইছিল। তখন থেকেই হিন্দু সমাজের মূলেও কুঠারাঘাত শুরু করলেন শিক্ষিত সচেতন নারী এবং পুরুষ। ক্রমশ সংস্কারবদ্ধ হিন্দু সমাজের অচল অনড়তার ভিত নড়ে উঠতে লাগল।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুপ্রবেশ এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনের সঙ্গে পরিচয় নব্য শিক্ষিত বাঙালী পুরুষের চোখ

সরলাবালা সরকারের স্মৃতিকথায়, পাশ্চাত্যের মেয়েদের উপার্জনের প্রয়োজনে বেরিয়ে আসার ছবি উঠে এসেছে—"তাহার পর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুন গৃহশ্রম কার্য, অর্থাৎ মেয়েদের বাড়িতে বসিয়া কাপড় বোনা, সেলাই করা, রুটি তৈয়ারি করা, মদ চোলাই করা প্রভৃতি একরূপ উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইল। কলকারখানা খুব বাড়িয়া গেল। দেশে বড় বড় কারখানা খোলা হইতে লাগিল। মেয়েরা এইসব কারখানায় গিয়া শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত হইল। পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের কম মাহিনা, অস্বাস্থ্যকর ঘরে থাকা, অধিক ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম প্রভৃতি নানারূপ অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় দলে দলে রমণীগণ এই সকল কারখানায় চাকরির জন্য যাইতে লাগিল। ইহাতে তাহারা অর্থনীতির দিক দিয়া কতকটা স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভ করিল। নিজেরা ছোটখাট ব্যবসাও করিতে লাগিল, এবং 'Semi-Skilled Occupation' ও হাতে কলমে কাজের ব্যবসার মধ্যে দিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা আরম্ভ করিল। এইরূপে গৃহের আবেষ্টনের বাহিরে বৃহত্তর জগতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইল, ...।" সরলাবালা সরকার, সরলাবালা রচনা সংগ্রহ (২য়), 'নারী আন্দোলনের গতি'। পৃ : ৬১১।

খুলে দিয়েছিল, প্রসারিত হয়েছিল তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, তারা নতুন ভাবে ভাবতে শুরু করেছিল। এই শিক্ষিত পুরুষদের সাহায্যে এবং তাদেরই পথে অন্তঃপুরিকারাও ক্রমশ পরিচিত

হতে লাগল ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস এবং শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে। পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানার গড়ে ওঠায়, কুটির শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেল—মেয়েদের ঘরে বসে কাজ করবার সামান্য উপায়টুকুও হারিয়ে গেল। তবু মেয়েরা কিন্তু চুপ করে বসে থাকল না। পুরুষের তুলনায় কম মাইনে, কাজের সময় অত্যন্ত বেশি, এবং অন্যান্য নানারকম অসুবিধে সত্ত্বেও মেয়েরা কলকারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে লাগল। সরলাবালা সরকারের লেখায় ফরাসী শিল্প বিপ্লবের ফলস্বরূপ সে দেশের মেয়েদের জীবিকার সন্ধানে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কিভাবে তারা সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাইরের জগতের খোলা হাওয়ায় পা রাখতে পেরেছিল, বৃহত্তম জগতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল—সেই ইতিহাস অনুপ্রাণিত করছিল, ভাবাচ্ছিল এ দেশের মেয়েদের। তারা সচেতন হয়ে উঠছিল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনে, জীবিকার সন্ধানে মেয়েদের সংস্কার ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করছিল।

বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও মেয়েদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। গান্ধীজীর অহিংস, অসহযোগের আহ্বান, লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েরাই সাড়া দিয়েছিল। কমলা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের খবর শুনে সমস্ত মেয়েরাই যেন পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কোলে ছেলে, মাথায় ঘোমটা খসে পড়েছে তারা এগিয়ে চললেন।"[১] সংস্কারের বন্ধন অস্বীকার করে প্রয়োজনে সন্তানকে নিয়েও তারা বেরিয়ে পড়েছে আন্দোলনের পথে। তৃপ্তি মিত্র, তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "শুনেছি, মা-ঠাকুমা স্বদেশী আন্দোলনের সময় পিকেটিং করতেন। সে সময় একবার ঠিক হল ব্রিটিশ কোর্টে তেরঙ্গা পতাকা তোলা হবে। মা শুনেই আর কালবিলম্ব করলেন না। দিদিদের বললেন, 'আমি যাচ্ছি। কর্তামার (আমার ঠাকুমা) সঙ্গে কথা বলে যা পারিস রেঁধেবেঁধে খাস।' বলেই আমার ছোট বোনকে (তখন মাত্র কয়েক মাস বয়স তার) কোলে নিয়ে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন কোর্টে পতাকা তোলার জন্যে। পতাকা তোলা হয়েছিল, এবং মা-দের সকলকেই সেদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু মায়ের কোলে অত ছোট বাচ্চা দেখে, রাত্রিবেলায় মাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।"[২] ত্রিশের দশক থেকে আন্দোলনের মত ও পথের মধ্যেও পার্থক্য দেখা দিতে থাকে—গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন, খাদি ও চরকার প্রচলনের পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং তার পরবর্তীকালে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মার্কস্‌বাদে বিশ্বাস, কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা আন্দোলনকে বহুধা বিভক্ত করে তোলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেয়েদের ভূমিকা এবং অংশগ্রহণ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরই মধ্যে ত্রিশের দশকের শেষের দিকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষ আর এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অবিভক্ত বাংলাদেশ এবং বাঙালি মেয়েরা। বিশ্বযুদ্ধেরই ফল হিসেবে বাংলার বুকে নেমে আসে '৪৩-র ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু হয় অগণিত মানুষের। শুরু হয় '৪৬-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অবশেষে '৪৭-র স্বাধীনতা এবং দেশভাগ—বাংলার অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে

দেয়। ভেঙে পড়া আর্থিক কাঠামো বদলে দেয় সামাজিক প্রেক্ষাপট, চূড়ান্ত দারিদ্র্যে মানুষ হারিয়ে ফেলে তার মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ। এই নড়বড়ে সময়ে, সংসারের প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে ঘরের বন্ধন অতিক্রম করে বেরিয়ে এল মেয়েরা খোলা আকাশের নীচে, কঠিন বাস্তবের মাটিতে। ১৯৩০-'৪৭ কালপর্বে মেয়েদের লেখা আত্মকথা স্মৃতিকথাতে উঠে এসেছে এই সময়টি, তাদের ভাবনার প্রতিফলনে। এই টুকরো ছবিগুলির মধ্যে থেকেই পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক সচেতনতা, আর্থিক স্বনির্ভরতার তাগিদে চাকরিজীবী হয়ে ওঠা, বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ার সামগ্রিক ছবিটিই তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সরলাবালা সরকার তাঁর লেখায় বাঙালি মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রধানত এই অন্নবস্ত্রের সমস্যার দিনে রমণীগণ যাহাতে স্বাবলম্বী ও সাহসী হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা এমন দৃঢ়চিত্তা হন যে, যে কোনো অবস্থার মধ্য দিয়া বীরের মত পথ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়াই সমাজের হিতকামীদের পক্ষে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়। আমাদের দেশে রমণীগণ শিক্ষার অভাবে ও সংস্কারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া নিজেরা যে মানুষ সে অনুভূতিও হারাইতে বসিয়াছেন।"[৩] অন্যান্য রচনাতেও সরলাবালা বার-বার নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। শিক্ষিত সচেতন মেয়েরা আর্থিক স্বাবলম্বন এবং তার মাধ্যমে মেয়েদের সার্বিক স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই ভাবছিলেন। তাঁরা অনুভব করতে পারছিলেন যে আর্থিক স্বাবলম্বন ভিন্ন সত্যিকারের স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা সম্ভব নয়। যখন পরাধীন দেশের আর্থিক কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, সমাজের উন্নতির প্রয়োজনে মেয়েদেরও উপার্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত নারীর ভাবনা সমাজে মেয়েদের অবস্থানটাকে বদলে দিতে পারত না। পুরুষ শাসিত সমাজ কাঠামো কখনই মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনের কথা সহজে স্বীকার করে না, এই শতকের প্রথমে তো আরোই করত না। কিন্তু পরিস্থিতির চাপেই মূলত মেয়েরা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবতে বা বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করল। এখানে প্রীতিলতার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে কল্পনা দত্তের (যোশীর) কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—"প্রীতির বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কিছু আগে ওর বাবার চাকরি যায়, ফলে প্রীতির আয়ের উপরই নির্ভর করে চলতে হতো সকলের। মা-বাবা আর চারটি ভাইবোন। সে নন্দনকানন হাইস্কুলে মাষ্টারি করত আর করত একটা টিউশনি।"[৪]

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য অনেক মেয়েকেই ঘর ছাড়তে হয়েছিল। নিশ্চিত পারিবারিক আশ্রয় যখনই তারা ছেড়েছে আদর্শের জন্য, সর্বপ্রথম ভাবতে হয়েছে অর্থের কথা। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' গ্রন্থে কমলা দাশগুপ্ত মায়া ঘোষ সম্পর্কে বলেছেন,—"তাঁর বাবা বিয়ের চেষ্টা করতে মায়া করলেন অনশন। বিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯৩৬ সালে মায়া বি. এ. পাশ করেন। ......১৯৩৯ সালে বেধেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪১ সালে বাড়ির সকলের অমতে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে

মায়া চলে যান বীরভূমের রামপুরহাটে নিজের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।"[৫] সেই সমস্ত মেয়েরা নানারকম ছোটখাট কাজ করে, টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতো। মণিকুন্তলা সেনও কমিউনিস্ট পার্টির এরকম কয়েকজন মেয়ের কথা বলেছেন "এদের অনেককেই রাজনীতি এবং বিশেষ করে কমিউনিজম সম্পর্কে পরিবারের ঘোর আপত্তির জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল। ......পার্টি এত মেয়ের খরচ দিতে সমর্থ হয়নি। তাই এই মেয়েরা টিউশনি ও ছোটখাটো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত।"[৬]

ত্রিশের দশকে গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সমস্ত মেয়েরা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। গান্ধীজী তখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে চরকার প্রচলন বা খাদি আন্দোলনের সূচনা করেন। খাদির মাধ্যমে মেয়েদের, বিশেষ করে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর মেয়েদের উপার্জনের কথা তিনি ভেবেছিলেন। নিরুপমা দেবী সাহেবনগরে কস্তুরবা শিক্ষা শিবির সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 'খাদির প্রতি

"চরকা প্রতিষ্ঠান ও লাঠি খেলার আখড়া প্রত্যেক গ্রামেই স্থাপিত হইয়াছে, আবার তাঁত-শালাও খোলা হইতেছে। হাতে হাতে সকলেরই এক-একটি তকলি, কার সূতা কত সরু হয়, কে কত তাড়াতাড়ি সুতা কাটিতে পারে ইহার প্রতিযোগিতাও আছে।....

একদিন চরকা কাটার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় একটি গ্রামের সমস্ত মেয়েরা একত্র হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপে রক্ষাকালী পূজা হইতেছে, আর মণ্ডপের সম্মুখের অঙ্গনে মহিলাগণের চরকা প্রতিযোগিতার আসর বসিয়াছে।

পরীক্ষকের আসনটি আমাকেই দেওয়া হইয়াছিল। সুতা দেখিয়া আশ্চর্য মনে হইল। এত সরু সুতা হাতে কাটা যায়, তাহা কল্পনাও করিতে পারি নাই। কাটুনীদের মধ্যে একটি ষোল-সতেরো বৎসরের মেয়ে ও একটি বৃদ্ধার সুতা অন্য সকলের সুতা অপেক্ষা সরু হইয়াছিল। ইঁহারা দুইজন ঠাকুরমা ও নাতনী" সরলাবালা সরকার, 'হারানো অতীত'— সরলাবালা রচনাসংগ্রহ, পৃ : (৮৯৩-৯৪)।

গ্রামবাসীদের আগ্রহ জন্মায়, মেয়েদের আয়ের ছোট একটি পথও খুলে যায়।'[৭] সরলাবালা সরকারও গ্রামে গ্রামে চরকা ও তাঁতের বহুল প্রচলনের এবং চরকার প্রতি গ্রামের মেয়ে বৌদের আগ্রহের কথা বলেছেন। গান্ধীজীর স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ মেয়েদের স্বনির্ভরতার জন্য চরকা ও তাঁত শিল্পের প্রচলনের ভাবনা যে কতটা যথাযথ ছিল এবং খাদি আন্দোলন ও চরকার প্রচলনের ফলে গ্রামের নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মেয়ে বৌরা যে সত্যসত্যই উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছিল, সেকথা জানা যায় প্রত্যক্ষদর্শী মেয়েদের লেখার মধ্য থেকে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছিলেন খাদি আন্দোলনের প্রয়োজন কতখানি এবং কিভাবে চরকা ও তাঁত গ্রামের মেয়েদের স্বনির্ভরতার সহায়ক হয়ে উঠেছে। এরকমই এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন আশালতা সেন—"সারাদিন সভা করে হাঁটার পর রাত্রিতে এক মুসলমান তাঁতির বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করি। বাড়ীর বয়স্ক ছেলে মাত্র এক সপ্তাহ আগে মারা গেছে তার অল্পবয়স্কা অন্তঃসত্ত্বা বিধবা তখনো তাঁতে কাজ

করছে। বৃদ্ধা মা পাশে বসে ছেলের জন্য কাঁদছে। তরুণী বিধবা আমাকে দেখে কাজ বন্ধ করে চোখের জল ফেলতে লাগলো। কিন্তু একটু পরেই তাকে আবার কাজ শুরু করতে হল। সংসারের খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। আসন্ন প্রসবের জন্যও সংস্থান করতে হবে। দশ মিনিট অবসর নিলেও তার চলবে না। চোখের জলে ঝাপসা চোখেই সে আবার তাঁত চালানো শুরু করলো। গ্রামের মেয়েরা যে কত অসহায়, দারিদ্র্যের চাপ যে কত বেশী হতে পারে এবং সুতা কাটা, টানা হাটা, তাঁতের কাজ ইত্যাদির আয় আপাতদৃষ্টিতে শহরের লোকের কাছে যত কমই মনে হোক, গ্রামের দুঃস্থ মেয়েদের রোজগারের পন্থা হিসেবে তার যে কি দাম তা এই অভিজ্ঞতায় আমি বিশেষভাবে বুঝতে পারলাম। গান্ধীজী খাদির উপর এত জোর কেন দিয়েছিলেন তাও বুঝলাম।"[৮] রবীন্দ্রনাথও অল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর গ্রামীণ মেয়েদের উপার্জনের জন্য তাঁত ও খাদি শিল্পের প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে মেয়েদের তাঁত চালানো এবং তাঁতের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ও উপার্জনের প্রচেষ্টা তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। অমিতা সেনের কথায়, "আসামে, মণিপুরে মেয়েরা ঘরসংসারের কাজের সঙ্গে ঘরে বসে তাঁত বোনে। নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিধান বস্ত্র নিজের রুচি অনুযায়ী বুনে নেয়। মেয়েদের হাতে বোনা বস্ত্রে তাদের শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার যাত্রার মাঝে মেয়েদের এই শিল্প সৃষ্টি, যাতে মিটছে প্রয়োজনের তাগিদ এবং বিকাশ হচ্ছে মেয়েদের শিল্প রুচির,—এইটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করল।"[৯] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁত বসান, শুরু হয় আশ্রমবালিকাদের তাঁত বুনতে শেখা। আশ্রমের অনেকেই বেশ ভালভাবে তাঁত বুনতে শিখল। তখন ঘরে ঘরে তাঁতে বোনা হতে লাগল সুন্দর সুন্দর কাপড়, শৌখিন হাত ব্যাগ, আসন, বেডকভার প্রভৃতি নানারকম জিনিস। "দেশী প্রথায় তাঁত বোনার সঙ্গে বিদেশী তাঁত বোনার প্রথা মিলে তাঁত শিল্পের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র তৈরি হল শ্রীনিকেতনে।"[১০] তাঁতের মাধ্যমে মেয়েদের উপার্জনের একটি পথও তৈরি হল। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলেছেন অমিতা সেন। শ্রীভবনের শিশুদের ভারপ্রাপ্ত সুধা সেন পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম থেকে, একজন দুঃস্থ বিধবা মহিলা সরোজিনীকে নিয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। উত্তরায়ণের বাগানে মাটির কুটীর তৈরি করে তাঁত বসিয়ে তাঁকে খেস বুনতে শেখালেন প্রতিমা দেবী। অমিতা সেন বলেছেন, "দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সেই সরোজিনী আজ তাঁত শিল্পের পারদর্শিতার কল্যাণে সুরুল গ্রামে একটি বাড়ি তৈরি করে সেখানে তাঁত বসিয়েছে। সকলের ফরমাসে সেই তাঁতে সে টানা দিচ্ছে কখনো সবুজ, কখনো নীল, হলদে, কমলা, লাল, নানা রঙের টানা আর ছেঁড়া কাপড়ে বুনে চলেছে নানা রং বেরঙের খেস। এইভাবে সে তার নাবালক ছেলেটিকে মানুষ করে তুলল, বিয়ে দিল, নাতি-নাতনী তার ঘরে এল। আজ তার বয়স সত্তর পেরিয়ে আশীর দিকে পা বাড়িয়েছে, বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে কঠিন পরিশ্রমী সরোজিনীর দেহ, কিন্তু হাতের বোনা তার বন্ধ হয়নি। শ্রীভবনের মেয়েদের এবং আশ্রম বধূদের নিত্য আবদার সে মিটিয়ে চলেছে সুন্দর সুন্দর খেস বুনে।"[১১]

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের নৃত্য-গীত শিক্ষা, শিল্প চর্চা, হাতের কাজ শেখানো প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এগুলি শুধু যে তাদের আত্মিক বিকাশের সহায়ক

হয়েছিল তাই নয়, পরবর্তীকালে অনেক সময়ই দেখা গেছে শান্তিনিকেতনে সুশিক্ষিতা সুদক্ষ ছাত্রীরা নাচ, গান, হাতের কাজ, আঁকা তাঁদের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে। একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। ত্রিশের দশকেই দেখি, রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, শুধু শিল্প চর্চা নয়, তার মাধ্যমে উপার্জনের একটা রাস্তাও দরকার। আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনে নিজস্ব উপার্জনের কথা চিন্তা করছেন। রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' এ দেখি কবি তাঁকে বলছেন, 'দেখ—সংসারের একটা যে-কোনো জায়গায় কিছু আয় প্রত্যেক মেয়েরই দরকার বলে আমার মনে হয়। কোন crafts শুধু শৌখিন হিসেবে নয়, যে কোনো একটা নিজস্ব জোর থাকা খুবই প্রয়োজন মেয়েদের পক্ষে। যেমন সাঁতার জানা থাকলে ঝড় জলে সাঁতরে পার হতে পারে, জলে তখন ভয় থাকে না। জেনে রাখা ভালো।"[১২]

ত্রিশের দশকেই কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের রুজি রোজগারের প্রয়োজনে নন্দলাল বসু গড়ে তুলেছিলেন 'কারুসঙ্ঘ'। ইন্দুসুধার কথায়, "মাস্টারমশাই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের সবরকম সমস্যার কথা চিন্তা করতেন। কী করে কারুশিল্পের সাহায্যে তারা একটু আয় করতে পারে। সে ভাবনা থেকেই উনি আমাদের পাঁচ-ছয়জনা ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে 'কারুসঙ্ঘ' নাম দিয়ে একটি সংস্থা করলেন—প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন সেক্রেটারী। মাষ্টারমশাইয়ের উৎসাহে আমার সেলাই-এর নক্সার বই 'সীবনী' কারুসঙ্ঘ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহ বের হল ১৯৩০ সালে।" [১৩] কারুসঙ্ঘেরই উত্তরসূরী বলা যায় চল্লিশের দশকের কলকাতায় গড়ে ওঠা 'নারী সেবা সঙ্ঘ'।

নিম্নবিত্ত সমাজে নারী-পুরুষের একসঙ্গে কাজ করাটা অনেকদিন ধরেই প্রচলিত। চাষের মাঠে বা বিভিন্ন কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীও কর্মক্ষেত্রে নেমে

ইলা মিত্র বলেছেন, "তে-ভাগা আন্দোলনের সময়ে লক্ষ্য করেছিলাম সে সময়ে আদিবাসী পুরুষ ও নারী সামাজিক মর্যাদায় পরস্পরের খুবই নিকটে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সমানভাবে খাটছে। লক্ষ করেছি এইসব মেয়েদের মধ্যে নেতৃত্বের ক্ষমতা খুবই প্রবল। যে নারী পুরুষের কেবলমাত্র 'শয্যাসঙ্গিনী' সন্তানের জননী ও গৃহদাসী বলে গণ্য নয়, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক যেখানে সম্পূরক, সেখানে শ্রমের করুণাস্থানে উভয়ে পবিত্র হয়ে সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত।" ইলা মিত্র, 'আমার জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ', 'চলার পথে', পৃ : ৪৩।

এসেছিল, সংসারের উপার্জনে সাহায্য করার জন্য। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী মেয়েদের নাড়া দিচ্ছিল। পরিবারকে সচল রাখার জন্য গৃহকর্ত্রীর ভূমিকার পরিবর্তে উপার্জনকারী হয়ে ওঠার প্রয়োজন দেখা দিল। অন্যদিকে শিক্ষাও মেয়েদের সচেতন করে তুলছিল, শিক্ষাকে তাঁরা কাজে লাগাতে চাইছেলেন। শিক্ষিত পরিবারের অভিভাবকরাও বিয়েই যে মেয়েদের একমাত্র ভবিষ্যৎ, এই ধারণা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসছিলেন। তাঁরাও পরিবারের শিক্ষিত মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন, কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে খুব খোলা চোখে দেখছিলেন, খোলা মনে সমর্থন করছিলেন। শান্তিসুধা ঘোষ অঙ্কে এম. এ. পাশ করার পর যখন গোপনে দেশের কাজ কবতে চাইছেন, বরিশালে থেকে ছাত্রী সংগঠন তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন, তাঁর দাদা কলকাতা থেকে মাব কাছে চিঠি দিলেন, "মনু বরিশালে বেকার বসে বসে সময় কাটাচ্ছে কেন? যদি চাকরি করতে চায় তো এখনই কলকাতায় আসুক।

এখানে নূতন নূতন মহিলা কলেজ অনেক খোলা হচ্ছে, অবিলম্বে ওকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পারব।" [১৪] শান্তিসুধার মতে, 'প্রস্তাবটি খুবই সঙ্গত। উচ্চতম শিক্ষার অধিকারী হয়েও অযথা অকর্মণ্যতায় ঘরে বসে কালহরণের কোন অর্থ হয় না।' [১৫] —সেটা ১৯৩২ সাল, শান্তিসুধা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপিকা রূপে যোগদান করলেন। তাঁর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে তখনকার কোন কোন শিক্ষিত পরিবার মেয়েদের শিক্ষা এবং চাকরি করা সমর্থন করছেন। তাঁরা শিক্ষিত মেয়েদের স্বাধী জীবিকা, শিক্ষাকে কাজে লাগানোর পক্ষেই মত দিয়েছেন, শান্তিসুধার অভিভাবকদের মতামত অন্তত তাই সাক্ষ্য দেয়। সরকারি নথিপত্রেও শান্তিসুধার বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে।—"Apart from economic necessity, ideological considerations also have played no small a part in bringing about such an important social change. School and College education is no longer a monopoly of boys. With spread of education among women, there is a growing awareness of a sense of individualism in them. In consequence there is a striving for economic independence and an independent social status. Marriage is no longer considered as an inevitable and safe career for all girls." [১৬] শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলছিল। বহির্জগতের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তারা নিজেকে খুঁজতে চাইছিলেন, নিজেকে বিকশিত করতে, প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছিলেন। অবশ্য মানসিক পরিবর্তনের জন্য না হলেও বাস্তব প্রয়োজনের দায়েও তারা উপার্জনের পথে পা বাড়াচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত—ভেঙে পড়া অর্থনীতি, তাদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দিয়েছিল। চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে একদিন একটি পরিবারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মণিকুন্তলা সেন। এরা ছিলেন ঐ পরিবেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা ব্রাহ্মণ, চটকলে আসার আগে যজমানী করে সংসার চলতো। তাতে যখন কুলোয়নি, ঘটি-বাটিও বিক্রি হয়ে গেছে, কলকাতায় এসেছেন জীবিকার সন্ধানে এবং নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত চটকলে এসে পৌঁছেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চটকলে কাজ করেন। 'ব্রাহ্মণটি ব্রাহ্মণীর হাত ধরে সেই থেকে এখানে আছেন। সংসার মোটামুটি চলে। কিন্তু লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ হয়ে এই সমাজে পাশাপাশি বসে কাজ করছেন এবং জায়গাটারও নাম তো 'মাগী কল'। নামটা বলতেও যেন ঘেন্না পাচ্ছেন।' [১৭] সেই ব্রাহ্মণী নিজের প্রকৃত পরিচয় কখনো কাউকে দিতেন না। ব্রাহ্মণত্বের প্রচ্ছন্ন অভিমানে চটকলের জীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত অসম্মানের বলে মনে হত, সেখানে যে সব জাতের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে হত, 'জাত যে রাখা যায় না'। তাছাড়া সেই চটকলের পরিবেশটাও যে ছিল একেবারে অন্যরকম, সামাজিক জীবন অত্যন্ত শিথিল, অপরিচিত ধরনের। সেই জীবন 'ব্রাহ্মণী'র কাছে যতই অসম্মানজনক মনে হোক, তাঁর বেঁচে থাকার, সংসার রক্ষার প্রচেষ্টা মুগ্ধ করেছিল মণিকুন্তলাকে। তিনি বলেছিলেন, "উপার্জনের জন্য অফিসেই হোক আর কলেই হোক—খাটলে মানুষের সম্মান বাড়ে, মোটেই কমে না। ভিক্ষার অন্নের চেয়ে নিজের শ্রমের অন্নে ছেলেমেয়েদের মানুষ করছেন—এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি আছে? জাতের জন্য দুঃখ করেন কেন, মানুষ তো সবই এক।" [১৮] এইভাবে সেই সময় অনেক মেয়েরাই কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। 'ব্রাহ্মণী'র গ্রাম থেকে শহরে এসে চটকলের

শ্রমিকে পরিণত হওয়া কাল পরিবর্তনের ইঙ্গিতই সূচিত করছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ভেঙে পড়া সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয়, অর্থনৈতিক মান অবনমন গ্রাম বাংলার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে ধ্বংস করেছিল। গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল মানুষ জীবিকার সন্ধানে, দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সন্ধানে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য। চটকলের শ্রমিক হয়ে ওঠা ব্রাহ্মণ পরিবারটি সেই সময়েরই এক টুকরো প্রতিচ্ছবি। ব্রাহ্মণীর আবাল্য লালিত সংস্কার ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসারের দায় মাথায় তুলে নেওয়া, চটকলে শ্রমিকের কাজ করার কাহিনী কি সময়ের অভিঘাতে নারীর অগ্রগতিকেই সূচিত করে না? তিনি তো সময়ের চাপে, দারিদ্র্যের ধাক্কায় শত শত রক্ষণশীল গৃহবধূর মিথ্যে সংস্কার ত্যাগ করে, প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যে পরিবর্তিত হওয়ারই প্রতিনিধি। যন্ত্রণাদীর্ণ সেই সময়, মানুষকে যতই রক্তাক্ত করুক, মেয়েদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, সংস্কার মুক্তির পথে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এই ঝোড়ো হাওয়া যদি তাদের ঠুনকো মানমর্যাদা ও মিথ্যে সংস্কার সমূলে উড়িয়ে না দিত, তাহলে এত সহজে বিভিন্ন জীবিকায় মেয়েদের অনুপ্রবেশ সম্ভব হত না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবে, নারী হবার কারণে নানাভাবে শোষিত হত নতুন প্রজন্মের এই কর্মী মেয়েরা। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েরা তখন এই সমস্ত নারী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন—তাদের প্রতি অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করতেন। মণিকুন্তলার লেখায়, চটকলের মেয়ে শ্রমিকদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তারা নানারকম অন্যায়ের শিকার হত। ৮/১০ ঘণ্টা কাজ করেও তারা কখনো পুরুষের সমান মজুরী পেত না যত বছরই কাজ করুন চাকরি কখনই পাকা হত না, প্রসূতি ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। চটকলে যে সমস্ত নারী-শ্রমিক কাজ করত, তারা মূলত চট পেঁজা ও চটের থলে সেলাইয়ের কাজ করত। কিন্তু ওদের ঐ বিভাগের নাম ছিল 'মাগীকল'। মেয়েদের প্রতি এই অসম্মানে আহত হয়েছিলেন মণিকুন্তলা, মনে হয়েছিল, 'এসব আমরা সয়ে যাচ্ছি কেন? নামটা কি বদলানো যায় না?'[১৯] ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া, আত্মীয় পরিজনহীন চটকল নারীশ্রমিকদের জীবনধারাটিও ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। সেই মেয়েরা যে পুরুষদের সঙ্গে বাস করত তাদের বিবাহিত স্ত্রী ছিল না তাঁরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষটির স্ত্রী-পুত্র পরিবার থাকত গ্রামে, উপার্জনের টাকাও পাঠাতে হত সেখানে। সঙ্গিনীর ভরণপোষণের কোন দায়ও থাকত না পুরুষদের—'সে নিজের পয়সাতেই খেত'। তবুও এইভাবে জীবনযাপনের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন মণিকুন্তলা—"মেয়েটির সুবিধা ছিল—একলা অরক্ষিত থাকার চেয়ে কারো অভিভাবকত্বে থাকতে পেত। মেয়েটি নিজেই তো ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া, আত্মীয়স্বজন

"এই শ্রমিক মেয়েদের সঙ্গে মিশে এবং কাজ করে আমি নারী সমাজের অন্য আর এক জগতের চিত্র দেখতে পেয়েছিলাম। মেয়েদের বেশির ভাগই চটপেঁজা ও চটের থলে সেলাইয়ের কাজ করত। কিন্তু ওদের ঐ ডিপার্টমেন্টের নাম ছিল 'মাগীকল'। একটা ডিপার্টমেন্টের নাম এমন অপমানকর ভাষায় কেন দেওয়া হল তা জিজ্ঞেস করায় জেনেছিলাম—ওটা ইংরেজের দেওয়া নাম। তা বটে। ইংরেজ ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের এমন অপমানকর নাম আর কেউ কি দিতে পারত।"—মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃ : ১৫৩।

আত্মীয়স্বজন ছাড়া। জীবনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে ঘুরতে একদিন চটকলে এসে নৌকো ভিড়িয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা হারায়নি। বনিবনা না হলে অন্য পুরুষের সঙ্গেও থাকতে পারত। সাতপাকে বাঁধা বৌও নয়। কিন্তু বিচ্ছেদ বড় একটা হতে দেখিনি। উভয়ের স্বার্থই উভয়কে বেঁধে রাখত।"[২০] অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়, নিজের ইচ্ছেমত ঘর বাঁধার স্বাধীনতা থাকলেও, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে খেটে খাওয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নিজের ভরণপোষণে সক্ষম মেয়েটিকেও অভিভাবক খুঁজতে হয়। মনুর স্মৃতিশাস্ত্রের সেই শ্লোকটি মনে পড়ে, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি'। ঘরছাড়া, স্বজনহীন মেয়েটিকে তাই স্বামীর পরিবর্তে, অন্তত বিকল্প স্বামীর অভিভাবকত্ব খুঁজে নিতে হয়েছে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে।

টালিগঞ্জের চালকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও শ্লীলতা রোধের অভাবের কথা বলেছেন বীণা দাশ। 'Equal pay for equal work',— একই কাজের জন্য সমমজুরি, কখনই তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সারাদিন বারোঘণ্টা খেটেও তাদের রোজগার দিনে পাঁচ আনার বেশি হত না। ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি তাঁদের খাটতে হত, মাঝখানে শুধু অল্প কিছুক্ষণ ভাত খাবার বিরতি। অর্থাৎ সামাজিক-আর্থিক প্রয়োজনে নারী বাধ্য হচ্ছে জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, কিন্তু তখনও শুধু নারী হওয়ার কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছে, শ্রমের প্রতিদান পাচ্ছে না। পুরুষের সমান পরিশ্রম করলেও সমমর্যাদা সে পাচ্ছে না। এই সময় থেকেই শ্রমিকদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পাশাপাশি শিক্ষিত সচেতন মেয়েরা 'নারী শ্রমিকদের' সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করে তোলে।

"ভক্তি আর মুক্তি দু'জনেই বিড়ি তৈরির মহিলা শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করত। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মজুরি কম দেওয়া হত। স্বভাবতই দাবী করা হয় সমান মজুরি। মেয়েদের সংখ্যাও মন্দ ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় শ' তিনেক। ভক্তি ও মুক্তির চেষ্টা ছিল এদের দাবীর সমর্থনে শহরের ছাত্রী ও মহিলাদের টেনে আনা।" —মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃ : ১০৪।

বাঁকুড়ায় ভক্তি ও মুক্তি সেন মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়ার বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েদের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। প্রায় শ'তিনেক মহিলা বিড়ি শ্রমিকের দাবীর সমর্থনে তাঁরা বাকুড়া জেলার সমস্ত সচেতন মেয়েদেরই একত্রিত করেছিলেন—বাকুড়া টাউন হলে তাঁরা একটা সমাবেশও করেন। সেখানে ছাত্রী, শিক্ষিকা, গরীব মধ্যবিত্ত মেয়েরা গ্রামের কৃষক মেয়ে ও কিছু মুসলিম মেয়ের উপস্থিতিতে বিড়ি শ্রমিকদের সমান মজুরির দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে বাংলার আর্থিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। ইংরেজ সরকারের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির প্রয়োজনে সমস্ত খাদ্য গুদামজাত হয়, উপকূলভাগের জমির ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে,—যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর আঘাতে বাংলার মেয়েদের

সংস্কারের আবেষ্টনী ভেঙে দিয়ে রূঢ় বাস্তবের কঠিন জমিতে নামিয়ে আনে। মন্বন্তরের ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটা বাঙালি মেয়েদের রক্ষণশীলতা খড়কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে গেল, সুখী গৃহকোণের নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে মাটিতে নামাল। সরে গেল তাদের অহেতুক ভয়, অহেতুক লজ্জাবোধ, বাস্তব জীবনের সঙ্গে হল নতুন পরিচয়। ঐতিহ্যবাহী নিরাপদ পারিবারিক আশ্রয়ের বাইরে কঠিন বাস্তব জগতে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হল তারা। পরনির্ভরতা নয়, শিখতে হল আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল। অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই করতে গিয়ে অনেক মেয়েই হারিয়ে গেল পতিতাবৃত্তির অন্ধকার পিচ্ছিলতায় আবার তারই পাশাপাশি ঘটল 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'—জীবনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তারা অর্জন করল আত্মসম্মান নিয়ে নিজের শক্তিতে, নিজের ক্ষমতায় বেঁচে থাকার অধিকার।

দুর্ভিক্ষ উত্তরকালে নারী শ্রমিকদের দলে নতুন সংযোজন হল আর এক শ্রেণীর কর্মজীবী মহিলার। দুর্ভিক্ষের পর শহর যখন খাদ্য যোগাতে পারল না, গ্রামের মানুষ আস্তে আস্তে গ্রামে ফিরে যেতে লাগল। যারা পারল না তারা শহরের ফুটপাথে সংসার পাতল। গ্রামের কষ্টের জীবনের পরিবর্তে শহরের নরকবাসের এই জীবনই তারা বেছে নিয়েছিল। এদের জীবিকা ছিল, 'প্রধানত ভিক্ষা ও টুকিটাকি কাজ'। আত্মসম্মানহীন নারীর এই পরাজয় আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মেয়েদের ব্যথিত করত। মনে হত কেন এত সহজে এরা পরাজয় স্বীকার করে নিল জীবনের কাছে। এরা তো একদিন গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া মানুষই ছিল। তবে কেন এরা সমস্ত মান মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে শহরের ফুটপাথের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠল। কিন্তু এই ফুটপাথবাসী ভিক্ষাজীবিত নারীর পাশাপাশি, আর এক শ্রেণীর কর্মজীবী নারীরা গ্রামের জীবনটা বজায় রেখে শহরে আসত জীবিকার সন্ধানে—তরিতরকারি বিক্রি করতে, চাল বিক্রি করতে। বিক্রি করে ফিরে যেত গ্রামে, নিজের ঘরে। এরা অন্তত শিকড় ছিঁড়ে ভিখারি হয়ে যায়নি, কাজ করে খেতে শিখেছিল। এদের ভেঙে না পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই, পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় এবং চূড়ান্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও সম্মানিত জীবনযাপনের সংগ্রাম আশান্বিত করত শহরের মেয়েদের, মনে হত মানুষ 'এখনও বেঁচে আছে। সবাই মূল্যবোধ হারিয়ে অমানুষ হয়ে যায়নি।' মণিকুন্তলার লেখায় এই দুই শ্রেণীরই দেখা পাওয়া যায়—"গ্রামের স্বাভাবিক জীবনে এরা বোধহয় কোনকালেই আর ফিরে যাবে না। অথচ এই কলকাতাতেই রোজ সকালের ট্রেনগুলো থেকে মেয়েরা নামে তরিতরকারি বা চালের বোঝা মাথায় করে। বাজারে তা বিক্রি করে দুপুর বা বিকেলের গাড়িতে বাড়ি ফেরে। এ মেয়েরা কাজ করে। সংখ্যায় তারা হাজার হাজার। গ্রামের সংসারের মর্যাদাটুকু এরা বজায় রেখেছে। নারী শ্রমিকদের দলে এরা নতুন সংযোজন। সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। শ্রদ্ধা হয় যখন দেখি—বৃদ্ধারাও একটা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করতে বসে আছে। এরা ভিক্ষার অন্ন খায় না, শ্রমের অন্ন খায়। সংসার বাঁচায়। ফুটপাথের ঐ 'বারোয়ারী' সংসারগুলো ঐ পথে কোনকালেও কি ফিরে যাবে না?"[২১]

যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষও যখন নতুন চেহারা নিচ্ছে, সেই সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করতে করতে বরিশালের মহিলা কর্মীদের মনে হল

ত্রাণ কার্যের পরিবর্তে ত্রাণ কেন্দ্রটিকে যদি স্থায়ী সংগঠন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে দুঃস্থ মহিলাদের কিছু আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। ভিক্ষা না দিয়ে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানো, নিজেদের উপর আস্থা ফিরিয়ে আনার অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল। তখন তারা 'চরকা ও তাঁত শিল্পকে অবলম্বন করে মহিলাদের জন্য একটি স্থায়ী শিল্পকেন্দ্রের কথা ভাবল। শান্তিসুধার কথায়, "যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের হাহাকার নূতন নূতন রূপ নিচ্ছে, আশু প্রতিকার হবার কোন লক্ষণ সূচিত হচ্ছে না। সরলাদি, আমি ও ইন্দু ঠিক করলাম, এই ত্রাণকেন্দ্রটিকে একটি স্থায়ী সংগঠনকেন্দ্রে পরিণত করা দরকার, যার মাধ্যমে কিছু দুঃস্থ নারীর আংশিকভাবে কিঞ্চিৎ অর্থাগম ও সচ্ছলতার যোগাড় হতে পারে। স্থির হল, চরকা ও তাঁত শিল্পকে অবলম্বন করে মহিলাদের জন্য একটি স্থায়ী শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কয়েকটি চরকা ও তাঁতের যোগাড় হল। ....প্রশিক্ষণেচ্ছু কয়েকজন দুঃস্থ মহিলাকেও পাওয়া গেল। প্রথম পরিচালিকার ভার নিলেন ইন্দুপ্রভা। প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হল, 'মহিলা শিল্পভবন'।"[২] ন্তর শিকার সর্বস্ব হারানো অসহায় মেয়েদের পুনর্বাসনই হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, প্রধানতম সমস্যা। তাদের বাঁচার উপায় খুঁজতে গিয়ে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল বিভিন্ন ছোট বড় সংস্থা, যারা নানা রকমের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সমস্ত মেয়েদের কর্মসংস্থানের জন্য এবং স্বজনহীন, আশ্রয়হীন মেয়েদের সম্মানের জীবনের স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে দিতে সচেষ্ট হল। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের বিনিময়ে, কাপড়ের বিনিময়ে মেয়েদের মান সম্মান কেনাবেচা হত কলকাতার রাস্তায়। নারী মাংস ব্যবসায়ীদের কবল থেকে অসহায় মেয়েদের রক্ষা করার জন্য গড়ে উঠল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। ত্রিশের দশকে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আকৃষ্ট করেছিল কমিউনিস্ট ভাবধারা। কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েরা সমাজের সর্বস্তরের, বিশেষ করে দরিদ্র মেয়েদের সচেতন করে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিল। '৪৩-র মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষপীড়িত মেয়েদের সাহায্যের জন্য তারা প্রতিষ্ঠা করল 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। এরা মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো এবং তৈরি জিনিস বিক্রির ব্যবস্থা করে তাদের উপার্জনের বিভিন্ন পথ তৈরির চেষ্টা করতে লাগল। অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে তাদের কর্মীরা মহিলা সমিতি ও শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করতে শুরু করল। কলকাতা শহরেও বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় তারা কেন্দ্র খোলে। তাঁদের কাজে আরও বেশি মেয়েদের যুক্ত করার জন্য কো-অপারেটিভও খোলে তারা। মণিকুন্তলার কথায়, "এবার কো-অপারেটিভ করে সমস্ত পাড়া কেন্দ্রে কাজ শেখানো, অর্ডার যোগাড় করা, জিনিসপত্র সাপ্লাই দেওয়া, এবং সব কেন্দ্রের তৈরী মাল কেন্দ্রীয়ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের মজুরী দেওয়া—এই সব কাজ করতে হবে কো-অপারেটিভ থেকে।"[২৩] মেয়েদের হাতে তৈরি জিনিসগুলি বিক্রি হত প্রধানত কলকাতার দুটি বিখ্যাত দোকান 'বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ' ও 'গুড কমপ্যানিয়ন্‌স্' থেকে। মণিকুন্তলা জানিয়েছেন তাঁদের বিভিন্ন পাড়া কেন্দ্রগুলির মধ্যে শ্যামবাজার কেন্দ্রটি বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। সেখানে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়ে কাজ করত। বৌবাজারের কাছে একটি তাঁত কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল। সরকারী সাহায্যে হাতে কাগজ তৈরির মেসিনও বসেছিল। সরকারই প্রয়োজনীয় মেসিনপত্র দেয়, মেয়েদের

শেখায়। তৈরি কাগজ তাঁরাই কিনে নিত এবং মেয়েদের মজুরির টাকাও আসত সরকার থেকেই।

"....কেন্দ্রীয় অফিসের বাঁধানো উঠোনে বসল হাতে কাগজ তৈরির সরঞ্জাম। এটি সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যে হয়েছিল। ওরাই মেশিন দিলেন, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিলেন এবং মেয়েদের শেখালেনও। কাগজ যা তৈরি হতো তাও সরকার কিনে নিতেন। কেন্দ্রটি অনেকে দেখতে আসতেন এবং সখ করে কাগজও কিনে নিতেন। মেয়েদের মজুরির টাকা সরকার থেকে আসত। কলকাতায় একটা শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছিল অনেকগুলি মহিলা সমিতির তৈরী শিল্পকর্ম নিয়ে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এসেছিলেন এর দ্বারোদঘাটন করতে। ঐ সময় তিনি আমাদের কাগজ তৈরির কেন্দ্রটি দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন।" মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ১২২-২৩।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সাহায্যে এবং মেয়েদের স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নামে অন্য অনেক সমিতিও খোলা হয়। এরকমই একটি কেন্দ্র পার্ক সার্কাস মহিলা সমিতি। প্রধান পরিচালিকা ছিলেন ৭০ বছরের বৃদ্ধা লীলা বসু। তিনি নিজেই বাড়ি বাড়ি ঘুরে অর্ডার নিতেন, তৈরি জিনিস পৌঁছে দিতেন। আবার বিক্রির টাকা দিয়ে মেয়েদের মজুরীর ব্যবস্থা করতেন। মণিকুন্তলার কথায়, "প্রধান পরিচালিকা ৭০ বছরের লীলা বসু। অসীম তাঁর কর্মশক্তি ও উৎসাহ। থাকেন বালিগঞ্জের প্রান্তে। কিন্তু টুকটুক্ করে সমিতির কাজের দিন এসে উপস্থিত হন। বাড়ি-বাড়ি ঘোরেন, অর্ডার নেন, তৈরী মাল পৌঁছে দেন। বিক্রীর পর দাম সংগ্রহ করে মেয়েদের মজুরীর ব্যবস্থা করেন। সব কর্মী মেয়েদের বাড়ি যান, খবর নেন। তাঁর কাজের কোন অন্ত নেই।"[২৪]

রাজনীতির মেয়েরা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েরাও '৪৩-র সামাজিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে দুর্ভিক্ষ কবলিত আত্মজদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করছিল এবং তাঁদের অনেকেই প্রাণের তাগিদে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছিল সমাজের প্রয়োজনে ভাঙাচোরা পীড়িত মানুষের সাহায্যে। গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা যারা দুঃস্থ মেয়েদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। এরকমই একটি সংস্থা 'নারী সেবা সঙ্ঘ'। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির সহায়তায় গড়ে ওঠা নারী সেবা সঙ্ঘও মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। সঙ্ঘের যুগ্ম সচিব রঞ্জনা মুখার্জীর মতে, "The Sangha also acted as an employment Bureau at this time."[২৫] নানারকম শিল্প শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস, নার্সিং ট্রেনিং প্রভৃতির মাধ্যমে এরা মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার চেষ্টা শুরু করে। ১৯৪৪-র ডিসেম্বর মাসে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা বর্ষেই নারী সেবা সঙ্ঘ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাঙ্গণে মেয়েদের হাতে তৈরি জিনিস নিয়ে একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। সেখানে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের নানা কেন্দ্রের মেয়েদের হাতে তৈরি প্রায় ২০,০০০ শিল্পকর্ম স্থান পায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সরোজিনী নাইডু। কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি উপস্থিত দর্শকদের কাছে অনুরোধ করেন, তারা যেন মেয়েদের হাতে তৈরি প্রদর্শিত প্রতিটি জিনিসই কিনে নেন, কোন জিনিস যেন পড়ে না থাকে।

"As an instance one may recall a grand exhibition organized by the Sangha at the Presidency College, Calcutta as early as December 1944. Sm. Sarojini Naidu came from Delhi to inaugarate this exhibition displaying about 20,000 products of twenty seven centres from different corners of undivided Bengal. In a moving speech Sm. Sarojini Naidu urged the public to buy up all exhibits down to the last button". Ranjana Mukherjee—Nari Seva Sangha. Images / Perspective Pg. 2.

দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় বছরে ধান উঠলে দুঃস্থ মেয়েরা জোতদারের বাড়িতে, ধানকলে কাজ পেতে শুরু করে—"সারা বাঙলাতে দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় বছরে নতুন ফসল উঠলে দুঃস্থ মেয়েরা বিভিন্ন জোতদারের ঘরে এবং ধানকলে ধান ভানার কাজ পেতে আরম্ভ করল। অন্যান্য সমস্ত জিলাতেও অনেক মেয়ের কাজ জুটল।"[২৬] সমাজের নানা স্তরের, নানা অবস্থার মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে গঠিত হল বিভিন্ন সমিতি, সঙ্ঘ। এই সমস্ত সংগঠনগুলি মেয়েদের বিভিন্ন ট্রেনিং-এর মাধ্যমে কাজের উপযুক্ত করে তুলতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের জীবনের ধারা, জীবনযাপন পদ্ধতি আমূল বদলে গেল। কাজের ক্ষেত্র এবং পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হতে লাগল। ঘরের চার দেওয়ালের বাইরে বৃহত্তর জগতে সমাজের প্রয়োজনে রাজনীতির সংস্পর্শে তারা বেরিয়ে আসতে লাগল। রাজনীতির যোগে, সমাজ সেবার, মাধ্যমে, সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সংযোগ তৈরি হল। বীণা দাস তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন যে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সভ্য—রাজনীতি করতেন, রাজনীতির যোগে সাহিত্য চর্চাও করতেন, মন্দিরা কাগজ বের করতেন তাঁরা। দিনগুলি তাঁদের ছিল, 'নানাবিধ কাজের ভিড়ে ঠাসা'। বাড়ি বাড়ি গিয়ে কংগ্রেসের সভ্য করতেন, মন্দিরার বিজ্ঞাপন যোগাড়ের জন্য ডালহৌসি, ক্লাইভ স্ট্রীটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিভিন্ন অফিসগুলোতে ছুটে বেড়িয়েছেন। এরই সঙ্গে ছিল জীবিকার দায়, 'নিজের রুটির জন্য কারুর আছে স্কুল মাষ্টারির ছ ঘণ্টা ধরে চিৎকার, কারো বা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ট্যুশনি করার ক্লান্তি।'[২৭] তাঁর নিজের কথাও বলেছেন, রাজনীতির কাজেই কেটে যেত সমস্ত দিন, খাবারও ঠিক ছিল না। তার মধ্যে 'সে সময়ে ইস্কুল মাষ্টারিটাও করতে হত।' শান্তিসুধা সারা বাংলায় ছেলেদের কলেজে প্রথম মহিলা অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এ ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন—'প্রথম যৌবনাবধি আমার স্বপ্ন, আমি ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করব এবং কোনো পুরুষ কলেজে অধ্যাপনা করব।'[২৮] যদিও সে যুগে এই স্বপ্ন ছিল প্রায় অবাস্তব কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল—তিনি বরিশালের বি. এম. কলেজে অঙ্কের অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান করলেন। তাঁর কথায়, "চৌদ্দ বছর আগে যে বি. এম. কলেজের কুঠরি বিভক্ত শ্রেণীকক্ষের ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেছিলাম উৎসাহে, আনন্দে কিন্তু সসংকোচে, আজ আবার সেই বি. এম. কলেজের সেই সব শ্রেণীকক্ষে এসে পদার্পণ করলাম—অধিকতর উৎসাহ আর আনন্দ বুকে নিয়ে। এবার আর সসংকোচে কুঠরির অন্তরালে নয়, একেবারে উন্মুক্ত, বৃহৎ কক্ষগুলিতে অধ্যাপকের প্লাটফর্মে, উচ্চাসনে।...............................

.................মহিলা অধ্যাপক আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু বি. এম. কলেজেই কেন, সারা বাংলাদেশে ছেলেদের কলেজে মহিলা অধ্যাপক নিয়োগের কোনো রেওয়াজ ছিল না। একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বিদেশিনী মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন বলে শুনেছিলাম।"[২৯]

শান্তিসুধার এই অনুভূতি কি মেয়েদের এগিয়ে আসার পথকেই সূচিত করে না? যে মেয়ে একদিন 'সসংকোচে' অধিকার আদায় করে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে এসেছিলেন শিক্ষার্থীরূপে। তাঁর আকাঙক্ষা, তাঁর চাওয়া সেই সময়ের তুলনায় যতই স্পর্ধিত হোক না কেন, বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না, তার স্থান ছিল হৃদয়ের অভ্যন্তরে। এর ১৪ বছর পরে সগৌরবে তিনি দখল করে নিলেন সেই পুরুষ কলেজের অধ্যাপিকার স্থানটি। আর 'সসংকোচে কুঠরির অন্তরালে নয়', 'অধ্যাপকের প্ল্যাটফর্মের উচ্চাসনে।'[৩০]

নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ইতিহাস অন্বেষণে সম্পূর্ণ এক অন্য জগতের নারীর সংগ্রামের ছবি পাই চলচ্চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবীর লেখায়। বিশ শতকের ত্রিশের দশক শুরু হবার আগেই নির্বাক চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয়ের সূচনা। 'দাঁড়াবার মাটি' যখন 'পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে' ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেলেন। —তাঁর কথায়, "সিনেমো জীবনকে যেন নিছক বেঁচে থাকারই বাস্তব প্রয়োজনে আঁকড়ে ধরে ছিলাম।"[৩০] চূড়ান্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বালিকা কন্যাকে স্বার্থের প্রয়োজনে বাইরে কাজ করতে পাঠাতে মন সায় দিচ্ছিল না মায়ের কিন্তু কানন দেবীর মনে হয়েছিল, "বাঁচার মত বাঁচতে না পারলে জন্মানোর অর্থ কি? সুন্দর জীবন এই পৃথিবীরই কোথাও না কোথাও আছেই এবং যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বার করতেই হবে যে কোন মূল্যে।"[৩১] সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টা ও প্রতিভায় তিনি সে যুগের বাংলা চলচ্চিত্রে সম্রাজ্ঞীর স্থান অধিকার করেছিলেন। নিজের প্রতিভায় ব্যক্তিত্বে যে জায়গাটি তিনি অধিকার করেছিলেন, সেখানে পৌঁছবার নেপথ্যে রয়েছে এক নিঃসহায় নারীর অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা ও চোখের জলের কাহিনী। নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতে মাঝে-মাঝে হাঁফিয়ে উঠতেন কিন্তু তবুও উপার্জনের পথটি ছাড়তে পারতেন না। সেই উপার্জনটুকুই যে তাঁকে আর তাঁর মাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাঁর ভাবনায়, —"এ যেন ক্ষুরের ধারে চলা—এদিকে পড়লে খাদ, ওদিকে গহ্বর। যদি এদের খেয়াল খুশীর কাছে আত্মসমর্পণ করতাম তবে তলিয়ে যেতাম কোন অতলে। আবার এঁদের অমান্য করব এমন জোরই বা কোথায়? তাহলে যে মাকে নিয়ে নিরম্বু উপবাস ও মৃত্যুবরণ। নিজের ক্ষতি যদি বা সহ্য হয় মাকে হারানোর দুঃখ ত সইবে না। যে বয়সে মেয়েরা অভিভাবকদের নিশ্চিন্ত স্নেহাশ্রয়ে হেসেখেলে বেড়ায়—সেই বয়সে জীবিকা সম্বন্ধে কি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বোঝাই না আমার মাথার ওপর চেপেছে।"[৩২] সিনেমায় অভিনয়ই কাননদেবীকে অভাবের তাড়না থেকে বাঁচিয়েছিল—এনে দিয়েছিল স্বস্তি, এসেছিল সুখ-সৌভাগ্য-সম্মান।

বিশ শতকের পেশাদারী মঞ্চের নাট্য সম্রাজ্ঞী সরযূবালাও অভাবের তাড়নাতেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিনয়ের জগতে। জীবনে প্রথম অ্যামিনেন্ট থিয়েটারে 'কুমার

সিংহ' নাটকে ভিখারী বালক সেজে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন নগদ পাঁচটি টাকা। তখন ১৯২২ সাল। সরযূবালার কথায়, "সেই আমার প্রথম স্টেজে আসা, এবং সেই সঙ্গে পয়সা উপার্জন শুরু। তখন আমাদের অভাবের সংসার। যদিও জানি, চলার পক্ষে সেটা কিছুই নয়, তবু একদিক থেকে দেখতে গেলে, আমি একরকম অভাবের সংসারের জন্যই পরে থিয়েটারে আসি।"[৩৩] বাবা মারা যাবার পর অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে দিন কাটছিল। তাঁরা ছিলেন অনেক ভাইবোন। দু'বেলা খাওয়া জুটত না। সেই সময়ে জামাইবাবুর বন্ধুর সূত্রে নাটকে গান গেয়ে পাঁচ টাকা পেয়ে, বেঁচে থাকার জন্য অভিনয়কেই সঙ্গী করে নিলেন।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও অ-শিক্ষিত সমস্ত মেয়েরাই জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৌঁছে যেতে লাগল। উনিশ শতকের একদম শেষ দশকে ঠাকুর পরিবারের সরলা দেবীর বি. এ. পাশ করার কিছু দিন পর মনের মধ্যে ভারি একটা চাঞ্চল্য আসতে লাগল—বাড়ির পিঞ্জর ছেড়ে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্যে, কোন একটা নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্যে, ভাইদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের অধিকারের জন্য।" তিনি মহীশূরের মহারানী গার্লস্ স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদে যোগ দিলেন। তাঁর আগে ঐ পদে ছিলেন কলকাতারই মেয়ে কুমুদিনী খাস্তগির। সরলা দেবীর চাকরি করতে যাওয়া নেহাতই খেয়ালের বশে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বা সত্যিকারের স্বনির্ভরতার তাগিদে তিনি চাকরি করতে যাননি। এ ছিল খেয়ালী মনের খামখেয়াল। ছ'মাস যেতে না যেতেই ভাল লাগার ঝোঁকটা হারিয়ে যেতে লাগল। 'বঙ্গবাসী' সরলা দেবীর চাকরি করতে যাওয়াব

"ভেবে দেখলুম কথাটা কতকটা সত্যি। বিলিতী গল্প পড়ে পড়ে মনের ভিতর জমে ওঠা একটা সখের হাওয়ার ঘূর্ণিতে অনেক দূর এসে পড়া আমার। দাদাদের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার সমান সুযোগ লাভ করে নর নারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবী প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরী করতে আসার মূল প্রেরণা ছিল না—চেতনার তলায় তলায় সেটা থাকলেও উপর উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ছিল। একটা cause ধরলে মানুষ তার উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—তাতেই তার মনুষ্যত্ব। কিন্তু সখের ভিত্তি, বালুর ভিত্তি—ধ্বসে ধ্বসে যায়, সরে সরে যায়, সখ কিছুদিন পরে মিটে যায়। আমারো ছ'মাসের পরে মিটে আসতে লাগল।"—সরলা দেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা', পৃ : ১২৪।

সমালোচনা করে লিখেছিল 'এ খালি বিলিতী সভ্যতার অনুকরণ'। সরলা দেবীর নিজেরও মনে হয়েছিল যে কথাটা কতকটা সত্যি। একবছরের মধ্যেই সখের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ফিরে এলেন। সাহিত্যিক লীলা মজুমদারও ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে দার্জিলিং-এর স্কুলে পড়াতে যান, সেখান থেকে কিছু দিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ডাকে যান শান্তিনিকেতন। একবছর পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। পরে কিছুদিন আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করেন কিন্তু তাঁর নিজের মতে অধ্যাপনা তাঁর পছন্দের কাজ ছিল না, খেয়ালের বশেই তিনি শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। এবং পরবর্তী জীবনে আর কখনও তিনি চাকরি করেন নি।

মনের তাগিদে বা প্রয়োজনের তাগিদে এরা কেউই ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। এঁদের চাকরি করতে যাওয়া অনেকটা সখের, শিক্ষা শেষ করে সংসারে প্রবেশের আগে কিছুটা সময় কাটানোর খেয়াল মাত্র। ক্রমশ শিক্ষিত মেয়েদের সচেতনতা, পরাধীন দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনের তাগিদ, মেয়েদের পারিবারিক নিরাপত্তার গণ্ডী থেকে বের করে আনছিল। বিশ শতকের মধ্যভাগে ভেঙে পড়া অর্থনীতি, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ মেয়েদের বাধ্য করল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে। সামাজিক পরিবর্তনের ধাক্কায় তারা নতুন ভূমিকায় অভিষিক্ত হয়ে এগিয়ে চললনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে।

১ কমলা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২ তৃপ্তি মিত্র, 'আমার ছেলেবেলা', রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ চৈত্র, ১৩৯২, পৃঃ ৫-৬।
৩ সরলাবালা সরকার, "সরলাবালা রচনা সংগ্রহ", 'কায়স্থ সভা ও রমণীগণের উন্নতি', পৃঃ ৬১৫-১৬।
৪ কল্পনা দত্ত (যোশী), "স্মৃতিকথা", 'এক্ষণ', শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯, পৃঃ ২৯-৩০।
৫ কল্পনা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, পৃঃ ২৪১।
৬ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ৭৮।
৭ নিরুপমা দেবী—'আমার জীবন', 'এক্ষণ', শারদীয় সংখ্যা, ১৪০১, পৃঃ ১৪১-৪২।
৮ আশালতা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ২০-২১।
৯ অমিতা সেন, "শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা" পৃঃ ৭৮।
১০ অমিতা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯।
১১ অমিতা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০।
১২ রাণী চন্দ, "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ", (৯ জুলাই ১৯৩৪), পৃঃ ৩।
১৩ ইন্দুসুধা ঘোষ, 'যে আগুন নেভে না', একসাথে বৈশাখ ১৩৯৫, পৃঃ ১৩১।
১৪ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ৫১।
১৫ শান্তিসুধা ঘোষ, পূর্বোক্ত।
১৬ 'Introduction, unemployment among women in West Bengal'—Directorate of National Employment Service, West Bengal, 1958, Chapter I, Pg. 1.
১৭ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।
১৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৫।
১৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৩।
২০ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।
২১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।
২২ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ৯৮-৯৯।
২৩ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২।

২৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৩-২৪।

২৫ Ranjana Mukherjee, Images/Perspective, Pg. 3.

২৬ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯-১০।

২৭ বীণা দাস, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ৬১।

২৮ শান্তিসুধা ঘোষ, পূর্বোক্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ -৭১।

২৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৩০ কানন দেবী, "সবারে আমি নমি", পৃঃ ১২।

৩১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

৩২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬-১৭।

৩৩ সরযূবালা দেবী, 'আমার ছেলেবেলা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১২.৮৫।

৩

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত মেয়েদের, এমনকি অসূর্যস্পশ্য গৃহবধূকেও ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে। তারা চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে আসছে, জগৎটাকে দেখছে জানছে—প্রয়োজনে দেশের জন্য কারাবরণও করছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য আবাল্য লালিত সংস্কারও তারা বিসর্জন দিয়েছে। এরকম অনেকের কথাই জানা যায়, কমলা দাশগুপ্তের লেখায়। ননীবালা দেবী, ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাবার কাছে ফিরে আসেন। বিপ্লবী আন্দোলনের চূড়ান্ত নিপীড়নের পর্যায়ে ভাইপো অমরেন্দ্র চ্যাটার্জীর কাছে 'বিপ্লবের দীক্ষা' নেন তিনি। প্রথমে তিনি পলাতক অমর চ্যাটার্জী এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে প্রায় দু'মাস আশ্রয় দেন রিষড়ার বাড়িতে। অমরেন্দ্রর সঙ্গী রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেপ্তার হবার সময় একটি 'মসার' পিস্তল কোথায় রেখেছিলেন সেকথা জানিয়ে যেতে পারেননি, তখন বিধবা ননীবালা দেবী রামচন্দ্র মজুমদাবের স্ত্রী সেজে রামবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেলে ইন্টারভিউ নিয়ে জেনে এলেন পিস্তলের গুপ্ত খবর। ১৯১৫ সালে বাঙালি বিধবার পক্ষে এরকম পরের স্ত্রী সেজে, জেলে গিযে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না—পুলিশ তো নয়ই, কোনো সাধারণ মেয়েও নয়। আজকের সমাজ ও সেদিনকার সমাজ আজকের মেয়ে ও সেদিনকার মেয়ের মধ্যে আছে বিরাট ব্যবধান। সেদিনকার নারী তৈরি করে দিয়ে গেছে পরবর্তী যুগের বিপ্লবী নারীকে—তিনি পথ দেখিয়েছে, ভিত্তি গেঁথে গেছেন তাদের জন্য।[১] এখানেই শেষ নয়, চন্দননগরে আবার তিনি গৃহকর্ত্রী সেজে বিপ্লবীদের আশ্রয় দেন। অনেক অত্যাচার অনেক যন্ত্রণা নিপীড়ন তিনি সহ্য করেন কিন্তু দলের কোন গোপন তথ্যই তাঁর কাছ থেকে জানতে পারেনি পুলিশ। তাঁরই সার্থক উত্তরসূরী সুহাসিনী গাঙ্গুলী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, জীবন ঘোষাল এঁরা কলকাতায় চলে এলে, ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে তাঁদের পাঠানো হয় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। সেখানে পাঠানো হয় সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে। তিনি বিপ্লবী শশধর আচার্যের স্ত্রী সেজে সাজানো সংসার তৈরি করে আশ্রয় দেন বিপ্লবীদের। অন্যের স্ত্রী সেজে সাজানো সংসার তৈরির জন্য যে সংস্কার মুক্ত মানসিকতার প্রয়োজন ছিল, শিক্ষিতা সুহাসিনী গাঙ্গুলী তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর পনের বছর আগে প্রায় অশিক্ষিত হিন্দু বিধবা ননীবালা দেবীর কাছে যা ছিল শিকল ভাঙারই নামান্তর, সুহাসিনীর পক্ষে সেটা অনেক সহজতর ছিল—"তিনি দিনে চন্দননগরের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন অন্যদিকে বাড়ির এতগুলি লোকের জন্য রান্না ও অন্যান্য গৃহকর্ম অকাতরে করে যেতেন।"[২]

গান্ধীজীর আহ্বানে বেরিয়ে এসে হিন্দু বিধবা নারীরা কারাবরণ করেছেন কিন্তু জেলে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করে খাবার অধিকার পেতে অনশন করেছেন। ক্রমশ এই সমস্ত মেয়েরা দেশের কাজে, দেশের প্রয়োজনে বাহুল্যবোধে নিজেদের আজন্ম লালিত সংস্কার-গুলিকেও ত্যাগ করেছে। সংস্কার মুক্তিতে সাহায্য করেছে মেয়েদের শিক্ষা—অধিকতর সংখ্যায় মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা, আলোকিত হয়ে ওঠা। মেয়েরা ক্রমশ তাদের

সুপরিচিত সংস্কারের গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। অন্তঃপুরের নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরেও খুঁজে নিতে লাগল তাদের আলাদা জগৎ। শাশুড়ি কবিতা লেখা বন্ধ করার আদেশ দিলে বীণা দে'র মনে হয়েছিল "কলম ধরা বন্ধ হলে বাঁচব কি নিয়ে! সারারাত ভেবে কেঁদে মন ঠিক করলুম যে, শাশুড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেয়ে বৌ বেরিয়ে যাওয়াই ভালো হবে"।[৩] শাশুড়ি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন, কবিতা লেখা বৌয়ের সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়। বলেছিলেন, "ফের যদি বৌয়ের হাতে কলম দেখি তো সামনের চালে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাব"।[৪] শিল্পী মুকুল দের সঙ্গে বিয়ে হবার আগে অত্যন্ত অল্প বয়সে

. মেয়েদের উপর সমাজে এবং পরিবারের অন্যায় প্রতিরোধের ছবি পাই বীণা দাসের লেখাতেও। নোয়াখালির চরমণ্ডলপুর গ্রামে তাঁদের ক্যাম্পে মাতঙ্গিনী বলে একটি বিবাহিতা মেয়ে আসত। তার খুব লেখাপড়া শেখার ইচ্ছা ছিল। গরিব বিধবা মা মেয়েকে বেশি দূর পড়াতে পারেনি বলে, মেয়ের খুব রাগ। মায়ের কাছে এই কথা শুনে বীণা দাস মেয়েটিকে পড়ার কথা বলেন, 'বললাম—"এসো না আমাদের কাছে পড়বে?"

আমার ইচ্ছায় চলতে পারলে তো হতই। আমি তো পিঞ্জরে বাঁধা। কার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করুন না।"

মার মুখ আরো গম্ভীর, আরো ত্রস্ত হয়ে উঠল, জামাইয়ের কথা বিশেষ কিছু বলতে চায় না। মেয়েটি কালো, গরিব বিধবার মেয়ে—ভালো বর যে পায়নি অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায়। অথচ মেয়েটির মধ্যে বুদ্ধির প্রখরতা রয়েছে, স্বভাবে রয়েছে তেজ। সুযোগ পেলে হয়তো মানুষের মতো মানুষ হতে পারত। কিন্তু এখন আর হয় না—এখন হয় ওই অন্ধকার পিঞ্জরে জীবনটা অবরুদ্ধ ভাবে ছটফট করে কাটিয়ে দেবে, নয়তো ছিটকে বেরিয়ে যাবে কি জানি কোন্ জঞ্জালে, কোনো অসামাজিকতার মধ্যে।"

বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, পৃঃ ১২১।

বীণা দে'র বিয়ে হয়েছিল কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই স্বামীর মৃত্যু হয়। কিশোরী বিধবা বীণাপানি চট্টোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতেন ছবি দেখতে আর কবিতা পড়তে। স্বামী মারা যাবার পর নিঃসঙ্গ জীবনে কবিতাই ছিল একমাত্র সঙ্গী। যখন শুনলেন বীরভূমের সিউড়িতে সরলা দেবীর সভানেত্রীত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশন হবে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেললেন। কিন্তু পাঠাবেন কি করে? শ্বশুরের সম্পর্কিত ভাই ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি যাচ্ছিলেন ঐ অধিবেশনে, তাঁর ছেলে দেওর বিজিতেন্দ্রকে অনেক তালিম দিয়ে কবিতাটি দিয়ে পাঠালেন। কবিতাটির নাম দিলেন 'অভিনন্দন', রচয়িতা পল্লীবধূ, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। কবিতা বীণা দে'র কথায় 'ধন্য ধন্য প্রশংসা পেল'। তারপর সে কবিতা যখন বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়েব নামে এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়ে শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছল, বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সবাই বলতে লাগলেন "কী সাংঘাতিক কথা, মেয়ের অসাধ্য কিছু নেই, যে লুকিয়ে সভায় কবিতা পাঠিয়ে বিদ্যে জাহির করে গেজেটে নাম ছাপাতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নেই। সে সব করতে পারে। এ বৌ মেয়ে নয়, মনুষ্যরূপী বেড়াল। লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ খায় আর

মুখ মুছে ল্যাজ তুলে ঘুরে বেড়ায়। এ সব পারে ইত্যাদি।"[৫] তখন শাশুড়ির ঐ ঘোষণায় দাদাকে চিঠি দিয়ে গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন বীণা দে। স্থির করলেন আর কখনও সেখানে ফিরবেন না এবং প্রসূতি পরিচর্যা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবেন। তাঁর এক দূর সম্পর্কের জায়ের আঁতুড়ঘরে অকালমৃত্যুর স্মৃতি ছিল বীণার মনে। আর ভাবেন যে প্রসূতি পরিচর্যা শিখলে আরও একটা সুবিধা যে শ্বশুরবাড়িতে আর ফিরতে হবে না, "তখনকার দিনে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে বৌ তাদের সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলত না। সমাজে তাদের বেশ হেয় করেই দেখা হতো। এইসব ভাবতে ভাবতে চিরদিনের মতো ঐ সংসার থেকে বেরিয়ে এলাম।"[৬] নিরুপমা দেবী বলেছেন, তাঁর জীবনের সঙ্কটের সময় কবিতাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বাঁচতে সাহায্য করেছিল। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কোচবিহারের প্রাক্তন মহারানী নিরুপমা দেবীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী ও দুটি শিশুসন্তানকে ছেড়ে চলে আসা খুব সহজ ছিল না। তিনি মনে করেন, তাঁর সাহিত্যচর্চা, মূল্যবোধই তাঁকে সাহায্য করেছিল, তাঁর আদর্শে স্থির থাকতে, শত বাধার মধ্যেও নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে। মাত্র ২৩/২৪ বছর বয়সের একটি মেয়েকে আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে, নিন্দা ও ধিক্কারের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, হয় জয়ী হবেন, নয়তো মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু কিছুতেই নিজের সম্মান বিসর্জন দেবেন না। এইভাবেই শুরু হয়েছিল শিক্ষিত, সচেতন মেয়ের প্রয়োজনে সামাজিক অনুশাসন ও সংস্কারের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করে জীবনের পথে এগিয়ে চলা। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে নিরুপমা দেবী বলেছেন যে, এই ঘটনাটি তাঁর জীবনে এক প্রচণ্ড ধাক্কা-নিদারুণ লজ্জা, অপমানের প্রলয়ংকরী ঝড়ে জীবনের সমস্ত কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। তবুও তিনি সেই প্রতিকূলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন নিজের দৃঢ়তায়। তাঁর নিজের কথায়, 'তবু আমি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম। সে তো সহসা হয়নি, আমার আদর্শের উপর আঘাত আসছিল—তার ভিতর থেকেই আমি নিজের অগোচরে শক্তি অর্জন করছিলাম। আত্মীয় বন্ধুদের উপদেশের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে এমনকি সমস্ত রকম নিন্দা ও ধিক্কারের বিরুদ্ধে আমায় একা লড়তে হবে—জয়ী হতে হবে—আর যদি দরকার হয় মৃত্যুও বরণ করতে হবে। একটা দৃঢ় সংকল্প মনের মাঝে দানা বাঁধে। আমার বয়স মাত্র ২৩/২৪।

ভেঙেচুরে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ; হাল ভেঙে গেল ; পাল ছিঁড়ে গেল, রসাতলে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়, কিন্তু তার মাঝেও আমার কবিতা আমায় ছাড়েনি। যখন আমার পুরনো ঘর ছাড়তে হল আমায় ডুবতে দেয়নি আমার কবিতা, মৃত্যুর আবর্ত থেকে ভাসিয়ে রেখেছিল আমার কবিতা ; আমার জীবনের দিক নির্ণয় করল আমার কবিতা। মিথ্যা থেকে সত্যের পথে টেনে নিয়ে দুঃখ থেকে দীক্ষা নিতে শিখিয়েছিল আমার কবিতা। আমার কবিতা যেন অগ্নি পরীক্ষায় বিজয়িনী হয়ে অমৃতলোকের সন্ধান বলে দিয়েছিল আমার কানে কানে।"[৭]

পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট ভাবধারার বিকাশ মেয়েদের সংস্কার মুক্তির পথে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এইভাবেই হয়ে উঠেছিল মেয়েদের প্রাচীন সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি তথা সার্বিক মুক্তির আন্দোলন, পরিপূর্ণ বিকাশের পথের

দিশারী। সে সময়ে মেয়েদেরই আগ্রহে এবং তাগিদে ছাত্র ফেডারেশনের পাশাপাশি গড়ে উঠল ছাত্রী ফেডারেশন, শুরু হল সর্বভারতীয় ছাত্রী সম্মেলন। দলে দলে সমাজের আলোকপ্রাপ্ত অংশ—ছাত্রীরা এগিয়ে আসতে লাগল দেশের কাজে, বিভিন্ন সংগঠন তৈরির কাজে। ছাত্রীরাই ছিল তখন মহিলা সমাজের সবচেয়ে শিক্ষিত অংশ। লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাওয়ায় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অনেক বেশি করে চোখে পড়ছিল তাদের। মেয়েদের প্রতি সমাজের অন্যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিস্পৃহতা তাদের অন্তরকে পীড়িত করত, আঘাত পেত তাদের শিক্ষিত সচেতন মানসিকতা। গড়ে উঠেছিল সচেতন প্রতিবাদী মেয়েদের বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান। সে সময় এ. আই. ডবলু. সি.-র পরিচালনায় গড়ে ওঠে কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। শিশুদের জন্য ছিল কয়েকটি বালমন্দির এবং গরীব মেয়েদের জন্য ছিল শিল্প সমিতি। এ কাজের জন্য ওরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। পরবর্তী কালে কলকাতায় একটি ওয়ার্কিং উইমেন্স্ হোস্টেল খুলে তারা কলকাতায় চাকরীজীবী মেয়েদের বিশেষ উপকার করেন।......বাস্তবিকই চাকুরে মেয়েদের জন্য সম্মানজনক বাসস্থান কলকাতায় খুব একটা ছিল না। এছাড়া তখন পতিতালয়ে গিয়ে ইচ্ছুক মেয়েদের উদ্ধার করবার জন্য সরকারী চেষ্টার সঙ্গেও এঁরা যুক্ত ছিলেন। পুলিশের সাহায্য নিয়ে একাজ করতে হতো। তৎকালীন সরকারও একাজে ওদের সহায়তা চেয়েছিলেন। উদ্ধার প্রাপ্ত মেয়েদের বাড়ির লোকেরা ফেরত না নিলে লিলুয়া হোমে পাঠানো হতো।[৮]

চল্লিশের শুরুতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে প্রাণভয়ে ভীত কলকাতাবাসী শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল—'সে এক মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। বাঙালীরা কলকাতা মহানগরী

প্রতিভা বসু বলেছেন, "আমার দ্বিতীয় কন্যা রুমি জন্মাবার বছরই মহাযুদ্ধের সাজো সাজো রব উঠে গিয়েছিল। বছরখানেকের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল। কলকাতার আকাশ তখনো অমলিন। কিন্তু আতঙ্ক ছড়িয়ে গেছে। ট্রেঞ্চ খুঁড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে। কলকাতার অনেকেই তাঁদের পরিবারবর্গকে শহরের বাইরে যাদের নিজস্ব গ্রামের বাড়ি আছে সেখানেই হোক বা অন্যত্র বাড়ি ভাড়া নিয়েই হোক পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আপিস চলছে, কোর্ট কাছারি, ইস্কুল কলেজ সবই চলছে সুতরাং বাড়ির কর্তারা যেতে পারছেন না কেউ। কলকাতা প্রায় অর্ধেক খালি।" প্রতিভা বসু, জীবনের জলছবি, পৃঃ ১৫২।

ছেড়ে ছোটো ছোটো মফঃস্বল শহরবাসীগণ আরো অন্তরালবর্তী গ্রামাঞ্চলে ঢুকে পড়ে ধনপ্রাণ বাঁচাতে ছুটলেন। ধনী ব্যক্তিগণ একেবারে বাংলার পশ্চিমসীমা অতিক্রম করে কাশী, গয়া ইত্যাদি উত্তর ভারতের শহরের দিকে পলায়ন করলেন।"[৯] তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে লাগলেন ব্রহ্মদেশ থেকে আরাকান পর্বত ডিঙিয়ে ভারতবর্ষের দিকে ছুটে আসা হাজার হাজার নরনারী। এদের প্রয়োজনে কলকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েরা ক্রমশ সংগঠিত হতে শুরু করল। সংগঠিত মেয়েদের ছবি দেখতে পাই কমলা দাশগুপ্ত, বীণা দাসের স্মৃতিকথায়। তাঁরা এই সমস্ত বিপন্ন মানুষদের সাহায্যের জন্য কাজ করতেন। বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের সাহায্যে এদের পুনর্বাসন—উদ্ধার আশ্রমে পাঠানো, খাবারের যোগান দেওয়া, অসুখে ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত

কাজেই এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতার মেয়েরা। কমলা দাশগুপ্ত বলেছেন, "চট্টগ্রাম হয়ে বহু লোক ট্রেনে চলে এসেছে। আবার প্রোম ও মণিপুর পার হয়ে শত শত নরনারী হাঁটা

"ক্রমে সত্যি সত্যি বাড়তি নাগরিকরা কলকাতা থেকে সরতে লাগল। যাদের মফস্বলে ছুটি কাটাবার আস্তানা ছিল, তারা ছেলেপুলে নিয়ে সেখানে গেল। অন্যরা যে যেখানে পারে থাকবার জায়গা দেখতে লাগল। এরি মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া আরো জমতে লাগল,.....হয়তো মার্চ মাসের কোনো সময় ছেলেমেয়ে আর গোটা দুই লোক নিয়ে আমিও কৃষ্ণনগরে একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। উনি রইলেন কলকাতায়, হাসপাতাল ইত্যাদি ডিউটি নিয়ে।.....বাড়ির মালিক গোপাল ঘোষকে বড় ভালো লাগত। তাঁর স্ত্রীটি মাটির মানুষ। জীবন কেটেছে বর্মায়, তাই সাধারণ বাঙালী ছোট শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে একটু উদার দৃষ্টি। বর্মার গল্প বলতেন। সেখানে তাঁর ভাইয়ের পরিবার থেকে গেছিল। যুদ্ধের হাঙ্গামা বাধতেই বিধবা ভাইবৌ আর তাঁর মেয়েটি প্লেনে জায়গা পেয়ে চলে এসেছিলেন। ছেলেদের সে সময়ে প্লেনে জায়গা কুলোত না, তারা তিন চারজন, বড় দলের সঙ্গে হাঁটা পথে আসছিল। তাদের মা-বোন নানারকম বিপদ আশঙ্কা করে কেঁদে কেটে একাকার হতেন।" লীলা মজুমদার, পাকদণ্ডী পৃঃ (৩০১-০২)।

পথে কোনো প্রকারে পৌঁচেছে। ভীত, আর্ত অতিথিকে কলকাতাবাসী যথাসাধ্য সেবা ও পরিচর্যা করে স্ব-স্ব স্থানে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করেছিলাম।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা যেতাম dock-এ, যেখানে জাহাজ এসে ভিড়ত। হাজার লোক নেমে আসছে জাহাজ থেকে, বাইরে বাতাস পেয়ে তারা বুক ভরে এক একটা নিশ্বাস নিচ্ছে। জাহাজে কত লোক ধরে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি লোক ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে গুদামঠাসা হয়ে এসে পৌঁচেছে। কারো কলেরা, কারো বসন্ত, উদরাময়, জ্বর ইত্যাদি নানা রোগে এবং গরমে আধমরা হয়ে বিহ্বল অগণিত নরনারী ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। Dock-এর আশেপাশে হয়েছে তাদের সাময়িক থাকার ব্যবস্থা।

বীণা দাসের স্মৃতিতে, "এই সময়ে আমাদেরও কিছুদিন হৈ-চৈ করে কাটল এইসব ইভ্যাকুইদের নিয়ে। ওদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নেওয়া, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা।"

বীণা দাস, শৃঙ্খল ঝঙ্কার, পৃঃ ৯৫।

গঙ্গার ধারে বাবুঘাট ধর্মশালা। দূর থেকে দেখা যায় সহস্র সহস্র বিপন্ন মানুষ রয়েছে সেখানে। উদ্‌বিগ্ন চিত্তে তারা অপেক্ষা করছে স্থানান্তরে যাবার প্রত্যাশায়। ফুটপাথ থেকে আরম্ভ করে জনতার ভিড় চলে গেছে ধর্মশালার ভিতরে, একতলায়, দোতলায়—কোথাও তিলার্ধ স্থান বাকি নেই। মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি, তাদের অকাতরে খেতে দিয়ে চলেছেন। শুধু তারা নন, সোশিয়ালিস্টিক পার্টি, নববিধান সমাজ, গুজরাটি অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি কত পরিচিত অপরিচিত রিলিফ প্রতিষ্ঠান সেখানে অক্লান্ত কর্তব্য করে চলেছেন। কংগ্রেস কর্মীদের তো কথাই নেই, প্রাণপণ পরিশ্রম করে দুর্গতদের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করছেন তাঁরা। কংগ্রেসের মেয়েরাও নেমে পড়েছেন দলে দলে।"[১০] তখন থেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েরা ক্রমশ সচেতন হতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে যশোর, খুলনা, বরিশালের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরাও ক্রমশ নিজেদের অবস্থা

ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মেয়েরা যখন এই সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক সভা বা মহিলা সংগঠন তৈরির কাজে যেত, গ্রামের মেয়েদের সচেতনতা তাদের সংগঠন তৈরির কাজে সহায়তা করত। চট্টগ্রামে কল্পনা দত্ত নারী সংগঠন তৈরি করলেন। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারী সংগঠন তৈরির কাজে তিনি অত্যন্ত সাড়া পেয়ে ছিলেন 'চারদিক থেকে'—"একচল্লিশ সালে চট্টগ্রামে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর নিয়ন্ত্রণ বিধিও শিথিল হয়েছে। আমরা আত্মরক্ষার জন্য নারী সংগঠন গড়ে তোলবার পরিকল্পনা নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে জাপ বিরোধী প্রচারও চলতে লাগল। অদ্ভুত সাড়া পেতে লাগলুম চারদিক থেকে। ভদ্রলোকদের কাছে, মধ্যবিত্তদের কাছে, আমরা বলতে লাগলাম যে শিক্ষা কৃষ্টি আপনারা নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন, জাপানি আক্রমণে তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যে-জাতীয় আন্দোলন বিগত পঞ্চাশ বছরের কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে গড়ে তুলেছেন জাপানি রাজত্বে তার আর কিছুই

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে, কংগ্রেসের '৪২ সালের বিপ্লব আসন্ন। সেই বিপ্লবে বাংলার নর-নারীর সমস্ত শক্তি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যথাসম্ভব জড়িয়ে পড়বে, এই ছিল সেদিনের সাধনা। প্রথমেই চলে গেলাম যশোহর, খুলনা, বরিশাল এবং তাদের কিছু কিছু গ্রামের ভিতরে। সঙ্গে আছে বীণা। যেখানেই যাই মেয়েদের মধ্যে চঞ্চলতা, কাজের একটা প্রেরণাবোধ, একটা উদ্দীপনা যেন আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। যেন অপেক্ষায় ছিল একটা সূচনা—"

কমলা দাশগুপ্ত, রক্তের অক্ষরে, পৃঃ ৯১।

থাকবে না। নারী সাধারণের কাছে গিয়ে বললাম নিজের আত্মরক্ষা, ইজ্জত মান রক্ষার জন্য জাপানিদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। কৃষকদের গিয়ে বলেছি জাপ-প্রতিরোধের সংগ্রাম তোমাদের নিজেদের ভাত-কাপড় জায়গা জমি বাঁচানোরই সংগ্রাম।

এর মধ্যে দিয়েই প্রত্যেকের সহজাত দেশপ্রেম দাসত্বের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলাম, কারণ জাপানি আক্রমণ তাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংগঠন বেড়ে উঠল।"[১১] গ্রামের মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে করতে শিক্ষিত সচেতন মেয়েরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করত তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যের দৈন্য। সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করত সেই গ্রাম্য সমাজে বিধবাদের দুর্দশা। এরকম এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন কমলা দাশগুপ্ত—"সেটা ছিল আষাঢ় মাস। যশোহরের একটা গণ্ডগ্রাম। সঙ্গে আছে সুরেশদার মেয়ে কুন্তল দাস। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছি। বোধহয় অম্বুবাচীর তৃতীয় দিন সেটা। একটি বিধবা ছেলেমানুষ মেয়ে ভালো করে কথা বলতে পারছে না, এতই তার শরীর খারাপ লাগছে শুধু আম, কাঁঠাল আর ফল মিষ্টি খেতে সে পারে না। তার ফলে তিনদিনই কাটছে তার প্রায় না খেয়ে। আগুনে ছোঁয়া জিনিস অম্বুবাচীতে বিধবাদের খেতে নেই। কাঁচা ফল দুধ খেতে হয়। সবাই তো তাতে আর অভ্যস্ত নয়। বাঙালীর ডাল ভাতের মুখে মাছের স্বাদের সঙ্গে যেমন সব ফল এবং মিষ্টিই অমৃত মনে হয়, উপবাসী বিধবাদের কিন্তু অনেক সময়ই সেগুলিতে বমি আসে। অথচ বলার উপায় নেই। বিধবাটির করুণ মুখখানি দেখে কিশোরী মেয়ে কুন্তলের মুখখানিও ম্লান হয়ে যায়।"[১২]

অকাল বৈধব্য এবং অশিক্ষা কখনও কখনও মেয়েদের অসম্মানের পথে ঠেলে দিত, অস্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধ্য করত। হিন্দু সমাজের অন্ধ সংস্কার, মেয়েদের প্রতি অন্যায় বিধান তাদের সঙ্গে সঙ্গে কলুষিত করত সমাজ জীবনকেও। বীণা দাস নোয়াখালির এক প্রত্যন্ত গ্রামের কথা বলেছেন। নমঃশূদ্রদের সেই গ্রামে খুব ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। কিশোরী এবং বালিকা বিধবার সংখ্যা গ্রামে ছিল প্রচুর। তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল বড় বেশি অস্বাভাবিক ধরনের—"এখানে বৈধব্যের কড়াকড়ি কম। এক হিসেবে সেটা ভালো। পুনর্বিবাহের কোনো ব্যবস্থা নেই, লেখাপড়াও শেখানো হয় না। মনে হত এ যেন একরকম জোর করে ব্যভিচারের দিকে ঠেলে দেওয়া। প্রকাশ্যে গ্রামের পথে ঠোঁটে আলতা মেখে, গায়ে গয়না পরে, এদিকে সরু পাড় ধুতি ও সিঁদুরহীন সিথিতে বৈধব্যের চিহ্নটুকু বজায় রেখে—রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ে। এ দৃশ্য এর আগে কখনও চোখে পড়েনি।"[১৩] ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অন্যায় সংস্কারগুলি এইভাবে মেয়েদের ঠেলে দিত অন্ধকার জীবনের দিকে। শহর থেকে যাওয়া শিক্ষিত মেয়েরা এদের নানাভাবে সচেতন করতে চাইত। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করত। কোথাও কোথাও গ্রামের মেয়েদের নিয়ে তৈরি হত সমিতি, সেখানে তাদের একত্রিত করে কাগজ পড়ে শোনাত। কোন কোন মেয়ে অক্ষর পরিচয় হতে না হতেই সাঙ্গ করত লেখাপড়া। আবার কেউ কেউ লিখতে পড়তে শিখে নাম সই বা চিঠি লেখার স্তর পর্যন্ত উন্নীত হত। যশোরের গণ্ডগ্রামের সেই কিশোরী বিধবার করুণ মুখখানার কথা ভেবে কমলা দাশগুপ্তের মন বিদ্রোহ করে উঠত, ভাবতেন—আমাদের দেশ যদি কখনো স্বাধীন হয় তবে আমরা এমন ব্যবস্থা করবো এবং এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করবো, যাতে আমাদের বিধবাদের এই অসহ্য পীড়ন ঘুচে গিয়ে তাঁদের মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠবে। পুরুষের যেমন স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক দুঃখ থাকে, মেয়েরাও ঠিক তেমনি। শোকের দুঃখ তো ভুলবার নয়। চিরজীবনের

একই ভাবনা শান্তি দাশের লেখায়, "কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থবির সমাজের অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে চলিষ্ণু জীবনের মুক্ত ধারা বইয়ে দিতে হবে সমাজ মানসের স্তরে স্তরে। চিরশোষিত মানুষের অবলাঞ্ছিত জীবনে আনতে হবে মুক্তির বলিষ্ঠ প্রত্যাশা। জরাতুর জীর্ণ জীবনের দিকে দিকে ঘটাতে হবে বিপ্লবী পরিবর্তন।........শাসকের আর শোষকের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে নতুন অরুণোদয়ের স্বর্ণদিগন্তে।"

শান্তি দাশ, অরুণবহ্নি, পৃঃ-১২৮-২৯।

জন্যই তো সে সঙ্গীহারা হয়ে গেছে। সেটা কি উপবাস করানো, পোশাক ছাড়ানোর মতো বাইরের পীড়ন দিয়ে ঢাকা যায়? ভোলা যায়? নেভানো যায়? মনের দুঃখ তারা নিঃশব্দে নিজের মনেই বহন করবে। কিন্তু যারা ভুলতে পারে এবং অন্য জীবন নতুন করে আরম্ভ করতে চাইবে, তাদের জন্যও খোলা থাকবে স্বাভাবিক পথ। অনাবশ্যক পীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে নারী সেদিন জীবনীশক্তি ফিরে পাবে।"[১৪] শিক্ষিত, সচেতন মেয়েরা এইভাবে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিল মেয়েদের সামাজিক অবস্থান, সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। তাদের পরিশীলিত মন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার লড়াই

হয়ে উঠেছিল একাংশে মেয়েদের জন্য সুস্থ, সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের মত বাঁচবার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মেয়েদের পূর্ণ স্বীকৃতি এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্নই ছিল তাদের দু'চোখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটের মধ্যে বাংলায় বুকে নেমে এল '৪৩-এর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। কয়েক মাসের মধ্যে অসম্ভব রকমের দাম বেড়ে গেল সমস্ত জিনিসপত্রের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের—সব কিছুই সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যুদ্ধে সৈন্যদের রসদ

"দুর্ভিক্ষ। ১৩৫০-এর সেই দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে পশ্চাৎপট করে সেই দুর্ভিক্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত টলিয়ে নড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল। কত পুরনো নিয়ম বদলে গেল, মূল্যবোধ বদলে গেল। নতুন একটা নাম শুনলাম.—'কালোবাজার'।
'কালোবাজার'। আর এরই ফলে কত শত লোক নিঃস্ব হল। আবার কত লোক নিঃস্ব থেকে বড়লোক হয়ে গেল। হল দুর্ভিক্ষ।" *তৃপ্তি মিত্র, ফ্ল্যাশব্যাক, পৃঃ-৮।*

জোগাবার জন্য প্রায় সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই গুদামজাত করেছিল ব্রিটিশ সরকার আর যা অবশিষ্ট ছিল 'তাও কালোবাজারী মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত'। দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছিল গ্রামের পর গ্রাম। গ্রামের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ ভিড় করতে লাগল শহরের রাস্তায়। সম্পন্ন

"....লক্ষ লক্ষ লোক যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছিল, তারা জানত না যে—ক'মাস আগে, তাদেরই কাছ থেকে যে চাল সস্তায় কিনে নেওয়া হয়েছিল, সেই চাল অন্ধকারে গুদামে বন্দী হয়ে আছে। আর তাই তারা অভুক্ত। চালের অভাবে নয়, সে চাল ফুরিয়ে যায়নি। কতগুলো মনুষ্যেতর মানুষ বলছে—'চাল নেই।' তাই আর একটা নাম শুনলাম 'কৃত্রিম অভাব'। তারপর আর একটা নাম 'লঙ্গরখানা'।" *তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৫।*

কৃষক পরিবার পরিণত হল শহরের ভিখারিতে। দুর্ভিক্ষের শিকার হল তাদের ঘরের মেয়ে-বৌরা। তাদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল স্বার্থান্বেষী মানুষ। অর্থের বিনিময়ে, খাদ্যের বিনিময়ে বিকিয়ে গেল তাদের মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ। মণিকুন্তলা সেনের কথায়, "অন্নের জন্মদাতা কৃষকের কণ্ঠে 'ফেন দাও' কান্নাটা বড় বিসদৃশ লেগেছিল। শুধু এই নয় ক্ষুধার অন্যতম বলি হল ঐ কৃষক মেয়েদের ইজ্জত। বিদেশী সৈন্যদের জন্য দালালদের মারফতে একখানা শাড়ি বা একদিনের খাবারের বিনিময়ে 'সস্তা' মেয়েদের বাজারও জমে উঠল। ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি বিশাল দেশের এমন নৈতিক অধঃপতন দেখলে মাথা আপনি হেঁট হয়ে যায়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।"[১৫] একই ছবি দেখি কল্পনা দত্ত (জোশী)-র স্মৃতিকথায়। মজুতদাররাই তখন সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল চট্টগ্রামে। তাঁর কথায় প্রায় দু'লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল চট্টগ্রামে। চাষীরা জায়গা জমি হারিয়ে ছুটে যাচ্ছিল শহরের দিকে, শুধুমাত্র কিছু কাজের আশায়। তাদের ঘরের "মেয়ে মানুষরাও গেল নিজের ইজ্জত বিক্রি করে লেবার কোরের দিকে—শুধু পেটের জ্বালায়। কুৎসিত ব্যাধিও ছড়িয়ে পড়তে লাগল।"[১৬] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ মূল্যবোধ হারিয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নামতে থাকলো। আদর্শ বলে আর কিছুই রইল না মানুষের মনে। খেটে/ খাওয়া মানুষেরা প্রথম থেকেই সব হারিয়ে পথের ভিখারি হয়েছিল কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষ

যাদের হাতে কিছু টাকা ছিল, তারা প্রথমে মজুতদারদের প্রশ্রয় দিয়েছিল কিন্তু ক্রমশ তারা মজুতদারদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে নিজেদের মান সম্মান হারিয়ে অধঃপাতের

> *মানুষ ক্রমশ অমানুষ হয়ে উঠছিল, কিন্তু মূল্যবোধ হারানো মানুষের মধ্যেও যে মানবিকতা, স্নেহ-মমতা একেবারে হারিয়ে যায়নি, যেতে পারে না, তারই একটি টুকরো ছবি পাই কল্পনা দত্ত (জোশী) র লেখায়", লেবার কোরের মেয়ে সরলা। অভাবের তাড়নায় লেবার কোরে যোগ দিয়েছিল। একদিন কাজ করতে গিয়ে মা-বাপ পরিত্যক্ত একটি শিশুকে সে পায় পথের উপর। তাকে কোলে তুলে নিয়ে এলো মানুষ করবার জন্য। দেখা করতে যখন গিয়েছিলাম, তখন সে বলেছিল ঃ 'কোন দুর্ভাগা মা-বাবা হয়ত ফেলে দিয়ে গেছে খেতে দিতে পারবে না এই ভেবে। আমি এখন কিছু রোজগার করছি—তাই মানুষ করতে নিয়ে এলাম।"*
>
> *কল্পনা দত্ত (জোশী), স্মৃতিকথা, পৃঃ ১৩*

পাতের পথেই চলতে শুরু করেছিল। কল্পনা দত্ত (জোশী) কে সবচেয়ে ব্যথিত করেছিল শিশুদের পরিণতি "শিশুদের আর শিশু বলে চিনবার জো নেই। পথে-ঘাটে চোখে পড়ে যেখানে-সেখানে এদের। চোখে দৃষ্টি তাদের অস্বাভাবিক। এই বয়সেই রোজগারও তারা করতে শিখেছে—পথে ঘাটে রাস্তায় মিলিটারির কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া বখশিস্ বিড়ি, সিগারেট মুখেই থাকে। খাওয়া-পরার সংস্থান এমনিভাবেই করে নেয়, মেয়েলোকের সন্ধানও দেয় মিলিটারিকে, দালালকে ; ঘরের মায়া, বাড়ির টান আর এদের নেই।"[১৭]

দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচাতে সে সময় এগিয়ে এসেছিল বাংলার মেয়েরা। কলকাতার 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সংগঠনের মাধ্যমে মেয়েরা এসে দাড়িয়েছিল দুর্গত মানুষদের পাশে। সংগ্রামী, সচেতন বাঙালি মেয়েরা দলে দলে যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সস্তা চালের দোকান খোলা, ক্যান্টিন খুলে দুর্গত মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়াই ছিল তাদের একমাত্র প্রচেষ্টা। কলকাতা, পাবনা, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর জেলায় মেয়েরাই প্রথম দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজ আরম্ভ করে। কন্ট্রোলের দোকানের সামনে দাঁড়ানো ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর সঙ্গে দোকানীরা অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করত। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। দেশবাসীর ভয়ানক দুর্গতিতে পর্দানশীন এবং মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে বৌদেরও স্বেচ্ছাসেবিকার কাজে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে তুললো। মণিকুন্তলা সেনের লেখায় এই সময়ের দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলা এবং জনসেবায় কমিউনিষ্ট মেয়েদের ভূমিকার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"আমরা অনেক মেয়ে জুটে গেলাম এই জনসেবার কাজে। কলকাতার বাজারগুলোর সামনে তখন সর্বদা গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের লম্বা লাইন দেখা যেত। তারা চাল নিতে আসত। আমাদের কর্মীরাও পালা করে তাদের পাশে থাকত। গড়িয়াহাট বাজারে একটি সস্তা চালের দোকান খোলানো হলো।"[১৮] কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী মণিকুন্তলার লেখায় কমিউনিস্ট মেয়েদের কর্মধারার বিস্তৃত বিবরণ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনীতি থেকে বহু দূরে সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক জগতের মানুষ সাহিত্যিক লীলা মজুমদার, তাঁর লেখায় একইভাবে তুলে ধরেছেন এই সময়টিকে, এই মেয়েগুলির

অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। এই সমাজসেবী মেয়েরাই তাঁকে সাহিত্য জগৎ থেকে সরিয়ে এনে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড় করিয়েছিল, তাঁদেরই কথা তিনি বলেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়—'মেয়েদের একটা সেবা সমিতি। নাম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। তারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। বন্ধুরা কেউ কেউ বললেন, 'ওসব ওদের দল বাড়াবার চেষ্টা। জনসেবার নাম করে লোকের দুর্বলতার সুবিধে নেয়।' যারা বলতেন, বলা বাহুল্য তাঁরা কেউ জনসেবার ধার ধারতেন না।.........কিন্তু ঐ কমিউনিস্ট মেয়েদের স্বার্থশূন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, ওদের নিয়মানুবর্তিতা ওদের নিখুঁত অর্গানাইজেশন—সংগঠন নীতি বললে বেশ যথেষ্ট বলা হয় না—দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মুগ্ধ। একদিনও ওরা রাজনীতির কথা বলেনি বা দলে টানবার চেষ্টা করেনি। আমি চিরকাল সব রাজনীতির দল এড়িয়ে চলেছি, এখনো তাই। কিন্তু ঐ মেয়েদের দেখে আমি বুঝলাম নারীত্বের কি অসীম শক্তি। কোনো ন্যাকামি নেই, কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই। এই কাজগুলো করা দরকার, তাই করতে হবে। আর কি অপূর্ব কর্মক্ষমতা। মেয়েগুলো আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে গেল।'[১৯] সরকারের নির্বিকারত্বে আঘাত করার জন্য, চালের দাম কমানোর প্রয়োজনে অনাহারী মহিলা ও বাচ্চাদের এক বিরাট মিছিল একদিন বিধানসভা চালাকালে বিধানসভা ঘেরাও করে। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' ও 'মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ' এর নেতৃত্বে 'সুতো সুতো হয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি পরা হাড্ডিসার শত সহস্র মায়ের দল তেমনি হাড় জিরজিরে মুমূর্ষু শিশু কোলে নিয়ে কলকাতাবাসীর চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।.....এদের অবস্থা সম্বন্ধে মুখের কথায় আর কলমের লেখায় যা এতদিন হয়েছিল তার চেয়ে বহু গুণ বেশি বলে গেল এই কঙ্কালের মিছিল। অভূতপূর্ব দৃশ্য এই কঙ্কালের মিছিলের সুশৃঙ্খল, সুসম্বন্ধভাবে সুদীর্ঘ চলা।........অভূতপূর্ব ছাপ রেখে গেল মানুষের মনে এই ভুখ-মিছিল।"[২০] মণিকুন্তলা সেন জানিয়েছেন যে তখনকার দিনে আইনসভার প্রাঙ্গণে এরকম ঘটনা সেই প্রথম। ফজলুল হক্ ও অন্যান্য মন্ত্রীরা 'হতবাক্' হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন মেয়েদের অনুরোধে। তাঁদের সামনে সার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা আঁচলের পয়সা দেখিয়ে তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁরা ভিক্ষা চাইতে আসেননি, ন্যায্য দামে চাল কিনতে এসেছেন। প্রথমে অক্ষমতা জানালেও তাঁদের প্রত্যেককে দুই সের করে চাল দিতে বাধ্য হয়েছিল হক্ মন্ত্রিসভা। ১৯৪৩-র ১৭ মার্চ খাদ্যের দাবিতে কলকাতার বস্তিবাসী ও উত্তর-দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ৫০০০ মহিলার এই শোভাযাত্রা সমূলে নাড়িয়ে দিয়ে ছিল সমস্ত শহরবাসীকে। মনিকুন্তলার কথায়, "সেদিনের মিছিলের সার্থকতা—আমাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতন কলকাতায় প্রথম ১৬টা ন্যায্য দরের চালের দোকান খোলা হলো এবং সরকার থেকে কয়েকটা বড় ক্যান্টিনও চালু হলো, সেখান থেকে পাড়ার ক্যান্টিনগুলোকে খিচুড়ি পাঠানো হতো। আমাদের কাজও অনেকটা হাল্কা হলো।"[২১] কলকাতার ভুখ মিছিলের দিন চারেক আগে ১৩ মার্চ বাঁকুড়ায় প্রায় ৪০০ জন কৃষক মহিলা কন্ট্রোল দোকানের দাবিতে 'ভুখ মিছিল' করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। কোন ফল না হওয়ায় দু'দিন পর ১০০ জন মহিলার মিছিল আবার যায়। শেষ পর্যন্ত ২৭ মার্চ প্রায় ১০০০ কৃষক শ্রমিক মহিলার এক মিছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেলে তিনি বাধ্য হন ৫টি রেশন দোকান খুলে

রেশন কার্ড বিলি করতে। কলকাতাতেও পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভের ফলে শেষ পর্যন্ত রেশনের ব্যবস্থা শুরু হয়। একই সময়ে পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলার মহিলারা সংঘবদ্ধ আন্দোলন মিছিল ও বিক্ষোভের

"১৯৪৩ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরের অন্তর্গত দাসপুরে ৮ জন কিসান মহিলার নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা ৩০ মাইল পথ হেঁটে এসে জেলা কিষান সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রায় ৬০০ জন কিসান মহিলা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেন যদি আমাদের কিসান ভাইয়েরা এত দাবী আদায় করতে পারেন, আমরা কেন তা পারব না। একশত মহিলা তক্ষুনি কিসান-সমিতিতে যোগদান করেন। সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার আওতা থেকে বাইরে আসার এই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। একজন মহিলা বলেন ঃ "ছেলেদের সঙ্গে এত দূরে আসার জন্য আমায় হয়ত কাল জাত থেকে ঠেলে দেবে জাত ভাইয়েরা। কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেল। আমি জানি সমিতি ঠিক কথা বলছে আর সমাজ বলছে ভুল।"

রেণু চক্রবর্তী, ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা, (১৯৪০-১৯৫০), পৃঃ ৩১।

মধ্য দিয়ে খাদ্য সমস্যা সমাধানের দায় নিজেদের উপরই তুলে নেব। জলপাইগুড়ি জেলার কালিয়াগঞ্জে পাইকার ব্যবসায়ীরা ধানের দাম হঠাতই সাড়ে সাত টাকা থেকে এগারো টাকায় বাড়িয়ে দিলে, কৃষক মহিলারা একজোট হয়ে ধান ৮ টাকা দরে বিক্রির জন্য দাবী জানায়। পাইকার ব্যবসায়ীরা তখন বাধ্য হয় তাদের কথা মত চাল বিক্রি করতে। সে সময় দুর্ভিক্ষ শুধু অন্নেরই ছিল না, বস্ত্রেরও ছিল আকাল। কল্পনা দত্ত (জোশী), তাঁর স্মৃতিকথায় কৃষক পরিবারের এক মধ্যবয়স্কা মহিলা প্রসন্ন বালা রাউজানের বলেছেন—দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের দরিদ্র মেয়েদের খারাপ পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে, গ্রামে গ্রামে অবস্থাপন্ন ঘরে কাজ করে খেয়েছে। কিন্তু কাপড়ের আকালের সময় কাপড়ের অভাবে যখন এই সমস্ত মেয়েদের লোকের বাড়ি খেটে খাওয়ার পথ বন্ধ হতে চলল, "প্রসন্ন বালা ঠিক করল, তারা সকলে মিলে শহরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন যাবে।

স্থানীয় সার্কেল অফিসার সে-কথা জানতে পেরে দলের লিডার প্রসন্ন বালাকে কাপড়ের লোভ দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে চায়। কাপড়খানা সার্কেল অফিসারের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রসন্ন বলল ঃ " 'আমাকে কাপড় দিলে আমাদের লজ্জা নিবারণ হবে না।' কাপড় সে না নিয়ে ফিরে গেল, শেষ পর্যন্ত সদলবলে শহরে এসে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে কাপড় পাওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরে গেল।"[২২]

নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবার তাগিদে এইভাবে সমাজের সর্বস্তরের মেয়েরা এগিয়ে আসতে লাগল। পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েরাও সংগঠিত হবার প্রয়োজন অনুভব করছিল। গ্রামের পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদেরও মনে হল "এই পরদাই আমাদের কাল, বোঝ না? গ্রামের মাইয়া বৌ ঝিগোর এক সভা ডাক। শহর থাইককা কেউ আইসসা দুই চার কথা কউক। যামু সেই সভায়, যা থাকে কপালে।'[২৩] খাদ্য আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় নেতাদের মুক্তির জন্য মহিলাদের নানা সভা-সমাবেশ, পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত মেয়েদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য সমিতির মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল 'নারী সেবা সঙ্ঘ'। মনিকুন্তলা সেনের কথায়, "........আরও একটি সংগঠন গড়ে উঠল। নাম হল নারী সেবা সংঘ। এই সংগঠনের তখন জরুরী প্রয়োজন ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আসা মেয়েরা ক্রমশ গ্রামে ফিরতে লাগল। কিন্তু কিছু অল্পবয়সী মেয়েদের প্রয়োজন ছিল অন্য আশ্রয়। কারণ, তাদের গ্রামে ফিরে আশ্রয় বা সংসার পাওয়ার আশা ছিল না। নিকট আত্মীয়েরা হয় নিখোঁজ, না হয় তাঁরা ছিল এদের ভরনপোষণে অক্ষম।"[২৪] নারী সেবা সঙ্ঘে মেয়েদের নানা ধরনের শিল্প শিক্ষা, তাঁতের কাজ, কাটিং প্রভৃতি শেখানো হত। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নার্সিং শেখার জন্য অনেককে পাঠানো হত। বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসও হত। সঙ্ঘ-র মেয়েদেরই তৈরি বিভিন্ন জিনিষপত্রের প্রদর্শনী হত। প্রদর্শনীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ মেয়েদেরই প্রয়োজনে খরচ করা হত। এখান থেকে শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা নানা রকম চাকরিতে চলে যেত। ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দেওয়া হত। সেই সময় নারী সেবামূলক কাজের জন্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। দুঃস্থ মেয়েদের আশ্রয় ও শিক্ষার জন্য 'উইমেন্স ইউনিয়ন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান নারী সেবা সঙ্ঘের আগেই খোলা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন লেডী রমলা সিন্‌হা।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বনির্ভরতা, সামাজিক অবস্থান, অধিকার এবং সমাজ সংগঠনের কাজে পুরুষের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মেয়েরাও এগিয়ে আসতে লাগল। এই সময় শুধুমাত্র মেয়েদের পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতাই নয়, দুর্বৃত্তের হাত থেকে তাদের মান সম্মান রক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদেশী জাতির ক্রমাগত নিষ্পেষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে দিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ। লীলা মজুমদারের কথায়, "সামাজিক মূল্যবোধ কোথাও এতটুকু নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পুরনো প্রতিষ্ঠিত মানগুলো ভেঙ্গে গেলেও, তার জায়গায় নতুন কিছু গড়ে ওঠেনি।"[২৫] নারী মাংস ব্যবসায়ীদের তৎপরতায় ক্রমশ অধিক সংখ্যক মেয়ে বাধ্য হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল পতিতাবৃতির পথে। এই সমস্ত মেয়েদের রক্ষার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছিল বিভিন্ন মহিলা সংগঠনগুলি। প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ১৯৪৫-র ৬ জানুয়ারি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, নারী সেবা সঙ্ঘ, ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য দশটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। সরোজিনী নাইডু যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাড়ীর মেয়েদের পবিত্রতার প্রতিমা বলে দেখি। কিন্তু অন্য কোন মেয়ের সেই পবিত্রতা যদি ধুলোয় লুটোয় আমাদের কখনও মনে হয় না যে সে মেয়ে এবং আমার বাড়ীর মেয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যতক্ষণ একটি মেয়ের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে, যতক্ষণ একটি মেয়েও পুরুষের লালসায় কুক্ষিগত হচ্ছে, যতক্ষণ অধিকতর শক্তিমান পুরুষের লালসার পঞ্জর কবলিত হচ্ছে শয়ে শয়ে অসহায় নারী, ততক্ষণ

কোন মেয়ের ইজ্জত নিরাপদ নয়। এই সব পাপাচারকে নির্মূল করার দায়িত্ব তোমাদের। জাতীয় গৌরবের ছিটেফোঁটা বোধও যদি তোমাদের মধ্যে থেকে থাকে তবে নারীর সম্মান রক্ষায় উঠে পড়ে লাগ। হয়ত এ মেয়েদের তোমরা চেন না, কিন্তু নাই বা চিনলে ; তবু সে তোমারই বোন। এই বাংলায়ই জন্মেছে। যে বাংলার জলে মাটিতে বেড়েছে সে তোমার বোন বই কি। তার ইজ্জত রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক। এই পবিত্র দায়িত্বই আজ তোমাদের আমি সঁপে দিলাম।"[২৬]

'৪৬-এর তেভাগা আন্দোলনেও প্রথম সারিতে ছিল কৃষক পরিবারের মেয়েরা। এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক পরিবারের মেয়েদের ক্রমশ সচেতন করে তুলেছিল, ভেঙে গিয়েছিল মুসলমান কৃষক পরিবারের পর্দা প্রথা। ছেলেদের পুলিশের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে মুসলিম কৃষক তরুণীরাও পর্দা ভুলে দা, বঁটি হাতে করে বেরিয়ে এসেছে ঘরের বাইরে। এই আন্দোলনের শক্তি সামন্ততন্ত্রের পাঁচিল ভেঙে বাংলার গ্রাম্য সমাজকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। আর্থিক সমস্যা নিয়ে লড়তে-লড়তে তারা নিজেদের সামাজিক অবস্থান, অধিকার এবং সম্মান সম্পর্কেও সচেতন হচ্ছিল—তারা ক্রমশ সম্মানের জীবন, পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকারেরও দাবী তুলছিল। শহর থেকে আসা শিক্ষিত, সচেতন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবক কর্মীদের কাছে তারা স্বামীদের অন্যায় অত্যাচারের বিচার চাইত, জিজ্ঞাসা করত, 'কোন আইনে বৌগরে মারন যায়। কও দেখি কমরেড। আমার মরদ আমারে মারব ক্যান্? আমি বিচার চাই।'[২৭] তারা তাদের বাড়ির পিছনের জমিতে নিজের হাতে বানানো তরি-তরকারী, পোষা-ছাগল, গরুর দুধ, খালে বিলে ধরা মাছ বিক্রির (যা তারা নিজেরাই বিক্রি করে, পয়সা সংসার খরচে লাগাতেন) পয়সা কার, স্বামীর না তাদের, সে কথাও জানতে চাইত। এইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশ হয়ে উঠছিল এ দেশের মেয়েদের বাঁচারও লড়াই।

তেভাগার আন্দোলনের পাশাপাশি ডাক-তার বিভাগের কর্মীদের ভারতব্যাপী ধর্মঘটে কলকাতায় যে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়, সেখানেও স্কুল-কলেজের মেয়েদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তারই কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম লীগের 'direct action' দিন কলকাতায় শুরু হল এক ভয়ঙ্কর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের উদ্ধারের কাজে যেমন এগিয়ে এসেছিল শহরের শিক্ষিত মেয়েরা, অন্যদিকে দাঙ্গার শিকারও হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মেয়েরা। কলকাতার দাঙ্গার পরই শুরু হয়েছিল নোয়াখালির দাঙ্গা। সেখানেও লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, এবং নারী ধর্ষণই ছিল প্রধান। নোয়াখালির দাঙ্গা প্রসঙ্গে শান্তিসুধা ঘোষ বলেছেন, "এবারে হত্যার সংখ্যা কম, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণ এর বিশিষ্ট ভূমিকা। এবং এখানে হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষের পরস্পর হানাহানি নয়, শুধুই মুসলমান তরফ থেকে অসহায় হিন্দু নরনারীর প্রতি অপ্রতিরোধ্য অত্যাচার ও দুর্বল, নিঃসহায়, নির্বীর্য হিন্দুদের আত্মদান বা পলায়ন।"[২৮] মানুষের উপর অমানুষ হয়ে ওঠা মানুষের অত্যাচারের প্রচণ্ডতায় শহরের শিক্ষিত মেয়েরাই শুধু নয়, জেগে উঠেছিলেন গ্রামের নিরক্ষর

অন্তঃপুরিকারাও। বীণা দাস বলেছেন, নোয়াখালির এক গ্রামে মেয়েদের এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আচ্ছা আবার যদি ওরা আপনাদের বাড়ি আক্রমণ করে? আপনারা কি করবেন এবার? তাঁর কথায় 'এক বিধবা বুড়ি প্রথম বলে উঠল— 'এবারে? এবারে এই।' হাতটা তার মুঠো করা, চোখে আগুন। দেখতেও ভালো লাগে। বাকি সকলেরও মত, "সেবার প্রস্তুত ছিলাম না। এবারে মরব, তবু বাড়িতে ঢুকতে দেব না।" বীণা দাশ তাই বলেছেন; "এই ধরনের কথা নোয়াখালিতে পুরুষদের মুখেও কম শুনেছি। মেয়েরা তো কোথাও চিৎকার শুনলেই কাঁদে আর কাঁদে। তাই এদের মুখে এই ধরনের কথা ভালো লাগলো বড়।"[২৯] বারংবার আঘাত তাদেরও উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছিল তাদের চোখেও জ্বলে উঠেছিল আগুন।

এরই মধ্যে এসে গেল '৪৭-এর বহু প্রতীক্ষিত কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত খণ্ডিত স্বাধীনতা। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের মানুষও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে। সম্পন্ন পরিবারের মানুষও পরিণত হল উদ্বাস্তুতে। আর অবধারিতভাবে অবস্থার শিকার হল মেয়েরা। ছিন্নমূল পরিবারের মেয়েরা নানাভাবে প্রতারিত হতে লাগল সমাজের কাছে। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতের চাবুক তাদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শেখাল। তাদের অনেকেই শক্ত হাতে হাল ধরে চাকরি নিয়ে পরিবার প্রতিপালনের ভার নিল। জীবনের সংগ্রাম, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম তাদের অনেক বেশি সচেতন করে তুলল, পরিপূর্ণতা এল ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে। এই মেয়েদের ছবি পাই মনিকুন্তলা সেনের সেদিনের কথায়—"মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত একটা নবজাগরণ দেখেছি। দেশে থাকলে হয়তো এত দ্রুত এই পরিবর্তনটা আসত না। নানা জায়গায় আমাকে ট্রেনে যেতে হতো, তাই ট্রেনে উঠলেই ঐসব মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মেয়ে-কামরা, ছেলে কামরা বোঝাই হয়ে এইসব মেয়েরা আসা যাওয়া করত। ওদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারতাম ওরা কেউ স্কুলে যাচ্ছে, কেউ কলেজে যাচ্ছে, কেউ বা পড়াতে।.......ছোট-ছোট মেয়েরা পর্যন্ত স্টেশন থেকে একলা ওঠা নামা করছে, নিজের কাজে একলা যাচ্ছে—একটুও ভয়ডর নেই। দেশে থাকলে বোধহয় এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। শুধু নিজের জীবনের কেন— এইসব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে।.........এই ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কি উপকার করেছে তা হয়তো কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে মেরে সমস্ত বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংসারের চাপে ছাড়া সহজে হতো না।"[৩০] পূর্ববঙ্গের মেয়েদের বেঁচে থাকার লড়াই সমূলে নাড়িয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজকে। সেই উদ্বাস্তু মেয়েদের প্রয়োজনের চাপে গড়ে উঠতে লাগল কিছু কিছু স্কুল-কলেজ। উপকৃত হল পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা। সংস্কারের পর্দাটিকে সরিয়ে দিয়ে তারাও আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালো স্কুল-কলেজের দরজায় বা শিক্ষা ক্ষেত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর কর্মজগতের প্রবেশ পথে। দেশবিভাগের ধাক্কায় ত্বরান্বিত হলো মেয়েদের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয়।

১ কমলা দাশগুপ্ত—'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', পৃঃ ৩৭।
২ পূর্বোক্ত, পৃ. : ১৫৩।
৩ বীণা দে, পরিচয়, এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ১৪০৪, পৃঃ ১৭২।
৪ পূর্বোক্ত।
৫ পূর্বোক্ত।
৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩।
৭ নিরুপমা দেবী, 'আমার জীবন', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৪০১, পৃঃ ১০১।
৮ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ৫৫।
৯ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ৮৫।
১০ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে', পৃঃ (৯৫-৯৬)।
১১ কল্পনা দত্ত (জোশী), 'স্মৃতিকথা', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯, পৃঃ ৮-৯।
১২ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে", পৃঃ (১২২-২৩)।
১৩ বীণা দাস, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ১২০।
১৪ কমলা দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ (১২৩-২৪)।
১৫ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।
১৬ কল্পনা দত্ত (জোশী), 'স্মৃতিকথা', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৯, পৃঃ ১০।
১৭ কল্পনা দত্ত (জোশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০।
১৮ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৯।
১৯ লীলা মজুমদার, "পাকদণ্ডী", পৃঃ (৩০৭-৩০৮)।
২০ রেণু চক্রবর্তী, "ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা ১৯৪০-১৯৫০", পৃঃ ২৯।
২১ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭২।
২২ কল্পনা দত্ত (জোশী), পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।
২৩ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ?
২৪ মণিকুন্তলা সেন, "পূর্বোক্ত", পৃঃ ১১৭।
২৫ লীলা মজুমদার, "পাকদণ্ডী", পৃঃ ৩০৮।
২৬ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৮।
২৭ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩।
২৮ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১০০।
২৯ বীণা দাশ, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ১৭৪।
৩০ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ১৮৩।

৪

উনিশ শতক থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার তখনকার বাংলাদেশের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। কলকাতা তথা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতকে প্রভাবিত করেছিল, নিয়ন্ত্রিত করছিল ঠাকুর পরিবার। ব্রাহ্মসমাজের উদার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি তাঁদের দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ বাঙালি সংস্কৃতির একটি নিজস্ব ধরন তৈরিতে সাহায্য করেছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা (১৯০১) বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। ছেলেদের আশ্রমিক পরিবেশে লেখাপড়া শেখানোর পাশাপাশি, সেখানে তিনি সহশিক্ষারও প্রচলন করেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের মতে, "........সেকালে যখন মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিল অতি বিরল, তখন একসঙ্গে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা তো একটি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। রবীন্দ্রনাথ কালাপাহাড়ী প্রথায় কোনোদিন সমাজকে আঘাত করেননি, কিন্তু সমাজের যে সব কৃত্রিম সংকীর্ণ বেড়া মানবধর্মের পক্ষে কল্যাণকর নয়, তা ভাঙতে কখনো দ্বিধা করেননি। ভাঙার প্রথা ছিল শোভন। কারো বিশ্বাসকে কঠিন আঘাত না হেনে ধীরে-ধীরে সকলের মনকে শুভবুদ্ধি দিয়ে তিনি জয় করেছেন।

কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের নিয়ে তাঁর এতদিনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার সুযোগ পেলেন। সকাল বিকেল ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের গাছের তলায় বসে পাঠগ্রহণ, সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখা, আবৃত্তি করা, বুধবারে মন্দিরে উপাসনায় যোগ দেওয়া এবং খেলাধূলায় দিনগুলি তাদের অতিবাহিত হতে লাগল।"[১] মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শৈল্পিক চেতনা, শিল্প ভাবনার বিকাশের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁর নিজের লেখা গান তিনি আশ্রমের ছেলেমেয়েদের শেখাতেন। সে যুগে সহশিক্ষার প্রচলন, মেয়েদের গান শেখানো, ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় করানো, এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন করেছিল। কিন্তু সুস্থ জীবনবোধ, সুস্থ স্বাভাবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য তিনি কোন অন্যায় বিরোধিতা'ই মেনে নেননি। ক্ষিতিমোহন সেনের মেয়ে অমিতা সেন, শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত স্মৃতিচারণে বলেছেন, "যেখানে যা কিছু শিল্পসৌন্দর্য দেখে রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছে, আশ্রমকন্যাদের শেখাবার জন্য কতভাবে তার চেষ্টা তিনি করে গেছেন।"[২]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে তথাকথিত ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্য নাচ, গান নিষিদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শান্তিনিকেতনের মেয়েদের গান শেখানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গান তিনি মেয়েদের গলায় তুলিয়ে দিতেন। ক্রমশ গানের সঙ্গে অল্প একটু হাত পা নেড়ে ভাবপ্রকাশের মধ্য দিয়ে ভাবনৃত্যের সূচনা হল। সেটা ১৯১৮-১৯ সালের কথা। 'বাল্মিকী প্রতিভা' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'ভাবনৃত্যে'র প্রচলন কিভাবে আস্তে আস্তে শুরু হল, তার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন অমিতা সেন। "গানের সঙ্গে একটু হাত নাড়া এই নাটকেই আমাদের প্রথম শুরু হয়। আমরা বনদেবীরা মঞ্চে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে 'সহে না সহে না' গাইতে গাইতে হাত নেড়ে 'না' প্রকাশ করতাম,

তারপর 'কাঁদে পরান" গাইবার সময় বুকের ওপর হাতটি রাখতাম। 'রিম ঝিম ঘন ঘন রে বরযে' গানটি গাইবার সময় দু'হাত নেড়ে একটু বর্ষার ধারা বোঝাতে চেষ্টা করতাম। বালিকা বেশে অমিতা শঙ্কিত চোখে হাতখানি মেলে দিয়ে, গানটি গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করত। তারপর "চরণ অবশ হয়ে, শ্রান্তক্লান্ত গাইতে গাইতে ক্লান্তভাব ফুটিয়ে মাটিতে বসে পড়ত। আবার ভীত চকিত হয়ে উঠে বিহুল দৃষ্টিতে মঞ্চের এদিক-ওদিক ঘুরে গাইত "একী ঘোর বন! এনু কোথায়!"[৩]—এইভাবেই আশ্রমকন্যাদের 'নৃত্যের অ আ ক খ' শুরু হয়। কিভাবে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের মেয়েদের মধ্যে থেকে সে যুগে মেয়েদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের মেয়েদের নাচের চর্চা আস্তে আস্তে শুরু হয়েছিল, সেই ১৯১৮-১৯ থেকেই, অমিতা সেনের লেখায় তারই ছবি পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ঋতু উৎসবের প্রচলন করেছিলেন। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি নানা রূপে, নানা সাজে সেজে ওঠে। প্রকৃতির রূপের পরিবর্তন ছাপ ফেলে মানুষের মনে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনও যেন উন্মুখ হয়ে উঠত। প্রকৃতিকে নতুন রূপে, নতুনভাবে বরণ করে নেবার জন্য। প্রকৃতির অকৃপণ সম্পদের ডালি গ্রহণ করতে চাইতেন

"আরেক আশ্রম কন্যা সুকৃতি চক্রবর্তীর কথায়, 'ওখানে উৎসব আনন্দ লেগেই থাকত—নববর্ষ, ঋতু উৎসব, হলকর্ষণ, গুণী ব্যক্তিদের স্মরণ সভা, বৃক্ষরোপন আরও কত কী! সেই সব উৎসবে নাচ গান থাকতই।"

সুকৃতি চক্রবর্তী. 'নটরাজের নৃত্যশালে', দেশ—২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ২৬।

যথোপযুক্ত উপঢৌকনের মধ্যে দিয়ে—নাচে গানে, অভিনয়ে মন ভরিয়ে আশ্রম ছিল উৎসবময়। প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এদিকে শীতের জোর কমে এসেছে, চারিদিকে ঝরা পাতার খসখস আওয়াজ যেন বসন্তের পদক্ষেপের মতো শোনায়, শিমূল ও পলাশের মধ্যে উঁকি মারছে ফাল্গুনের আগুন। দোল উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। বাবামশায় ফাল্গুন পড়তেই খোঁজ নিচ্ছেন ব্যবস্থা সব ঠিক হয়েছে কিনা। কিছুরই ত্রুটি হলে চলবে না, যেমন নাচ-গান-অভিনয় উৎসব হয়ে থাকে তেমনি হবে। আমাদের বললেন তোমরা কিছু করো, 'নটীর পূজা'র রিহার্সাল আরম্ভ করে দাও। কিছু করা চাই নইলে শান্তিনিকেতনের জীবন ঝিমিয়ে পড়বে যে। নিজেই শৈলজাবাবু ও শান্তিকে ডেকে গান বেছে দিলেন। 'নটীর পূজা', তাঁর আদেশে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি করা হলে সর্বসমক্ষে উৎসবের দিনে অভিনীত হবার আগে তাঁর সামনে নিরালায় একদিন অভিনয় হোলো। তিনি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।"[৪] শুধু কি ঋতু উৎসব, তার সঙ্গে ছিল নববর্ষ, বৃক্ষরোপন, হলকর্ষণ, জ্ঞানী গুণীদের স্মরণ সভা ইত্যাদি আরও কত কিছু। সমস্ত উৎসবেই থাকত নাচ, গান, আবৃত্তি, কখনও বা অভিনয়। এইভাবে শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বাঙালি সংস্কৃতির এক নতুন জোয়ার, নতুন ধারা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই আগ্রহ, উৎসাহ ছিল।

বাল্মীকি প্রতিভায় যে নৃত্যের অ-আ-ক-খ-র সূচনা, শারদোৎসবে সেই স্তর অতিক্রম করলেন শান্তিনিকেতনের মেয়েরা। প্রথমে গানের বিভিন্ন অংশের ভাব অনুযায়ী হাত পা নাড়া অর্থাৎ শারীরিকভাবে সেই গানকে মূর্ত করে তোলার মধ্যে দিয়েই সূচনা হয়েছিল

ভাব নৃত্যের। তালের নাচ ও ভাবের নাচ মিলেমিশে তারপর হল সম্পুর্ণ নাচ। রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে করতে বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যশৈলীর বিশিষ্টতা, তাদের শিল্পীদের নিয়ে এসে, কখনো বা ছবি তুলে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন। অমিতা সেনের কথায়, 'নানা দেশের নাচের ছবি আশ্রম কন্যারা দেখেছে। মন তাদের সমৃদ্ধ হয়েছে, দৃষ্টি তাদের খুলেছে।'[৫] মনিপুরী, দক্ষিণ ভারতীয়, পাঞ্জাবী গরবা, জাভার নৃত্যকলা প্রভৃতি সমস্ত কিছু মিলেমিশে বিভিন্ন প্রকৃতির ভাব ও ঘরানার সম্মেলনে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র নৃত্য-ভাবনা সম্পূর্ণতা পায়। 'নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ' গানটির নৃত্যরচনা প্রসঙ্গে অমিতা সেন বলেছেন, "বাসুদেব বলে একজন দক্ষিণী ছাত্র তখন এখানে ছিলেন। তিনি খুব ভাল দক্ষিণী নাচ জানতেন। তাঁর কাছে দক্ষিণী নাচের ছন্দ এবং ভঙ্গী শিখে আমরা এই নৃত্যটি রচনা করেছিলাম। এই বাসুদেবের জন্যই সেবার নটরাজের নাচে বেশ একটু নতুনত্ব দেখা দিল। মনিপুরী নাচের সঙ্গে দক্ষিণী নাচের ভাব এসে মিলল সেবার এই 'নটরাজে'। শান্তিনিকেতনী নৃত্যধারা এইভাবে নতুন নতুন পথে নতুন নতুন নৃত্য সৃষ্টি করে ক্রমশ একটি সম্পূর্ণ রূপের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছিল।"[৬]

ঋতু বন্দনা প্রসঙ্গে ছয় ঋতুর বন্দনার জন্য ছটি ছোট ছোট নমস্কারের গান করেছিলেন কবি। এবং সেই নমস্কারের নৃত্যে কখনও কখনও মনিপুরী ও দক্ষিণীর শৈলীর সঙ্গে

"মনিপুরী নৃত্যের নমস্কারে থাকে কমনীয় লাস্যভাব। দক্ষিণী নমস্কারের ভঙ্গীতে থাকে নটরাজের ধ্যান মূর্তির স্থির গাম্ভীর্য। মনিপুরী এবং দক্ষিণী ভাবের সঙ্গে সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাঙ্গালী কল্যাণীদের নমস্কার মিলিয়ে 'নৃত্যের তালে তালে' গানের মাঝে মাঝে নমস্কারের নাচ করেছিলাম যমুনা আর আমি। এই সব নতুন ভাবের নৃত্য রচনার পিছনে থাকত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা। যে কোন নৃত্য রচনাকালে বারংবার তাঁর পাশে গিয়ে বসেছি। কত ভাবে কত কথা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছি যা আমাদের মনোভাব জাগিয়ে তুলেছে।"

অমিতা সেন, আনন্দ সর্বকাজে, পৃঃ ১০৯-১০।

বাংলাদেশে সন্ধ্যাবেলা তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালানোর কল্যাণী ভঙ্গিমার সংযোজনে নমস্কারের নাচ গড়ে তুলেছিলেন অমিতা সেন এবং নন্দলাল বসুর মেয়ে যমুনা সেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও আগ্রহে তৈরি হত এই সমস্ত নতুন ভাবের নাচ। ভাবনৃত্য তৈরি করতে গিয়ে গান বা কবিতার প্রতিটি শব্দের অর্থ রবীন্দ্রনাথ তাদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর বোঝানোর মধ্য দিয়ে তাঁর অনুভূতি যেন সঞ্চারিত হত সেই বালক-বালিকার অন্তরে, মূর্ত হয়ে উঠত নৃত্যের মধ্য দিয়ে। সুকৃতি চক্রবর্তী বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বলতেন, এই যে তোরা এত সব নাচ শিখেছিস কাঠামোটা তৈরি হচ্ছে, এটা দরকার। তবে আমার গানের সঙ্গে যখন নাচবি তখন সেই কাঠামোর উপরে গানের ভাব অনুযায়ী প্রতিমা গড়ে তুলবি।"[৭] রবীন্দ্র নৃত্যশৈলী গঠনের যুগে নানা ভাঙাগড়ার সাক্ষী অমিতা সেন, সুকৃতি চক্রবর্তী। তাঁদের লেখায় পরতে পরতে উঠে এসেছে, সেই নাচ শেখার সময়ের বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনা, অনুভূতিজাত অভিজ্ঞতা। অমিতা সেন বলেছেন, "আমরা ছাড়া তাঁর নাচ শেখানোর বর্ণনা তো আর কেউ লিখে যেতে পারবে না। তাই যত অক্ষম ভাষাই হোক না কেন—সেই ভাষাতেই আমি তাঁর নৃত্যসৃষ্টির নৃত্যশিক্ষা দেবার অবর্ণনীয় কাহিনী লিখে যাব।"[৮]

নৃত্যভঙ্গিমাই শুধু নয়, নাচের মেয়েদের উপযুক্ত সাজের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। নাচের মেয়েদের সাজিয়ে দিতেন প্রতিমা দেবী এবং শিল্পী নন্দলাল বসু। মেয়েদের নিজের হাতে সাজাতেন প্রতিমা দেবী। কিভাবে কতটা সুন্দর, নিখুঁত করে তোলা যায় তাদের সাজ, সে বিষয়ে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। তারপর সাজা সম্পূর্ণ হত মাষ্টারমশাই নন্দলাল বসুর ছোঁয়ায়। তিনি সকলের ভুরু আর চোখ এঁকে দিতেন নিখুঁত হাতে, ঠোঁটে

সুকৃতি চক্রবর্তী বলেছেন, "আমি চিরদিন দেখেছি, চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা তো হতই, তাছাড়া আমি, কি, সেবা বা মমতা যেই অভিনয়ে অংশ নিতাম, তার মুখের রূপ অনুযায়ী মাষ্টারমশাই ভুরু কি চোখ আঁকতেন। কোন নাচে কে অংশ নিচ্ছে, তাকে ভেবে এই যে রূপসজ্জা সেটা নিশ্চয়ই নৃত্যে আলাদা মাত্রা আনত। যে নাচছে তারও ভালো লাগত, সে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত, দর্শকদেরও তা একটু বেশি ভালো লাগত নিশ্চয়ই।"

নটরাজের নৃত্যশালে, দেশ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬ পৃঃ ৩৫।

বুলিয়ে দিতেন রঙের তুলি। মানানসই করে কারো খোঁপায় পরিয়ে দিতেন ফুল, কারো বেণীতে জড়িয়ে দিতেন মালা, কারো বা গায়ে ঝুলিয়ে দিতেন পছন্দ মত রঙিন ওড়না। নন্দলাল বসু ও প্রতিমা দেবীর হাতেই সম্পূর্ণ সজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে উঠতেন নৃত্যশিল্পীরা।

শুধু নাচ বা অভিনয় শেখানো কিংবা নৃত্যের উপযোগী সুসজ্জিত করে তোলাই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিমা দেবী ছিলেন আশ্রমের মেয়েদের আদর্শ। অমিতা সেনের কথায়, "শুধু কি অভিনয় আর নৃত্যেই প্রতিমা বৌঠানের দান? সেকালের মেয়েদের পোশাকে পরিচ্ছদে, ঘর সাজানোতে, বাগান পরিকল্পনাতে সবেতেই তিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ। প্রতিমা বৌঠান আমাদের মধ্যে এসেছিলেন এমনই একটি সময়ে যখন মেয়েদের ঘরে-বাইরে রুচিবোধ নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। এই নতুন সুন্দরের আহ্বানে বৌঠানই ছিলেন আমাদের অগ্রণী।"[৯] আশ্রমের মেয়েদের নিজের ভাবনা চিন্তা কাজকর্ম ও সাহচর্যের মধ্য দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনবোধ ও সুন্দর রুচিবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন প্রতিমা দেবী। ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি চেতনা, শিল্প ভাবনা, সূক্ষ্ম সুন্দর রুচিবোধ এইভাবেই সঞ্চারিত হয়েছিল বাঙালি মেয়েদের মধ্যে।

উৎসবময় শান্তিনিকেতনের প্রতিটি আনন্দ উৎসব উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করতেন কবিতা গান। শান্তিনিকেতনে 'প্রকৃতি তার ক্যালেন্ডারের পাতা' মেলে ধরত আকাশে বাতাসে

"......বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরে নানা অনুষ্ঠানের জন্য ছেলেমেয়েরা গান, আবৃত্তি, অভিনয় ও নাচের চর্চা করত। বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ করে গুরুদেব নাচ-গান-অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে রচনা করেছিলেন বসন্ত, শেষ বর্ষণ, নটীর পূজা, নটরাজ, ঋতুরঙ্গ, তপতী, শাপমোচন, নবীন, শ্রাবণ-গাথা, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি। এইসব গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যকে অবলম্বন করে গুরুদেব প্রচুর নতুন গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন।"

সুকৃতি চক্রবর্তী, নটরাজের নৃত্যশালে; দেশ, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ২৩।

গাছে গাছে, ফুলে ফলে। সকলের মনকেই নাড়া দিত ঋতু পরিবর্তনের জোয়ার। কবির সৃষ্টিশীল মনের রুদ্ধ দরজাটা উন্মুক্ত হয়ে যেত, উদ্ভাসিত হয়ে উঠত নতুন সৃষ্টির আলোয়।

কবির গানের উৎসমুখ খুলে যেত, লিখতেন একের পর এক গান। সাহানা দেবী রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, যে কবি গান রচনার সময় গুনগুন করে গান গেয়ে গেয়ে লিখতেন। ফলে একই সঙ্গে 'কথা' ও 'সুর' রচনা হয়ে যেত—"গান রচনার সময় গুনগুন করে গেয়ে গেয়ে কবি গান রচনা করতেন। গাইতে গাইতে তাঁর কথা ও সুর দুইই একসঙ্গে এসে যেত। এই ছিল তাঁর গীত রচনার ধারা বলতে যা বোঝায় তাই।"[১০] সেই গান তখনি তখনি শিখিয়ে দিতেন ছেলেমেয়েদের। নতুন গান শেখার জন্য ডাক পড়ত তাদের। প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে গান শেখার স্মৃতি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "নতুন গান শেখবার জন্য গুরুদেবের কাছ থেকে আমার মাঝে-মাঝেই ডাক পড়ত। বড়দের দলে আমিও জায়গা পেতাম।"[১১] রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায় আসতেন, মাঝে মাঝে সাহানা দেবীরও ডাক পড়ত গান শেখার জন্য। দিনেন্দ্রনাথ যদি না থাকতেন, তখন শিখিয়ে দেবার ভরসাযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তাঁরই ডাক পড়ত। এবং এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাহানা দেবী

"কবি গান রচনা করেই তখুনি তখুনি তা কাউকে শিখিয়ে দিতে চাইতেন। দিনুদা থাকলে দিনুদাকে, না থাকলে অন্য কাউকে। অবশ্য অন্য কাউকে মানে যাকে তাকে নয়। এমন কাউকে, যাকে শিখিয়ে কবি তাঁর গান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।" ঐ, পৃঃ ৯৮।

বলেছেন যে নিজের গান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'আমার গান যেন আমার কন্যাদায়, কাউকে শিখিয়ে ধরে দেওয়া, যেন বরের হাতে কন্যাকে সঁপে দিয়ে করজোড়ে মনে মনে বলা, যদি সুখে রাখো বাপু তবেই সব সার্থক।"[১২]

আশ্রমের বালক-বালিকা ছাড়াও আশ্রমবাসিনী অর্থাৎ অধ্যাপকের স্ত্রীদেরও রবীন্দ্রনাথ নানা শিল্পকর্মে, সৃজনমূলক কাজে উৎসাহিত করতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে তাঁরা নিজের হাতে তৈরি করতেন নানা রকমের উপহার। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে গুরুপত্নীরা সারাদিন সংসারের কাজকর্ম করে, সন্তান পালন করেও যোগ দিতেন সাহিত্য চর্চায়, শিল্প ও সঙ্গীত শিক্ষায়, শিখতেন বিদেশী ভাষা। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন অনেকেই। ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী কিরণবালা ভর্তি হয়েছিলেন নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে। তিনি নিজের খেয়ালেই মাটি দিয়ে মূর্তি গড়তেন। তাঁর তৈরি মায়ের কোলে শিশুর একটি মূর্তি অবনীন্দ্রনাথের এত ভাল লেগেছিল যে তিনি সেটি নিজে হাতে ব্রোঞ্জে ঢালাই করে কলাভবনে সাজিয়ে রাখেন। রবীন্দ্রনাথের শ্যামলী বাড়িতেও রয়েছে তাঁর হাতের ছাপ। গুরু নন্দলালের ডাকে সেখানে তিনি গড়েন চাষী, চাষী বৌয়ের মূর্তি। নন্দলাল বসুর স্ত্রী সুধীরা বসুর হাতের কাজ ছিল অসাধারণ। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জন্য প্রকৃতির থেকে পাওয়া ফুল, পাতা দিয়ে তিনি তৈরি করতেন সুন্দর সুন্দর গয়না। অমিতা সেনের অসাধারণ বর্ণনায় উঠে এসেছে তাঁর শিল্পকর্মের কথা। —"উৎসবে অনুষ্ঠানে বাইরের মেয়েরা আসে শান্তিনিকেতনে, পরনে তাদের দামী শাড়ী, হাতে সোনার চুড়ি, বালা, কানে সোনার ঝুমকো। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ ভুলে গিয়ে মনে জাগত ঈর্ষার ভাব। আমরাই বা কেন সাজব না ওদের মতো গয়না শাড়ীতে। আমাদের মনের

বাসনা পূরণ করতে বসে গেলেন সুধীরা দেবী। কাঁঠালের পাতা নানা নক্‌শা আকারে কেটে, ছুঁচ সূতোয় সেলাই করে তাতে আকন্দ ফুল, টগরের সাদা মুক্তোর মত কুড়ি, লাল রঙের ফুল, হলদে লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল ধূনোর আঠা দিয়ে বসিয়ে তৈরি করলেন খোঁপায় দেবার গয়না, কানে ঝোলাবার ঝাপটা, গলায় পরবার নক্‌শা কাটা মালা, হাতের বালা, বাজু। কী অপূর্ব সুন্দর সব গয়না। এর কাছে কোথায় লাগে সোনার সাত লহরি মুক্ত বসানো মালা, জড়োয়া চুড়ি বালা ঝুমকো। এবার হাওয়া গেল পালটে, এখন সোনা ও জড়োয়া গয়না পরা বাইরে থেকে আসা মেয়েরা আমাদের ফুলের অপূর্ব গয়না দেখে ঈর্ষাকাতর। তাদের ঈর্ষার দৃষ্টিতে আশ্রম বালিকাদের বুকে লাগে গর্বের দোলা।"[১৩] শিল্পচর্চা ছাড়াও 'আশ্রমবাসিনী'দের একটি নিজস্ব সমিতি, 'মহিলা সমিতি' গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন 'আলাপিনী'। সেখানে সাহিত্যচর্চা, অভিনয়, গান সমস্ত কিছুই হত। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং উৎসাহে তাঁরা এই সমিতি থেকে একটি পত্রিকাও বের করতেন, শ্রেয়সী। সম্পাদনায় ছিলেন কিরণবালা সেন। শুধু আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে এবং চেষ্টায় 'গুরুপত্নী' অর্থাৎ অধ্যাপকদের স্ত্রীরাও শান্তিনিকেতনের উদার বিস্তৃত মুক্ত প্রাঙ্গণে নতুন জীবন রসের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত গৃহবধূর জীবনে যা সহজলভ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার স্পর্শে এবং সাহচর্যে সম্ভব হয়েছিল তাদের প্রতিভার বিকাশ—গড়ে উঠেছিল সৌন্দর্যবোধ, রুচিবোধ, সুন্দর শিল্পীমন।

বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম বা হাতের কাজ শেখানোর প্রতিও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। আশ্রম বালিকাদের ছুঁচের কাজ শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সুকুমারী দেবী। তিনি আশ্রমের মেয়েদের 'সূচীশিল্প' ও 'আল্পনা' শেখানোর ভার নিলেন। 'লক্ষ্ণৌ'র নক্‌সা সেলাই, কাঠি কাজের ওপরে কাঁচ বসানো রংবেরঙের সূচীশিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের কাঁথার ফোঁড় মিলিয়ে সুন্দর সব নমুনা তৈরি করে মেয়েদের তিনি শেখাতে শুরু করেন।[১৪]

নাচ, গান, লেখাপড়া বা শিল্প শিক্ষাই নয়, মেয়েদের শারীরিক উন্নতির প্রয়োজনে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে তোলার জন্য তিনি বিদেশী প্রথায় মেয়েদের সাঁতার এবং যুযুৎসু শেখানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আশ্রম বালিকাদের সর্বাঙ্গীন সামগ্রিক শিক্ষার কথাই ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতি এবং পরিবেশ এমন ছিল যে নানা ধরনের শিক্ষা পেতে পেতে কখনো এগুলি তাদের কাছে ভার বোঝা হয়ে ওঠেনি, মনে হয়নি বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া। আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমস্ত কিছুই ছিল স্বতস্ফূর্ত, সহজাত। অমিতা সেনের শান্তিনিকেতনের 'স্মৃতিকথা'র শিরোনামটিই এর সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য—'আনন্দ সর্বকাজে'। অর্থাৎ সমস্ত কাজ তাঁরা করতেন মনের সহজ আনন্দের মধ্য দিয়ে। এসবের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সুগৃহিনী করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের মেয়েদের রান্না শেখায় জোর দিতেন। পৌষ পার্বনের দিনে আশ্রমের বড় রান্নাঘরে সব মেয়েরা একত্রিত হয়ে পিঠে তৈরি করত। রান্নার সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশন করতেও শিখতে হত মেয়েদের।

"......রন্ধন বিদ্যা আশ্রম বালিকাদের শিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাতে সপ্তাহে দুদিন 'দ্বারিকে' নারী ভবনের রান্নাঘরে আমরা ঠাকুরদের সঙ্গে নানারকমের জলখাবার তৈরি করতে শিখতাম। রান্নাঘরের ঠাকুররা অতি স্নেহ ও ধৈর্য্যের সঙ্গে আমাদের খাবার করতে শেখাত।"

অমিতা সেন, শান্তিনিকেতনের আশ্রম কন্যা, পৃঃ ৭২।

শান্তিনিকেতনের স্বতন্ত্র পরিবেশে প্রতিপালিত মেয়েরা পরবর্ত্তী জীবনে শান্তিনিকেতন ছেড়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছে। রবীন্দ্র ভাবনার সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা জীবনবোধের যে উত্তরাধিকার তারা বহন করে নিয়ে গেছে, তাকে তারা পৌঁছে দিয়েছে মানুষের মধ্যে, অত্যন্ত সার্থকভাবে। নিজের বিবাহিত জীবনের কথা বলতে গিয়ে অমিতা সেন বলেছেন, "নৃত্যের ক্ষীণ একটি ধারা সঙ্গে নিয়ে আমি চলে গেলাম পদ্মা পারের দেশ ঢাকায়।'[১৫] বিয়ের পর যখন তিনি শ্বশুরবাড়ি ঢাকায় গেলেন, সেখানে নাচ তো দূরের কথা, রবীন্দ্রসংগীতেরও কোন চল ছিল না। সেই প্রতিকূল পরিবেশেও ক্রমশ তিনি কয়েকটি বালিকাকে নাচ শেখাতে শুরু করলেন। ঢাকায় কোন কোন কাগজে ছাপা হল—"রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যা, ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা, দেওয়ান সারদাপ্রসাদ সেনের পুত্রবধূ সারা ঢাকা শহরকে নাচাইয়া তুলিয়াছেন।"[১৬] সেই মেয়েদের নিয়ে যখন অমিতা বসন্তোৎসব করলেন, তাদের অপূর্ব শালীন সাজসজ্জা, সুন্দর নৃত্যভঙ্গি দর্শকদের মন ভরিয়ে দিল। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি বদলাতে লাগল। বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে অনুষ্ঠান করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডাক পেলেন নৃত্যানুষ্ঠান করার জন্য। নৃত্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। প্রতিকূল পরিস্থিতি ক্রমশ অনুকূল হতে শুরু করল। আগে যারা তার নাচের তীব্র বিরোধিতা করেছে, তারাই ক্রমশ মেয়েদের হাত ধরে অমিতা সেনের বাড়ির দরজায় উপস্থিত হতে লাগল। অমিতা সেনের কথায়, "এইভাবেই আশ্রম কন্যা লতিকা, হাসু, মমতা, মৃণালিনী, সেবা শান্তিনিকেতনের নৃত্যের ধারাটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে এবং যার যার স্থানে সেই ধারা উজ্জ্বল গতিতে বইয়ে দিয়েছে।"[১৭]

বিশ শতকের প্রথম দিকে মেয়েদের নাচ, গান, অভিনয় শেখানো এবং ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নাচ বা অভিনয় করানোর ফলে রবীন্দ্রনাথকেও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতীতের ভারতীয় নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি আশ্রম

"আশ্রম বালিকাদের নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি। সেদিন সে কাজ কত কঠিন ছিল আজ নৃত্যের প্লাবনে তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কঠিন বাধা, তীব্র নিন্দা সব কিছু অগ্রাহ্য করে তিনি নানা দেশের মেয়েদের পারদর্শী করে তুললেন। অসম্মানে অবহেলিত নৃত্যকলাকে তিনিই আবার শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন।"

অমিতা সেন, শান্তিনিকেতন আশ্রম কন্যা, পৃঃ ৮২।

বালিকাদের নাচ শেখানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেকাজ করা সেদিন কঠিন ছিল। সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে, সমস্ত নিন্দা, প্রতিকূলতার বাধা ঠেলে তিনি মেয়েদের নাচে, গানে, অভিনয়ে পারদর্শী করে তুললেন। মেয়েদের জন্য গান-নাচ-অভিনয়ের নিষিদ্ধ জগতটি উন্মোচিত হল, কিন্তু সে যুগে ভদ্রঘরের মেয়েদের মঞ্চে অভিনয় করাই ছিল অতি

দুঃসাহসিক কাজ। প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে হয়েছে। 'শাপমোচন' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অমিতা সেনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। শাপমোচনে

শান্তিদেব ঘোষ এবং অমিতা সেনের যুগ্ম নৃত্য প্রসঙ্গে অমিতা সেন বলেছেন একদিনের কথা— "....শান্তিদার সঙ্গে আমি নাচলাম, এবং খুব সম্ভব ঐ রকম তালের নাচটি শান্তিদার প্রথম নাচ, তাই আমি কি সেটা ভুলতে পারি। ঘটনাটা হল—কোণার্কে আমি 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' গানটিতে ঝড়ের নাচ তৈরি করছি প্রতিমা বৌঠানের নির্দেশনায়, পাশে বসে গানটি গাইছেন শান্তিদা। ঝড়ের বেগটি ঠিক তুলতে পারছি না নৃত্যে। তাই শান্তিদা মাঝেমাঝে টিপ্পনি কাটছেন, 'এমন কর, অমন কর।' ঝাঁঝিয়ে বলেছিলাম, 'বসে বসে সবাই বলতে পারে, উঠে এসে নাচ দেখি, তবে বুঝতে পারবো।' তখনো শান্তিদাকে ঝাঁঝিয়ে কথা বলার সাহস ছিল। শান্তিদা কি দমবার পাত্র, বললেন 'আমি নাচলে তোমার থেকে অনেক ভাল নাচতে পারি।' প্রতিমা বৌঠানের মন সম্ভাবনার আনন্দে নেচে উঠল। বললেন, 'খুব সুন্দর হবে শান্তি, যদি তুই অমিতার সঙ্গে একসঙ্গে নাচিস।" খুবই সুন্দর হয়েছিল আমাদের দুজনের একসঙ্গে নাচ।"
অমিতা সেন, আনন্দ সর্বকাজে, পৃঃ ১১১।

রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন আঠার বছরের অমিতা সেন। তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষিনীরা নাটকে রাজা ও রানীর প্রেমের অভিনয় দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। সেটা এতই অধিক মাত্রায় হয়েছিল যে তাঁদের আবেদনে 'এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো আমার যে আছ অন্তরে-' এই গানের শেষ লাইনের একটি শব্দ বদলে দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। সেখানে ছিল 'এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো 'বুকের' পরে' --বদলে দিয়ে প্রাণের পরে করেছিলেন কবি কিছুটা বাধ্য হয়ে। ঘরে-বাইরের এই বাধা অতিক্রম করেই রবীন্দ্রনাথকে এগোতে হয়েছিল, তবু কোন বাধাই তাঁকে থামিয়ে দিতে পারেনি। সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বাধার একই ধরনের ছবি পাই সুকৃতি চক্রবর্তীর লেখাতেও—শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সুকৃতি বলেছেন, সে সমাজ মেয়েদের নাচ শেখা এবং নাচে অংশগ্রহণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। পুরনো পত্রপত্রিকা শান্তিনিকেতনের দলের প্রশংসা করেও মন্তব্য করত—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। শোনা যায় তিনি বিশ্বভারতীতে নারীর নৃত্যের ক্লাস খুলিয়াছেন। তিনি সরল চিত্ত সংসারানভিজ্ঞা বালিকাগণকে একি শিক্ষা দিতেছেন।"[১৮] এমনকি শান্তিনিকেতনের সমস্ত শিক্ষকরাও মেয়েদের নাচগান শেখা বা স্টেজে নাচা পছন্দ করতেন না। তাছাড়া এর জন্য লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলেও তাদের মনে হত। সুকৃতি চক্রবর্তী বলেছেন, 'শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে তো বটেই এমনকি তাঁর সময়ে অর্থাৎ ত্রিশের দশকেও কোন কোন শিক্ষকের 'প্রচ্ছন্ন বিরূপতা' মাঝে মাঝে তিনি অনুভব করতেন। তবে 'এই বিরূপতা যে প্রচলিত সংস্কার থেকে এবং তাও ক্রমক্ষীয়মান'[১৯] সেটা বুঝতে পারতেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ছিল উনিশ শতকের নবযুগের নব্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলায় তিনি দেখেছেন পারিবারিক নৃত্য, গীত, অভিনয়ের অনুষ্ঠান। তিনিও অংশগ্রহণ করেছেন, মেজদাদার আগ্রহে গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন গানে অভিনয় করেছেন। সেখানে পরিবারের মেয়ে পুরুষরা একসঙ্গে অভিনয় করতেন, দর্শক হতেন

আত্মীয়স্বজন ও নিকট বন্ধুরা। সেই পারিবারিক অভিনয়, বড় দাদাদের গানের প্রতি আগ্রহ, সঙ্গীত চর্চা, সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পারিবারিক অভিনয় প্রচেষ্টার উত্তরাধিকার অনুপ্রাণিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শুরু করেছিলেন নাচ-গানের চর্চা। তাঁরই রচিত, সুর দেওয়া গান তিনি তুলিয়ে দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের গলায়। তাঁরই গান কবিতায় সুপরিকল্পিত ভাবনৃত্যে রূপ দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকে তাঁরই নির্দেশনায় অভিনয় করেছে আশ্রমবাসী। প্রথমে হত ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক অভিনয়। অমিতা সেনের স্মৃতিচারণে—"১৯১০ সালে যখন প্রথম শুধু মেয়েরা মিলে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় করল, তখন ব্যবস্থা হল উল্টে, মেয়েরা যথারীতি মঞ্চে অভিনয় করল, পুরুষেরা অভিনয় দেখলেন চিকের আড়ালে বসে।"[২০] মেয়েদেরই দাবিতে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে ক্রমশ ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে নাচ, গান, অভিনয়ের চর্চা করেছে, স্টেজে নেমেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে উঠে অভিনয় করতেন এবং করে গেছেন যতদিন তাঁর শারীরিক শক্তি ছিল। উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ

> *"১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষে কলিকাতায় 'রাজা' অভিনয় হয়। ৭৪ বৎসর বয়সেও তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ঠাকুরদাদা রূপে, আড়াল হইতে রাজার ভূমিকাও অভিনয় করিলেন। ইহার পর তিনি বোধহয় আর অভিনয় করেন নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে যখন চিত্রাঙ্গদা অভিনীত হইল তখন তিনি স্টেজে আসিয়াছিলেন বটে, তবে অভিনয়ে কোনো অংশগ্রহণ করেন নাই।"*
>
> *সীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি, পৃঃ ২২১।*

কখনও বিলাসিতা বলে মনে করেননি। দৈনন্দিন জীবনচর্যার বহির্ভূত অতিরিক্ত বলে ভাবেননি। তাঁর ভাবনায় উৎসব জীবন যাত্রারই অঙ্গ। তাই প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে

> *'১৯৩৬ সালে কলকাতায় নিউ এম্পায়ার হলে মার্চ মাসে চিত্রাঙ্গদা মঞ্চস্থ হয়েছিল। তারপর সেই নামেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে যেমন পাটনা, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লী, মীরাটে অভিনয় হয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে অভিনয় হয়েছিল শীতকালে, যতদূর মনে পড়ছে তিন দিন ধরে। সঠিক দিনক্ষণ মনে না থাকলেও এটা মনে আছে যে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে পরিশোধ, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, পরিশোধের মার্জিত রূপ শ্যামা এবং শাপমোচনের অভিনয় হয়েছিল কলকাতাতে নিউ এম্পায়ারে, আশুতোষ হলে, শ্রী ও ছায়া মঞ্চে। আর সেই সময়ে সদলবলে এইসব অভিনয় মঞ্চস্থ করা হয়েছিল বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, আসানসোল, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেট, শিলং, ময়নমনসিংহ শহরে এবং এইসব দলে ছিলেন শান্তিদা, নীলেশ্বর মুখার্জী, গোবর্ধন পাঞ্চাল, শিশির ঘোষ, বালগঙ্গাধর, সন্তোষ ভঞ্জ, শিব কুমার দত্ত, নীরেন ঘোষ, বিশুদা, যমুনাদি নিবেদিতাদি, দীপ্তি, বনলীলা, ইন্দুদি, মনিকাদি, অমলাদি, মমতা আর আমি।"*
>
> *সুকৃতি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।*

সঙ্গে এবং অন্যান্য নানা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা মেতে উঠেছে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজনে। এই নাচ-গান-অভিনয়ের অনুষ্ঠান শুধু শান্তিনিকেতনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসে তিনি জোড়াসাঁকোয় এবং কলকাতায়

বিভিন্ন হলেও অনুষ্ঠান করেছেন। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য, এবং আশ্রম বিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে এসেছেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এই প্রসঙ্গে সুকৃতি চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবন থেকে প্রথম নাচের জন্য ডিপ্লোমা পাওয়া দুজনের মধ্যে অন্যতম বলেছেন, "…..বিভিন্ন সময়ে সারা ভারতবর্ষে এই যে নৃত্যনাটের দল নিয়ে পরিভ্রমণ করা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীতে জানিয়েছেন যে, বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল আংশিকভাবে পূর্ণ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচারও সেই সময়ের উদ্দেশ্য ছিল।"

সুকৃতি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

স্মৃতিচারণে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক ভ্রমণের ছবিটি উঠে এসেছে। "গুরুদেবের সঙ্গেও বাইরে গেছি আমরা। গুরুদেব তো মাঝে মধ্যে নাচগানের দল নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। তখন জানতাম না, পরে জেনেছি শান্তিনিকেতনের জন্য টাকাপত্র জোগাড় করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে নাচগানের দল নিয়ে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে। সেবার যাওয়া হল বম্বেতে। সেই দলে সবচেয়ে ছোট ছিলাম আমি। গুরুদেব উঠেছিলেন সরোজিনী নাইডুর বাড়ি।"[২১]

পারিবারিক উত্তরাধিকার তিনি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশ শতকের বাংলাদেশের রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে মেয়েদের জন্য নৃত্য সঙ্গীতের নিষিদ্ধ জগতের দরজাটা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনের আশ্রম বালক-বালিকাদের মধ্যে দিয়ে। বাংলাদেশের শিক্ষিত আধুনিক সমাজেও নাচ-গানের চর্চাও ক্রমশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং তাঁর সর্বাঙ্গীন শিক্ষা ভাবনা এইভাবেই বাঙালি মেয়েদের জগৎটাকে বদলে দিয়েছে, প্রসারিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নারী শিক্ষার ঐতিহ্য—মেয়েদের লেখাপড়া ছাড়াও নানা ধরনের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা শান্তিনিকেতনের সীমিত গণ্ডী পেরিয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করল সমগ্র বাংলায় এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে। সে সময় দেখা গেল মেয়েরা সামাজিক অনুশাসনের বাধা ভেঙে নাচ, গান শিখতে লাগল এবং প্রকাশ্য মঞ্চে সর্বসাধারণের সামনেও আসতে লাগল। অমিতা সেন সমকালের নৃত্যশিল্পী রেবা রায়ের কথা বলেছেন। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মত রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ ছত্রছায়া তিনি পাননি। অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করে, প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি মঞ্চে নেচেছেন। অন্য মেয়েদেরও নিয়ে এসেছেন নৃত্য জগতে। অমিতা সেনের কথায়, 'সে কালের নৃত্যের কথায় কলকাতায় শ্রীমতী রেবা রায়ের কথা না লিখলে নৃত্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ হবে না। তাঁর নাচ প্রথম আমরা দিনদারই সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। যে সময় থেকে কলকাতায় মঞ্চে শান্তিনিকেতন দলের নাচ শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকেই আমাদের বন্ধু গীতা রায়ের দিদি রেবা রায়ের নৃত্যের কথা আমরা শুনতাম। আমাদের নৃত্যের পিছনে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাই বিরূপ সমালোচনা ঝড় ঝাপটা সব তাঁর উপর দিয়েই যেত। কিন্তু রেবা

রায় তাঁর বাবা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সমাজের বিরূপ মন্তব্যের সব সহ্য করে নানা জায়গায় নানা উপলক্ষে স্বতস্ফূর্ত আনন্দে সেদিন নাচতেন। আমন্ত্রিত হয়ে রেবা রায়ের নাচ দেখতে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের হলঘরে দর্শকদের প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। মঞ্চে নিজেরা নেচেছি, কিন্তু দর্শকদের আসনে বসে নাচ দেখা সেই আমাদের প্রথম। যবনিকা উঠে গেল, বাজনার সঙ্গে শুরু হল গান। সুসজ্জিত তন্বী একটি মেয়ে হরিণীর মত চঞ্চল পদক্ষেপে সুললিত নৃত্যভঙ্গীতে মঞ্চে প্রবেশ করল।"[২২] রেবা রায় নিজেও বলেছেন, তাঁর বন্ধু মহলেও তাঁকে নিয়ে তর্কবিতর্ক হত। বন্ধুরা তাঁকে বলতেন, তিনি কখনও পাবলিক স্টেজে নাচতে পারবেন না। নিন্দের ভয় দেখাতেন, বলতেন 'ত্যাজ্যপুত্রী' হতে হবে জনসমক্ষে, নাচলে, বাজি রাখতেন, বলতেন ভয়ে তিনি সে কাজ করতে পারবেন না। রেবা রায় তখন বন্ধুদের বলতেন,—"দোষ কি? কোন অন্যায় কাজ তো করবো না। ভাল কীর্তন শুনে শুনে কেঁদে

অমিতা সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রেবা রায় বলেছেন, "কলকাতার সব মঞ্চেই আমি নেচেছি এবং অন্য মেয়েদেরও নাচিয়েছি। প্রতিকূল সমালোচনা ভাগ্যে অনেক জুটেছে আবার গুণীদের সমাদরও পেতে কসুর হয়নি কোনো।......আমাদের কালে মেয়েদের শত বাধা ছিল এখনকার তুলনায়, তাই নয় কি? জীবনে প্রথম Cinema দেখি Matric পাশের পর। নাচ তো শিখিনি বোন। তবে রবীন্দ্রনাথের গান আমায় স্থির থাকতে দেয়নি এবং মা বাবারা উদারপন্থী ছিলেন। তাই বোধ হয় সব বাঁধ ভেঙ্গে মনের সুর ছন্দ ভাবগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে প্রাণে প্রচুর সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম।"

উৎস: অমিতা সেন, 'আনন্দ সর্বকাজে', পৃঃ ১৩০।

আকুল হয়ে যাস, আর আমি তো রবীন্দ্রনাথের গানগুলোকে প্রাণের মধ্যে নিবিড়ভাবে ধরতে চেষ্টা করি। কী অদ্ভুত ভাব, সেই ভাব যদি আমার দেহ বেয়ে নৃত্যে প্রস্ফুটিত হয়, তবে কিছুতেই তার মধ্যে কুৎসিত কিছু থাকতে পারে না।"[২৩] প্রথম যেদিন স্টেজে গান করতে করতে হঠাতই নাচলেন, এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন—"বাইরের লোক ছুটে আসছে, কেউ বলছে অপূর্ব, কেউ বলছে ছিঃ ছিঃ, সমাজের নাম ডোবালে।"[২৪] বাবা আশীর্বাদ করেছিলেন, খুশী হয়েছিলেন মা, জেঠিমা সকলে। তখনকার দিনে সমাজের নিন্দা, সমালোচনার ঝড়কে অস্বীকার করে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে প্রথা ভেঙে নৃত্য চর্চা, 'পাবলিক স্টেজে' নাচা একটি অল্প বয়স্ক বাঙালি মেয়ের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। বাবা-মার উদার মানসিকতা, অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ এবং রবীন্দ্র ভাবনার সাহচর্যে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে রেবা রায় নৃত্যজগতে প্রায় কিংবদন্তী হয়ে উঠেছিলেন।

রবীন্দ্রভাবনার সাহচর্যের কথা বারবারই উল্লেখ করেছেন তাঁর স্নেহধন্যারা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এক কালবৈশাখীর বিকেলে রবীন্দ্রনাথ একটি গান শুনে বলেছিলেন মাঝে মাঝে শুনিয়ে আসতে। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের সেই সান্নিধ্য, গান শুনতে চাওয়া বালিকাটিকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিল। তাঁর কথায়, 'কালবৈশাখীর বিকেলের এই একটুকরো ঘটনায় যেন অনেকখানি পাল্টে গেলাম আমি।"[২৫] তারপর থেকে মাঝে মাঝেই নতুন লেখা গান শেখার জন্য ডাক পড়ত তার। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য পাননি সুচিত্রা মিত্র, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের আকর্ষণেই তিনি গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। যাবার কিছুদিন আগেই

মারা যান রবীন্দ্রনাথ। অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন যাবেন না আর শান্তিনিকেতনে। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুদিন পর, ১৯৪১-এ কলাভবনের স্কলারশিপ পেয়ে শান্তিনিকেতনে গেলেন সুচিত্রা মিত্র। গিয়েছিলেন গান শিখতে কিন্তু তাঁর মতে শুধু গান শেখাই নয়, পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে। প্রায় পাঁচ বছর সেখানে ছিলেন। 'শুধু তো গান শেখা নয়, আনন্দের ধারায় জীবনস্রোত শতধা হয়ে ঝরে পড়ত। দু'হাত ভরে কুড়োতাম আর কুড়োতাম। এই পর্বে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত আমার জীবনে যা রেখে গেল—তাকে কী বলব? অমূল্য রতন, না অরূপরতন? দুই-ই। অমূল্য তো বটেই।"[২৬] রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আজকের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্র বলছেন, রবীন্দ্রনাথের গানই তাঁর জীবনের সম্পদ। জীবনের পথে চলতে চলতে যখন দুঃখ এসেছে, যন্ত্রণা পেয়েছেন গানই তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।—"ছেলে মানুষ করেছি, মেয়েকে মানুষ করেছি, সংসার সামলে গান গেয়েছি। গান গেয়েছি বলেই বোধহয় সংসারের দুঃখ কখনও ভার হয়ে ওঠেনি। গানের দরজাটা খোলাই থেকেছে। সেই দরজা দিয়ে অনন্তের, অসীমের আলো বাতাস ছুঁয়ে গেছে আমাকে।"[২৭] সেই গানই শেষ হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন, জীবিকা এবং আত্মঅন্বেষণের উপায়স্বরূপ।

বিশ শতকে একদিকে ছিল শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক রবীন্দ্র সংস্কৃতির ধারা—শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নাচ-গান-অভিনয়ের চর্চা, ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে মঞ্চে নাচ-গান ও অভিনয়, অনুপ্রাণিত করল শান্তিনিকেতনের বাইরে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সংশ্রবহীন উদারপন্থী পরিবারগুলিকে। মেয়েদের জন্য নাচ-গান অভিনয়ের চর্চা আর নিষিদ্ধ হয়ে রইল না। সে বাধা কাটিয়ে দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এরই পাশাপাশি নৃত্য-সঙ্গীত-অভিনয়ের একটি পেশাদারী ধারাও লক্ষ্য করা যায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে। সেখানেও মেয়েরা এসেছেন। প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করে গিরিশচন্দ্রই পেশাদার মঞ্চে নারীচরিত্রে অভিনয়ের জন্য মেয়েদের নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমে এই মেয়েরা এসেছিল তথাকথিত ভদ্র সমাজের বাইরে থেকে। সোনাগাছি থেকে মহিলা শিল্পীদের নাটকে অভিনয় করতে আসায় সহ অভিনেতা তথাকথিত ভদ্র সমাজের পুরুষরা যেমন নিন্দিত হল, সেই সমস্ত মেয়েরাও নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হলেন তাদের সমাজে. সেই সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা 'মাসি'দের মতে ঐ টাকা আয়ের জন্য থিয়েটারে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের নিজস্ব পেশায় তার থেকে অনেক বেশি টাকা আয় হতে পারবে। সমস্ত নিগ্রহ সহ্য করেও ঐ মেয়েরা থিয়েটারকে ভালবেসেছে, নিজেকে প্রকাশ করতে পারার আগ্রহে থিয়েটারে এসেছে, অভিনয় করেছে। বিনোদিনীর যখন থিয়েটারে একটু নাম হয়েছে বার বার ভেবেছেন অভিনয়েই নিজেকে ডুবিয়ে দেবেন, অভিনয়ের আয়েই পেট চালাবেন আর দেহ বিক্রি করে নিজেকে অপমানিত করবেন না। এইভাবেই দেখা যায় এই সমস্ত মেয়েরা কিভাবে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে তারই মধ্যে। কিছু করতে চাইছে কিন্তু বাধা দিচ্ছে সমাজ। ভদ্রঘরের মেয়েদের জন্য বাইরের এই জগৎ ছিল নিষিদ্ধ আবার যাদের ঘরের সম্মানের

বন্ধন নেই, সেই পথের মেয়েরাও প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না। অবশ্য পথের মেয়েদের জন্য রয়েছে পথের দেবতার ভ্রূকুটি, অর্থাৎ মেয়েরা যে সামাজিক অবস্থানেই থাকুক না কেন সর্ব অবস্থাতেই সহ্য করতে হবে সামাজিক নিষ্পেষণ। সমাজ সর্বকাজে তাকে বাধা দেবে, তার দায়িত্ব কর্তব্য পালনের বাইরে জগতে সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করার অধিকার তাকে দেবে না। তাহলে কাজের জগতে সমাজের অর্ধাংশের এই ভূমিকা পালন করবে কে? সমাজ এগোবে কি করে? এই অর্ধাংশকে পেছনে ফেলে রেখে! তবুও মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতে মেয়েদের এগিয়ে আসা বন্ধ হয়নি। সমাজের ভ্রূকুটি অস্বীকার করে সমস্ত প্রতিকূলতা সহ্য করেও তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

উনিশ শতকে বাংলা নাট্য মঞ্চের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রতিভাশালী অভিনেত্রী বিনোদিনী অভিনয়কে অবলম্বন করেই সুস্থভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন, অভিনয়ের মধ্যেই জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। বিনোদিনীর অনেক পরবর্তীকালে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কানন দেবীকেও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সময়ের বিচারে অনেক পরের হলেও তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রায় একই রকম। শুধুমাত্র মেয়ে হবার জন্যই নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন পুরুষ সহকর্মীদের কাছে। পিতৃহীন, দরিদ্র, অসহায় একটি বালিকা নিতান্তই জীবিকার প্রয়োজনে এসেছিলেন নির্বাক চলচ্চিত্রের জগতে। ম্যাডান থিয়েটারের জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'জয়দেব' ছবিতে রাধা চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের সূচনা। কানন দেবীর নিজের কথায়, "ম্যাডান থিয়েটারের ব্যানারে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত 'জয়দেব' (১৯২৬) চিত্রে রাধার ভূমিকায় আমার শিল্পীজীবন শুরু হল। এখন যত সহজে এ জীবনকে 'শিল্পী জীবন' আখ্যা দিচ্ছি তখন কি তা অজ্ঞাতসারেও ভেবেছিলাম? বোধহয় না। ন-দশ বছরের একটি অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে শিল্পী-শিল্প ইত্যাদি বড় বড় কথা ভাবা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বরং এইটুকুই বলা যায় যে জীবনধারণের প্রয়োজনে অভিভাবকহীন অসহায় এই বালিকা ঐ একটি পথের সন্ধানই পেয়েছিল এবং স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার চরম মুহূর্তে মরিয়া হয়ে খড়কুটোকে অবলম্বন করে বাঁচবার প্রচেষ্টার মত তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেয়েছিল।"[২৮] নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগটিকে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন কানন দেবী,—"আমার মতই চলচ্চিত্রেরও তখন যাকে বলে একেবারে শৈশব অবস্থা। হয়ত আমার চেয়েও আরও শৈশবাবস্থা, কারণ তখনও তার মুখে বুলি ফোটেনি।"[২৯] অভিনয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়লেন বালিকাটি। বাংলা চলচ্চিত্রও ক্রমশ সাবালকত্বে উন্নীত হল। নির্বাক ছবি সবাক হয়ে উঠল। ম্যাডান থিয়েটারের 'জোরবরাত' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে প্রথম সবাক চলচ্চিত্রে (১৯৩১) কানন দেবীর অভিনয়। বিশ শতকের ত্রিশের দশকের সূচনাতেই বাংলা চলচ্চিত্র বাঙ্ময় হল। কিছুদিন পর ১৯৩২-এ 'শ্রী গৌরাঙ্গ' ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় ও গান তাঁকে যথার্থ শিল্পীর 'সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে'। পারিপার্শ্বিক নানারকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কর্মজীবনে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিলেন তিনি। অভূতপূর্ব সাফল্য পেলেন প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত 'মা' ছবিতে। যে সহকর্মীরা নানাভাবে তাঁর অসহায়তা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে, তাদের 'চোখে নেমে এল সম্ভ্রমের ছায়া'। কানন দেবীর কথায়

"জনপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দামও যেন সবার কাছে বেড়ে গেল। আগে যারা 'দূর ছাই' করতেন এখন তাদের ব্যবহারে যেন সমীহের ছোঁয়া লাগল—আমায় মানুষ বলে যাঁরা গণ্যই করতেন না তাঁরা এখন একটু বেশী মাত্রায় আদর আপ্যায়ন শুরু করলেন।"[৩০] ক্রমশ কানন দেবী হয়ে উঠলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের 'মুকুটমণি', 'অভিনয় সংগীতে অনন্যা'। অভিনয় করতে করতেই স্বপ্ন দেখতেন ছবি তৈরির। যেখানে ইউনিটের কলাকুশলী, শিল্পী, সুরকার প্রত্যেকের পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ থাকবে, থাকবে অবাধ স্বাধীনতা। স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হল 'শ্রীমতী পিকচার্সের' মাধ্যমে। কানন দেবীর কথায়, "অজয় কর (ক্যামেরা ম্যান), বিনয় চ্যাটার্জী (সিনারিও রাইটার) আর আমাকে নিয়ে আমাদের সম্মিলিত ইউনিটের নাম হোলো 'সব্যসাচী' ইউনিট।"[৩১] ১৯৪৯-এ মার্চ মাসে মুক্তি পেল কানন দেবী প্রযোজিত এবং অভিনীত শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম ছবি 'অনন্যা'। দুঃস্থ মহিলা শিল্পীদের সাহায্যে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'মহিলা শিল্পী মহল'। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল অবসর সময়ে নাটক মঞ্চস্থ করে, সেই অর্থে 'শিল্পী বোনেদের দুর্দিনের আশ্রয় সংস্থান।'[৩২] মহিলা শিল্পী মহলের প্রথম নাটকে আশাতিরিক্ত টাকা উঠেছিল। ক্রমশ তাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত নাটকে সংগৃহীত অর্থে তারা একটি বাড়ি কিনেছিল। মহিলা শিল্পীদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল সমাজের সর্বস্তরে। কানন দেবী বলেছেন, 'সাংবাদিক মহল, শিল্পী মহল এবং সাহিত্যিক মহলেরও অনেকের পদধূলি পড়েছিলো আমাদের মহিলা শিল্পী মহলের গৃহপ্রবেশের পুণ্য উৎসবে। সকলের মুখে ঐ একই কথা 'আপনারা ত পুরুষদেরও লজ্জা দিলেন। সারা বাংলাদেশে এত কর্মকেন্দ্র কিন্তু শুধুমাত্র নাটক মঞ্চস্থ করার অর্থ দিয়ে বাড়ি করতে কাউকে দেখিনি।' পরের দিন প্রায় সব কাগজেরই ছিল ঐ একই বক্তব্য ঃ 'First of its kind in India'—একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন তাঁরা।'[৩৩]

কানন দেবীরই সমকালে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের বিখ্যাত অভিনেত্রী সরযূবালার কথা উল্লেখ করা যায়। শিল্প, সঙ্গীত চর্চার আগ্রহে বা অভিনয়কে ভালবেসে তিনি এই জগতে এসে পৌছাননি। প্রথম আবির্ভাব নেহাতই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কিন্তু ক্রমশ অভিনয়কে ভালবেসেছেন—ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং আগ্রহে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মানও লাভ করেছেন। অভিনয়ই জীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছে—নিজেকে জানতে, বুঝতে, অনুভব করতে শিখিয়েছে। সরযূবালা বলেছেন, 'নাটকের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল বেঁচে থাকার তাগিদে। অবশ্য মনের মধ্যে একটু একটু করে ভালোবাসাও জন্ম নিয়েছিল। তাই নাটক বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে কখনও ভাবতে পারি নি।'[৩৪] সেকালের যশস্বী অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সংস্পর্শ সরযূবালার জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাঁরই নির্দেশনায় 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে একই সঙ্গে তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। নিজের অস্তিত্ব ভুলে চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাবার বিস্ময়কর ক্ষমতাই এনে দিয়েছিল এই সাফল্য। নাট্যনিকেতনে 'চিরকুমার সভা'য় সরযূবালার অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অসাধারণ অভিনয় গুণে পেয়েছিলেন নাট্য সম্রাজ্ঞীর সম্মান। অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই জেগে উঠেছিল স্বদেশী বোধ, রাজনৈতিক চেতনা। স্বদেশী যুগে

'কারাগার' নাটক করতে গিয়ে সেই স্বদেশী চেতনার ঢেউ এসে লেগেছিল তাঁর মনেও। চরকা কাটতেন, খদ্দর পরতেন—দেশাত্মবোধক নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে এক নতুন চেতনা, নব জীবনবোধের জন্ম হয়েছিল। মনে হত এই সমস্ত দেশাত্মবোধক নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই যেন তিনি তাঁর দেশ সেবার কর্তব্য পালন করছেন। কানন দেবী,

"দেশাত্মবোধক নাটক করতে রোমাঞ্চ অনুভব করতুম। তখন শচীন সেনগুপ্তের গৈরিক পতাকা, সিরাজদৌল্লা, মন্মথ রায়ের কারাগার দেখতে লোক ছুটছে। 'কারাগার' কংসকে বধ করা নিয়ে নাটক হলেও, আসলে তার মধ্যে রয়েছে দেশাত্মবোধক চিন্তা। এ যেন ব্রিটিশকে নিয়ে লেখা নাটক। আমরা ঐ সব নাটক করে আমাদের কর্তব্য করতুম।"

সরযূ বালা দেবী, 'আমার ছেলেবেলা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২/১২/৮৫, পৃঃ ৩।

সরযূবালার মত এসেছিলেন আরো অনেকে। জন্ম-পরিচয় হয়ত সব সময় তেমন সম্মানজনক ছিল না, শিক্ষিত-সচ্ছল পরিবার থেকেও তাঁরা আসেনি, কিন্তু অভিনয় তাদের দিয়েছিল সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার।

সমাজের পতিত নারীই নয়, ক্রমশ তথাকথিত ভদ্র ঘরের শিক্ষিত মেয়েরাও এগিয়ে আসতে লাগল মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য। তবে তাদের তখন অনেকেরই থিয়েটারে আসা, তৃপ্তি মিত্রের কথায়, 'দেশের জন্য কোন একটা কাজ করছি এই অনুভূতি থেকে। থিয়েটারের জন্য মোটেই নয়।'[৩৫] তাঁরা এসেছিল কিছু করার তাগিদে, দেশের কাজের তাগিদে। ত্রিশের দশক থেকেই কমিউনিস্ট ভাবধারা বাংলায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করছিল, প্রসার ঘটাচ্ছিল মুক্ত চিন্তা ভাবনার—প্রগতি আন্দোলন ভাবনার জায়গাটাকে ক্রমশ বদলে দিচ্ছিল। প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তাহারে বলা হয়েছিল—"যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মন্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে তাকেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলে গ্রহণ করবো।"[৩৬] কমিউনিস্ট পার্টি সেই সময় দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের দায়ও গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে, কমিউনিস্ট পার্টির প্ল্যাটফর্মে গড়ে ওঠা প্রগতি আন্দোলনও বাধাপ্রাপ্ত হল। প্রয়োজন হল একটি আপাত অ-রাজনৈতিক সংগঠনের। 'এবস্টিন' এর 'পিপল্স ওয়ার'-এর 'মাস সিঙ্গিং মুভমেন্ট' অনুপ্রাণিত করল কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রগতিশীল তরুণ-তরুণীদের। গড়ে উঠল 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' ১৯৩৯-এ, 'সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে গণচেতনা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে।'[৩৭] প্রথমে তারা একটি গানের স্কোয়াড তৈরি করল। তার মুখ্য পরিচালক ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন অনু গুপ্ত, উমা চক্রবর্তী, চিত্রা মজুমদার, রমা গোস্বামী, অঞ্জলি মজুমদার এবং অন্যান্যরা। তাঁরা কয়েকটা নাটকও করেন। সেই নাটকে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও অভিনয় করত। প্রথম দিকে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নাটক করার কিছু সমস্যা ছিল, ছিল সামাজিক বাধা, সংস্কারের বাধা। ফলে দৃশ্যগুলি এমনভাবে তৈরি করা হত, যাতে যে দৃশ্যে ছেলেরা থাকবে,

সেখানে মেয়েরা থাকবে না। 'অঞ্জনগড়' নাটকে হাসপাতালের দৃশ্যে দুজন নার্স স্টেজে ছিল, কিন্তু রোগীর বদলে বিছানা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা থাকল। ক্রমশ এই সমস্ত বাধা কাটিয়ে উঠে ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে অভিনয় করেছে, গান গেয়েছে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

প্রগতি আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় অনুরাধা রায় বলেছেন—"১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বাম মনস্ক ছাত্রছাত্রী মিলে তৈরী করে Youth Cultural Institute। বালিগঞ্জ প্লেসে টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন অর্পিতা দাসের বাড়ির ছাদে এদের রিহার্সালের আসর বসত। দ্বিজেন চৌধুরী, নিখিল চক্রবর্তী, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে এখানে জড়ো হতেন উমা চক্রবর্তী, বিনতা বোস, নিবেদিতা বোস, সাধনা বোস প্রমুখ। পুরুষদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করার সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই ছিল। সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের শিকার গরিবী প্রজাদের নিয়ে লেখা সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে ছিল—'YCI'। নাম হলো তার 'অঞ্জনগড়'। মেয়েরা সেখানে অভিনয় করতে যদি বা রাজী হলো, ছেলেরা যে দৃশ্যে থাকবে সে দৃশ্যে তাদের মঞ্চে ওঠানো যাবে না। অতএব হাসপাতালের দৃশ্যে দুজন নার্সই শুধু স্টেজে রইল, বিছানা রোগীর বদলে শুধু সাদা চাদরে ঢাকা থাকল। এসব সংস্কার অবশ্য দ্রুত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।"

অনুরাধা রায়, প্রগতি আন্দোলনে মেয়েরা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।

অনুষ্ঠান করেছে। রীণা ভাদুড়ির লেখায় ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটি পাওয়া যায়—"১৯৩৯ থেকে শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহাতাণ্ডব।..........এ সময় দল যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ঘোষণা করে বিরোধিতার সপক্ষে প্রচার অভিযানে নামে। ফলে ব্রিটিশ রাজের নির্মম দমননীতি নেমে আসে পার্টির ওপর। অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে বন্দী, বহিষ্কৃত ও অন্তরীণ করা হয়। এই দুঃসময়ে অগ্রণী পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল ; প্রগতি লেখক সংঘের কর্মকাণ্ডও স্তব্ধ হয়ে গেল। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই সংকট ও শূন্যতা পূর্ণ করতে তখন সাহস করে এগিয়ে এসেছিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে একদল সংস্কৃতিচেতন, উজ্জ্বল প্রতিভাবান ছাত্র সংগঠক। এঁরা বিভিন্ন উপায়ে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির পরোক্ষ নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয়তায় গড়ে ওঠে Youth Cultural Institute নামে একটি আলাদা সংগঠন। সম্পাদক হন জলি কাউল। সভাপতি হাসান সোরাবর্দ্দি, নিয়মিত আলোচনা, বিতর্ক সভা, নাট্যাভিনয়, পোস্টার প্রদর্শনী, গানের আসর ইত্যাদির মাধ্যমে সাম্যবাদী কাজকর্ম বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে YCI। পরবর্তীকালে বাংলায় সংস্কৃতি জীবনে প্রগতিমুখী ভাবধারা সঞ্চারে গণনাট্য সংঘ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়, YCI-র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেই উদ্যোগ নিহিত ছিল।"[৩৮] ১৯৪১-এ কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘের পূর্বসূরী রূপে কমিউনিস্ট প্রভাবিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে YCI-র গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিকফ্রন্টই ছিল গণনাট্য সঙ্ঘ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘ গড়ে ওঠার কথা পাই শোভা সেনের স্মৃতিকথায়—"১৯৪২ সালে ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী

সংঘের নাট্য বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল গণনাট্য সংঘ। গণনাট্য সংঘের উৎপত্তি হচ্ছে জাতীয় সংগ্রামের ফল। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিই এগিয়ে এসেছিল পথপ্রদর্শক হিসেবে। পার্টির ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ছিল গণনাট্য সংঘ। তাই সাম্যবাদে বিশ্বাসী বা বিশ্বাসী নয় এমন বহু শিল্পী অনেকেই এই প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হয়েছিলেন। শুধু মানবতার আহ্বানেও এসেছিলেন একদল শিল্পী। গণনাট্য সংঘ তাই কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট শিল্পী নিয়ে গড়ে উঠেছিল গণদেবতার সেবার ভিত্তিতে। সারা দেশে তারা এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল যা জনসাধারণের, যা জনসাধারণের সৃষ্টি, যা জনসাধারণের জন্য। কিছু শিল্পী এসেছিলেন হুজুগে মেতে, তবে এই গণনাট্য আন্দোলনের জোয়ারে শেষ পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগই দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেশের লাভই হয়েছিল তাতে। সেদিনের সে ডাকে আমিও না সাড়া দিয়ে পারিনি।"[৩৯]

গণনাট্য আন্দোলনে অনেক মেয়েরাই যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নতুন কিছু করার তাগিদে, দু-চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন নাটকে, সিনেমায়—সেটা তাদের কাছে ছিল দেশের কাজ করারই সামিল। একদল আদর্শবাদী পাগল ছেলেমেয়ে কিভাবে সিনেমা জগতে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে শোভা সেনের কথায় তারই পরিচয় পাই—"........মনে পড়ছিল সেইসব দিনের কথা যখন ঋত্বিক প্রায় রোজই আমাদের গোয়াবাগানের বাড়িতে আসত। তরতাজা টগবগে ছেলে। সারাদিন ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা। কত ছবির পরিকল্পনা। ওর তখন স্বপ্ন, আমরা সংস্কৃতির জগতে এমন কিছু দিয়ে যাব যা ভবিষ্যতে বিপ্লবে সাহায্য করবে।.........আমরা কত কষ্ট করে একসঙ্গে 'নাগরিক' ছবি করেছিলাম। তার সেই উদ্দীপনা আমাদের মধ্যে ঋত্বিকই জাগিয়ে তুলেছিল। ও বলত, একবার সুযোগ পেলে ও দেখিয়ে দেবে ভালো ছবি কাকে বলে। বস্তাপচা গতানুগতিক ছবির মোড় ঘোরাতে চেয়েছিল ঋত্বিক।"[৪০]

কমিউনিস্ট ভাবধারা গ্রহণের মাধ্যমেও তারা মূলত শোষণমুক্ত এক আদর্শ সমাজেরই স্বপ্ন দেখেছিল। সে যুগে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা সুস্থ সংস্কৃতি শিল্প গড়ে তোলার জন্য লড়াই করেছিল, তবে সে লড়াই শুধুই শিল্প সংস্কৃতির কারণেই নয়, মূলত 'Struggle for existence' অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াই। তাদের আদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এত বেশি

একই মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় সুচিত্রা মিত্রের স্মৃতিকথাতেও, "শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে আই. পি. টি. এ-র সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া যদি, বলে, তবে সেটা তখনই। কিন্তু রাজনীতি করেছি, এ দাবি আমি কখনও করি না। গণনাট্য সঙ্ঘের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। কলেজ থাকতে গেট মিটিং করেছি। বক্তৃতা দিয়েছি। ঘাড়ে ঝাণ্ডা নিয়ে হেঁটেছি পথে পথে। একটা বিশ্বাস, একটা আদর্শের জন্য সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলাম।"

সুচিত্রা মিত্র, 'মনে রেখো', পৃঃ ৪২।

সত্য ছিল তাদের কাছে যে সেটা ছিল তাদের জীবনেরই নামান্তর। তাদের লড়াই ছিল আদর্শকে জীবনে সত্য করে তোলার, আদর্শের সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে দেবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। তৃপ্তি মিত্রের কথায়", '৪২-এর আন্দোলন শেষ হয়েছে। নেতারা সব

জেলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের আঁচে লক্ষ লক্ষ বাংলার চাষী ঘরছাড়া। সমস্ত দেশ যেন উদ্ভ্রান্ত (অবশ্য এখনকার চেয়ে বেশি কি?) যে আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছি তাতে দেশের জন্য একটা কিছু কাজ আমাকে করতেই হবে, কিশোর মনের এ অস্থিরতা আমাকেও পেয়ে বসেছিল।"[৪১]

মানবতার আহ্বানে কমিউনিস্ট অ-কমিউনিস্ট বহু শিল্পী এসে যোগ দিয়েছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘে। সারা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের সৃষ্ট এক সংস্কৃতি তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন। তাদের সেই প্রাণের আবেগের জোয়ার অস্বীকার করতে পারেনি দেশের ছেলেমেয়েরা। তখন সংস্কৃতির জগতে নতুন ভাবনার সঞ্চার করেছিল গণনাট্য সংসঙ্ঘের শিল্পীরাই। নতুন জীবনবোধ, শিল্পের সঙ্গে জীবন যোগ করা—নিজেদের বিশ্বাস, অনুভূতি, উপলব্ধি মিলেমিশে গিয়েছিল শিল্পসৃষ্টিতে, সৃষ্টি ভাবনায়। গণনাট্য শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, অঞ্জলি লাহিড়ী বলেছেন, "তখন গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ্য ব্যক্তিরাই এসে সমবেত হয়েছিলেন। শুধু চর্বিত চর্বন নয়—নিত্য নতুন সৃষ্টি হচ্ছে। খাসিয়া, মনিপুরী, অসমিয়া চা মজদুর সকল জাতির সকল ভাষার সুরের মাধুরী হেমাঙ্গদাকে আপ্লুত করে রেখেছে। পাকা ব্যাপারীর মত সেই সব সুর যাচাই করে তাঁর সেই রস আহরণ করতেন হেমাঙ্গদা—তারপর নিজের কথার ছন্দে সেই গানের সুর সংযোজন করতেন। খালেদ, হেমন্ত দাস আঁকতেন ছবি জীবনের নানা সব সমস্যা নিয়ে। নিত্য সৃজনশীলতায় গণনাট্য সঙ্ঘ তখন রীতিমত ঠাঁই করে নিয়েছে।"[৪২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারই ফলশ্রুতি মানুষের সৃষ্ট ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মানুষকে বদলে দিচ্ছিল। মানুষকে করে তুলেছিল অমানুষ, মানুষ হারিয়ে ফেলেছিল তার মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব। রিলিফ কিচেনে এসে ক্ষুধার্ত মা ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করে নিজেই সমস্ত খাবার খেয়ে নিচ্ছে। এই ক্ষুধার্ত, উদ্বাস্তু মানুষগুলির সাহায্যে, তাদের খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত ছিল এই

"দুর্ভিক্ষ। ১৩৫০-এর সেই দুর্ভিক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে পশ্চাৎপট করে সেই একটা দুর্ভিক্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত টলিয়ে নড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল। কত পুরনো নিয়ম বদলে গেল, মূল্যবোধ বদলে গেল। নতুন একটা নাম শুনলাম—'কালোবাজার'।

'কালোবাজার'। আর এরই ফলে কত শত লোক নিঃস্ব হল। আবার কত লোক নিঃস্ব থেকে বড়লোক হয়ে গেল। হল দুর্ভিক্ষ। আর সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের দুর্ভিক্ষকে পশ্চাৎপট করেই আমাদের থিয়েটারেও মোড় ঘুরল।

মোড় ঘুরল দুরকমভাবে। (এক) দুর্ভিক্ষকে পটভূমি করে নাটক লেখা হল, (দুই) দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করবার জন্য নাটক করে টাকা তোলবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই দেখা গেল আমার মত একজন, যার নাটক দেখা ছাড়া (সেও বা কটা?) নাটক সম্পর্কে আর কোন আগ্রহই ছিল না। সেও একদিন নানা জায়গায় নাটক করে বেড়াচ্ছে।"

তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

সমস্ত ছেলেমেয়েরা। তারা চোখের সামনে দেখেছিল দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক ফলাফল, মানুষের মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলা। তৃপ্তি মিত্র, তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন যে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হয়ে থেকেই রিলিফ কিচেনের জন্য টাকা তুলতেন, ফার্স্ট-এড

শিখতেন, উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতেন, তাদের খাওয়াতেন। কখনও অ্যাম্বুলেস ডাকতেন, কখনও চলার পথে মৃতদেহ দেখতেন। এরই মধ্যে মেজমাসির ছেলে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের সূত্রে যুক্ত হয়ে পড়লেন নাটকের সঙ্গে। সেই সময় 'দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের যাহায্য করবার জন্য নাটক করে টাকা তোলবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।'[৪৩] দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সাহায্য করার জন্য দুর্ভিক্ষকে পটভূমি করেই রচিত হল নাটক। সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা পৌছে দিতে চাইলেন যন্ত্রণাদীর্ণ, ক্ষতবিক্ষত মানুষের কথা, ঘা দিতে চাইলেন তাদের সুপ্ত চেতনার বন্ধ দুয়ারে। শোভা সেনের কথায়, "সমস্ত দেশের মানুষের কথা আমরা নাটকের চরিত্রদের মধ্য দিয়ে বলতে পেরেছি, এই বোধই সেদিন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। অর্থোপার্জনের কথা সেদিন আমাদের চিন্তার মধ্যেই ছিল না। আমরা সকলেই আদি অকৃত্রিম দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই তখন কাজ করেছি।"[৪৪]

আর্ত, অসহায় পীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য টাকা তোলার প্রয়োজনে গণনাট্য শিল্পীরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটক করতেন নাচ, গান, আবৃত্তির অনুষ্ঠান করতেন। তৃপ্তি মিত্র তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন যে, কাজের নেশা যেন তাদের পেয়ে বসেছিল। টাকা তুলতে হবে, চললেন ঢাকায়। পিছনে পড়ে রইল কলেজ, পড়াশোনা, পড়ে রইল 'আমেরিকান কাপ্তানের লোলুপ শিস' ও 'মিলিটারী লরির ঘর্ঘর ময় আতঙ্কের ঘোমটা পরা'

একদিনের কথা বলেছেন, অঞ্জলি লাহিড়ী—"ছাতকে সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে নাটক হবে। সকালে টিকিট বিক্রি করতে বেরুলাম আমরা ওপারে। ফিরতে হবে নৌকো করে এপারে। এসেই স্টেজে অভিনয়—সাজসজ্জার বালাই নেই। মাঝদরিয়ায় এলো বিরাট তুফান। নদী ফুঁসছে ঢেউ-এর ওপর মোচার খোলার মত নৌকো উঠছে আর নামছে। আহা সে কি আনন্দ আমাদের। ঝোড়ো কাকের মত ভেজা কাপড়েই উঠে গেলাম মঞ্চে অভিনয় করতে। দর্শকরা মাঠে ছাতা মাথায়।"
অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

কলকাতা। কি এক স্বতস্ফূর্ত প্রেরণার আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতেন সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা যারা এগিয়ে এসেছিল মানুষকে সাহায্য করতে, দেশের কাজের টানে প্রয়োজনে সমস্ত পিছুটান স্নেহের বন্ধন অস্বীকার করে, নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে। তাদের আদর্শ, বিশ্বাস, ভাবনা, জীবন বিচ্যুত ছিল না, ছিল জীবন সম্ভূত। গণনাট্যের আরেক সহ শিল্পী উষা দত্ত ভার্মা সম্পর্কে বলেছেন, অঞ্জলি লাহিড়ী—"উষা এসেছিল কলকাতা থেকে। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার এক ঘর পালানো মেয়ে। কোনো প্রেমিকের ডাকে ঘর ছাড়েনি। জমিদার ঠাকুরমার প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচারে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। নারী মুক্তি এবং কৃষক সমাজকে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্য সে শ্রেণী সংগ্রাম করতে ঘর ছাড়ে।"[৪৫]

এদের না ছিল কোন সাজসজ্জা, না ছিল কোন উপকরণের বাহুল্য, ছিল প্রাণের তাগিদ—মানুষের প্রতি ভালবাসায় তাদের জন্য কিছু করার তাগিদ। প্রাণের আবেগ, নব-উপলব্ধ আদর্শবোধই তাদের ঘর ছেড়ে পথে বার করে নিয়ে এসেছিল। অঞ্জলি লাহিড়ী বলেছেন, কলেজের প্রথম বর্ষে পড়তে পড়তেই বিশ্ব বিপ্লবের ডাক শুনতে পে

তাঁরা। শিলং শহরের কেরানীগঞ্জে চারিদিকে গুপ্তচরের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে, লুকিয়ে চুরিয়ে তাদের 'স্টাডি সার্কেল' বসত কখনো স্কুল ঘরে, কখনো বুড়িদির রান্নাঘরে উনুনের পাশে, কখনো বাগানে কেতুর কাঠের কারখানায়। শিক্ষাগুরু জ্যোতির্ময় নন্দী মার্কসীয় তত্ত্ব পড়াতে

তৃপ্তি মিত্রের কথায়, "নবান্ন আমার উপলব্ধির একটা স্তর। চৌরাস্তার মোড়ে এসে কোন পথিককে যেমন ঠিক করতে হয় যে সে কোন্ রাস্তা ধরবে। তারপর তাকে সেই রাস্তায়ই চলতে হয়। 'নবান্ন' আমার সেই চৌরাস্তা। এখানে এসে আমি ঠিক করলাম, নাটক করাটাই আমার কর্তব্য। এই ঠিক করাটা অবশ্য খুব সহজে হয়নি। আমি তখন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে একটু একটু যুক্ত। পড়াশোনা করাটা বলতে পারা যায় জীবনের একটা মিশন ছিল। কিন্তু কয়েকটা ঘটনা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।"

তৃপ্তি মিত্র, ফ্ল্যাশব্যাক দুই, পৃঃ ১৫।

পড়াতে বলতেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে। সে কথা শুনে তাঁদের মনে হত, "আর পায় কে? মাভৈঃ বলে ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসি। আমি, হেনা, মায়া,

"ঢাকার পথে পথে গান গেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছি আমরা, গ্রামে গঞ্জে পার্টির ফতোয়া ছড়িয়ে দিতে শান্তা আর নির্মলের সমবেত কণ্ঠ সঙ্গীতে জমায়েত ভারী হয়ে উঠতো। ওদের উচ্চগ্রামে সুললিত কণ্ঠের আহ্বানে যাদুর মত মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতো, মুষ্টি ভিক্ষায় ভরে উঠতো আমাদের পার্টি ফান্ডের থলে।"

অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

অর্পণা, মণি, ছায়া (ডাঃ), কল্যাণী, বুড়িদি, লীলা, টুকু, কনি আমাদের মধ্যে কম্পিটিশন পড়ে যায় বিপ্লবের জন্য কে কতখানি আত্মত্যাগ করতে পারে।"[৪৬] পার্টির সংগঠনের প্রয়োজনে, মানুষের কাছে রাজনৈতিক মতবাদ পৌঁছে দিতে সাহায্য করত গান, সুর। কমিউনিস্ট পার্টির ছেলেমেয়েরা গ্রামে, গঞ্জে মাইলের পর মাইল হেঁটে চলতেন সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে। গান সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করত, গানের বক্তব্য বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের হৃদয়ের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করত। শ্লোগান বা কথা ততটা পারত না। "সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের এসব অনুষ্ঠানে প্রমাণিত হয় যে একটি জনসভা, একটি বক্তৃতা যত না প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার চাইতে অনেক গুণ বেশি প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রাখে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক মাধ্যম।"[৪৭] অঞ্জলি লাহিড়ী তাঁর স্মৃতিচারণে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিভিন্ন গানের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান রে'। গানটি সে সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। দুর্ভিক্ষকে প্রেক্ষাপট করে লেখা হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীরগলি ও নবজীবনের অন্যান্য গানগুলি। ক্ষুধার্ত মানুষকে কেন্দ্র করে রূপ গেল 'ভুখা নৃত্য' ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গণসঙ্গীতগুলি। শিলং-এ ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হেনা দাস হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্মৃতিচারণে বলেছেন, কিভাবে তিনি (হেমাঙ্গ বিশ্বাস) সিলেটকে কেন্দ্র করে সারা সুরমা উপত্যকার গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, পরাধীনতার জ্বালা, 'সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দানবের ভয়ঙ্কর

রূপ'—এ সমস্তই হয়ে উঠেছিল তাঁর গানের বিষয়বস্তু। এবং এরই সঙ্গে ছিল আশার কথা, উত্তরণের কথা, বলিষ্ঠ সংগ্রামের কথা। গানের ভাষা ও সুর তিনি সংগ্রহ করতেন সাধারণ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে থেকে। তাঁর গানের আবেদন ছিল অত্যন্ত গভীর। মেয়েদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও সংগ্রামের কাহিনীও হয়ে উঠেছিল তাঁর গানের বিষয়বস্তু। "অনাহার ও দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা সইতে না পেরে নারী সমাজের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ এবং বিদেশী সৈন্যের লালসার আগুনে বহু নারীর ইজ্জত বিসর্জনের ঘটনা হেমাঙ্গদার মনকে আলোড়িত করে ছিল।"[৪৮] সিলেটের বানিয়াচঙ গ্রামে ম্যালেরিয়া মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার

"হেমাঙ্গদার গানের আবেদন কত গভীর ছিল তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। '৪৩ অথবা '৪৪ এ সিলেট জেলার বানিয়াচঙ গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ ভয়াবহ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোগে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। এমন কোন পরিবার ছিল না যেখানে রোগ ও মৃত্যু হানা দেয়নি। সে সময়ে হেমাঙ্গদা লিখলেন—

'বাইন্যাচঙে প্রাণ বিদারী ম্যালেরিয়া মহামারী,
হাজার হাজার নরনারী মরছে অসহায়,
শান্তি ভরা সুখের গেহ
শূন্য আজি নাইরে কেহ
মৃত সন্তান বুকে লইয়া কান্দে বাপমায়'

ইত্যাদি বানিয়াচঙের অসহায় মানুষকে বাঁচাবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও রিলিফ তৎপরতা শুরু হলো। চাঁদা তোলার জন্য আমরা হেমাঙ্গদার গানটিকে কণ্ঠে তুলে নিলাম। যখন আমরা দল বেঁধে গানটি গেয়ে পাড়া মহল্লায় চাঁদা তুলতে যেতাম তখন দেখতে পেতাম গান শোনার সাথে সাথে প্রতিটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছেন মেয়ে পুরুষ সবাই। না চাইতেই তারা এগিয়ে এসে অশ্রুসজল চোখে দানের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবী শিল্পীদের আবেগ আর শ্রোতাদের অনুভূতি চোখের জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত।"

হেনা দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

মানুষের মৃত্যু হয়। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সেই ঘটনা নিয়ে যে গান বেঁধেছিলেন, সেই গান গেয়ে পার্টির ছেলেমেয়েরা যখন মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য যেতেন, দেখতেন গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতেন মেয়ে পুরুষরা। না চাইতেই অশ্রুসজল চোখে তারা বাড়িয়ে দিত সাহায্যের হাত।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান, জীবন সম্ভূত-গান—জীবনের উত্তাপ সঞ্জাত। বাস্তব জীবনের সমস্যা তখন হয়ে উঠেছিল শিল্পের বিষয়বস্তু—শিল্প, সাহিত্য জীবনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। 'নবান্ন' অভিনয় প্রসঙ্গে তৃপ্তি মিত্রের কয়েকটি কথা এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—"যারা নবান্ন দেখেছিলেন তাঁরা সবাই বললেন এবং তখনকার পত্রপত্রিকাতেও এইরকম লেখা বেরিয়েছিল যে, এইসব শহুরে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চলনে বলনে কি করে একেবারে ঐরকম গেঁয়ো ভিখিরি হয়ে যেতে পেরেছিল। সবাই বিস্মিত হয়েছিল। কেন যে আমরা পেরেছিলাম। তখন আমরা যাঁরা সবাই সেই নাটকের সঙ্গে ছিলাম, প্রায় সকলেই এই ধরনের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত ছিলাম।

রাস্তার ঐ সর্বস্বান্ত মানুষগুলো কোন না কোনভাবে আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা আচ্ছন্ন করেছিল। তাই বোধহয় মহড়ার সময় স্বল্পায়াসেই আমরা আমাদের ভূমিকায় একাত্ম হতে পেরেছিলাম।"[৪৯] যন্ত্রণাদীর্ণ সেই রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত সময়টি সাহিত্য, শিল্প তথা সংস্কৃতিতে এক নতুন জীবন সম্ভূত ধারার সৃষ্টি করেছে। এখানে আদর্শবোধ, জীবনবোধ, শিল্প ভাবনা ও দেশসেবা সব একাকার হয়ে গেছে।

নবজীবনের খোঁজে ব্যস্ত আদর্শবাদী এই মেয়েগুলিকে কিন্তু তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। এদের নতুন জীবনের স্বপ্ন, আদর্শবোধ, দেশসেবা, সমস্তই ছিল সেই মানুষগুলির কাছে মূল্যহীন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কাছে এরা 'নাটকের মেয়ে' তাই ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে এদের মেলামেশা অনেক পরিবারই পছন্দ করতেন না। এরকমই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন তৃপ্তি মিত্র। ঢাকায় 'জবানবন্দী' অভিনয় করতে গিয়ে তিনি ও ললিতা বিশ্বাস নাটক শুরু হবার আগে কাছেই একটি গৃহস্থ বাড়িতে জল খেতে যান। সেখানে প্রথমেই তাদের পরিচয় জানতে চাওয়া হয়। পরিচয় পাবার পর তাঁরা তৃপ্তি মিত্র ও ললিতা বিশ্বাসকে নিজেদের ব্যবহৃত পাত্রে জল তো দেননি, এমনকি বাড়ির বয়স্করা, বাড়ির মেয়েদের নাটুকে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাও পছন্দ করেননি।—"নাটুকে মেয়েদের সঙ্গে অত কি কথা? আর একটা কথা বললেন, মানে আখ্যা দিলেন, যেটা বুঝতে একটু সময়ই চলে গেল। তারপর বুঝতে পেরে ক্ষোভে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল।" তৃপ্তি মিত্র বলছেন, "এই ঘটনাটা এই জন্যেই বলতে ইচ্ছা করল যে, সামাজিক অবস্থা তখন কেমন ছিল। থিয়েটারের মেয়েদের বাড়ির বাসনে জল খেতে দেওয়া যায় না। হতে পারে হয়তো কলকাতা হলে এমনটি হত না। কিন্তু তেমন তেমন জায়গায় ঠিক কেমনটি হত বলাও যায় না।"[৫০] শোভা সেনও 'থিয়েটারে আমরা মেয়েরা' লেখায় থিয়েটার করতে আসা মেয়েদের সমস্যার কথা বলেছেন। সেই সময় যারা নাটকের জগতে এসেছিল, আর্থিক স্বার্থ তাদের ছিল না, শুধুমাত্র নাটকের নেশায় কিছু করতে পারার তাগিদে—নাটকের মাধ্যমে দেশের কাজ করার তাগিদেই এই সমস্ত মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল নাটক করতে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ নাটক করা মেয়েদের ভালভাবে গ্রহণ করেনি। এবং নাটক করতে গিয়ে প্রচলিত জীবনের অভ্যস্ত ছন্দে ঘা লাগলেই তখনই তাদের অভিযুক্ত হতে হত, সমাজের নিষেধের অঙ্গুলি, তখন তাদের পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ফিরে যেতে বাধ্য করে। অনেক মেয়েই তাই বাধ্য হয় থিয়েটার ছেড়ে দিতে। সমাজ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিবার তাকে সুযোগ দেয় না স্বপ্নকে সার্থক করার, আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার। নাটকের মধ্যে তারা তাদের প্রাণের সুর শুনতে পেয়েছিল, প্রাণের যোগ অনুভব করেছিল, তবুও সমাজ পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় তারা বাধ্য হত থিয়েটার ছেড়ে দিতে, তাদের স্বপ্ন আশা ত্যাগ করতে। নাটকের সঙ্গে যুক্ত নাটকের মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তিনি অনুভব করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, তারই টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে তাঁর স্মৃতিকথায়। "বাইরের গ্রাম বা কোনো শিল্পাঞ্চলে শো শুরুই হয় সাড়ে সাতটা আটটা বেজে গেলে। মফস্বলের লোক খেয়েদেয়ে শো দেখতে আসে। ইয়োরোপেও এই রীতি, ডিনার খেয়ে সবাই থিয়েটার, অপেরা বা ব্যালে দেখতে যান। শো শেষ হতে

সাড়ে দশটা-এগারোটা বেজে যায়। তারপর সাজ-পোশাক খুলে, মেকআপ তুলে, লাইট সেটের জিনিসপত্তর বাসের মাথায় তুলে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে, রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হতে সাড়ে এগারোটা-বারোটা বাজে। বাড়ি ফিরতে মাঝরাত। মাঝরাতে মেয়ে বা বোন বা বৌ থিয়েটার করে বাড়ি ফিরলে যে কোনো গৃহস্থ বাড়িতেই নানা বিরূপ মন্তব্য ও ব্যবহার মিলবেই। যত রাত বাড়ে ততই মেয়েদের বুক দুরদুর করতে থাকে। এভাবে কিছু দিন লড়াই করে চলার পর সে মেয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে থিয়েটার করাই বন্ধ করে দেয়। কত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে এইভাবে।"[৫১]

এই সময় বাংলার সংস্কৃতির জগতকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গণনাট্য সংঘ। গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন ভাবনার, নতুন জীবনের নব্য আদর্শের জোয়ার নিয়ে এল। সেসময়ে পাওয়া অধিকাংশ স্মৃতিকথাগুলিতে প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘ প্রসঙ্গেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথায় 'কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ' এবং তাদের উদ্যোগে, ১৩ এপ্রিল ১৯৪৫ জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবসে, 'অভ্যুদয়' নামক একটি গীতিনাট্যের অত্যন্ত সার্থক অভিনয়ের উল্লেখ রয়েছে। এবং এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের পর এটি যে বাংলা নাট্যজগতে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে, তখনকার কাগজগুলি সেরূপ মন্তব্য করেছিল।—"অভ্যুদয় নাটক যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিল, তাহার প্রভাব ও প্রেরণায় দেশের নাট্য ও অভিনয়ে নূতনভাবে মোড় ফিরিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"[৫২]

কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নিরুপমা দেবীর উপর। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছিল অভ্যুদয় গীতিনাট্যের মধ্যে দিয়ে। নিরুপমা দেবীর কথায়, "ইংরাজদের ভারতে বণিক বেশে আসার পর থেকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতা সংগ্রাম কেমনভাবে বর্তমান রূপ ধারণ করল সেই পর্যন্ত এক একটি দৃশ্যের বর্ণনা নাচ গান ও পাঠের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে এই ছিল পরিকল্পনা।"[৫৩]

নিরুপমা দেবী বলেছেন, "অভ্যুদয় নাটকের অভিনয়ের পর কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের নাম খুব প্রচারিত হয়ে পড়ল।"[৫৪]

বিশের দশকের প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের রক্ষণশীলতা ভেঙে বেরিয়ে আসার একটি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার, সেকালে আধুনিক ধারার সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান—সেই পরিবারেরই সদস্য রবীন্দ্রনাথ যখন সহশিক্ষার প্রচলন করেন, ছেলেদের সঙ্গে একযোগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, নাচ-গান-আবৃত্তি-অভিনয় চর্চার ব্যবস্থা করেন, ঘরে বাইরে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি একক প্রচেষ্টায় মেয়েদের আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন, পরিমার্জিত করে তুলেছিলেন তাদের ভাবনা-চিন্তা-মনন। রবীন্দ্রনাথের সাহায্যে তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় পরিপুষ্ট হয়েছিলেন এই সমস্ত মেয়েরা। সমকালে তারই সমান্তরাল ধারায় আমরা পেয়েছিলাম পেশাদারী নাটক এবং সিনেমা জগতের মেয়েদের। দারিদ্র্য এদের বাধ্য করেছে মঞ্চে, সিনেমায় অভিনয় করতে কিন্তু সেই পেশাদারী

অভিনয়ের জগতই তাদের পরিমার্জিত করেছে, এনে দিয়েছে যশ, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা। এই দুই ধারার মধ্যবর্তী পর্যায়ে পাই চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষিত সচেতন মেয়েদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য, তাদের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার জন্য তারা নাচ-গানের অনুষ্ঠান করে, নাটক করে টাকা তুলেছে। অসহায় মানুষের সেবায়, দেশের কাজেই তারা অভিনয় করতে এসেছিল, যোগ দিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘে। দুর্ভিক্ষকে মূলধন করে, দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটেই তৈরি হল তাদের নতুন ভাবনার ফসল। দেশের প্রয়োজনে অভিনয় করতে আসা নতুন ভাবনার পথিক হঠাৎ অভিনেতারাও ক্রমশ অভিনয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, ভালবেসে ফেলল অভিনয়কে। পরবর্তীকালে অনেকেই অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পর যখন গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে গেল, তারা গড়ে তুললেন ছোট-ছোট নাটকের দল, কেউ কেউ যোগ দিলেন সিনেমায়। চলচ্চিত্র জগতে আগেকার যুগের শিল্পীদের সঙ্গে এই নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে ছিল এক মস্ত বড় ব্যবধান। পুরনোরাও তাঁদের ফেলে আসা সামাজিক পরিচয় অতিক্রম করে শুধুমাত্র পূর্বপ্রজন্মের শিল্পীর পরিচয় নিয়ে এদের কাছে এগিয়ে আসতে পারতেন না। ব্যবধান তৈরি করত নতুনদের সামাজিক পরিচয়, শিক্ষা-সংস্কৃতি, যা তাঁদের ছিল না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই ব্যবধান অতিক্রম করে দুই প্রজন্মের মিলন ঘটাতে সক্ষম হতেন এবং একে অপরের সান্নিধ্যে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করতেন। এঁদেরই ডাকে অনেক সময় পেশাদারী জগতের অনেক শিল্পী এগিয়ে আসতেন নতুন ছেলেমেয়েদের নতুন ভাবনার নাটকে অভিনয় করতে। এইভাবেই বিশুদ্ধ শিল্পচর্চার জগৎ ও পেশাদারী শিল্পের জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিলেন গণনাট্য সঙ্ঘের নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত পরিশীলিত ছেলেমেয়েরা।

মনের খেয়ালে বিশুদ্ধ শিল্পচর্চা ও সামাজিক প্রয়োজন, এবং মানুষের অসহায় মৃত্যুযন্ত্রণা,—দুইয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তৈরি হল এক স্বতন্ত্র শিল্পভাবনা, যার প্রেক্ষাপট সেই ভয়ানক সময়, যার বিষয়বস্তু সময়-তাড়িত মানুষ। শিল্প চলে এল বাস্তব জীবনের বড় কাছাকাছি। নতুন জীবনবোধ, নব্য আদর্শ-মূল্যবোধ প্রতিফলিত হল এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে। গড়ে উঠল নতুন শিল্প ভাবনা। মোড় ফিরল বাংলা নাটক, চলচ্চিত্র, নৃত্য ও সঙ্গীত ভাবনায়। এই ধারাতেই বাঙালীর শিল্প-সংস্কৃতি এক নতুন ধারা, নতুন পথ খুঁজে পেল।

১ অমিতা সেন, "শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা", পৃঃ ১২।
২ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ৯৩।
৩ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ৫৩-৫৩।
৪ প্রতিমা দেবী, "নির্বাণ", পৃঃ ৪৩।
৫ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ৯৩।
৬ অমিতা সেন, ঐ, পৃঃ ১০৯।
৭ সুকৃতি চক্রবর্তী, 'নটরাজের নাট্যশালে', দেশ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃঃ ২৯।
৮ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ১১৩।

৯ অমিতা সেন, পূর্বোক্ত।

১০ সাহানা দেবী, 'স্মৃতির খেয়া', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ৯৮।
দ্রষ্টব্য ঃ কবির অভিনয় শেখানোর পদ্ধতি সম্পর্কেও খুব সুন্দর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে সাহানা দেবীর লেখায়। একবার কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় বিসর্জন নাটকের রিহার্সালের সময় সাহানা দেবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেবার নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন, সবাই ছিলেন ঠাকুর-পরিবারভুক্ত। রিহার্সাল শুরু হবার আগে, প্রথমে একবার সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপস্থিতিতে নাটকটা পড়ে নিতেন আগাগোড়া। এবং এই পড়ার মধ্যে দিয়ে সমস্ত চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতেন। তারপর রিহার্সাল শুরু হলে যেখানে প্রয়োজন মনে করতেন সেখানে নিজে করে দেখিয়ে দিতেন। এবং যতবার দরকার হত, ততবারই দেখিয়ে দিতেন অভিনয় করে। একের পর এক যখন বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করে দেখাতেন, অভিনীত চরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে আসতেন এবং সেই চরিত্রের সঙ্গে 'একীভূত' হয়ে যেতেন। সাহানা দেবীর কথায়, "মনে আছে, যাঁরা এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে, সকলের সামনে কবি প্রথমে একবার নাটকটা আগাগোড়া পড়লেন। এই পড়ার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন সব চরিত্রগুলো। এতে মনে হল সকলেই যেন বেশ একটা আলো পেলেন। জানতে পারলেন কী ভাবে কী করে কী বলতে হবে। এতে কাজ হল অনেকখানি। বাকি রইল অভিনয়ের অংশ। এই অংশটি দেখালোন প্রত্যেককে, যার যা অংশ তাকে তা রূপায়নের ভার দিলেন। তারপর রিহার্সাল শুরু হলে পর দেখতাম যেখানে প্রয়োজন বোধ করছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করে দেখাচ্ছেন। কিংবা কখনো কাউকে একটু আধটু শুধরে সংশোধন করে দিতেন। ......আমি যা দেখেছি তাতে এই মনে হয়েছে যে, উনি বলে যে বিশেষ কিছু বোঝাতে চাইতেন, তা নয়—অভিনয় করে দেখিয়ে দিতেন। যতবার দরকার হতো ততবার দেখতাম উনি অম্লান বদনে তা করে যেতেন। যখন যে চরিত্রটি করে দেখাতেন, তখন তিনি সেই চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতেন। অনেক সময়ে একই সঙ্গে হয়ত পরপর দেখিয়ে দিতেন, দেখিয়ে দিতে হতো। সেই সময় আশ্চর্য হয়ে দেখতাম, পর পর নিজের মধ্যেও দ্রুত পরিবর্তন তিনি আনতে পারতেন। একেবারে অনায়াসে যাকে বলে তাই। আর সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের পট-পরিবর্তন তেমন দ্রুত ঘটাতে পারতেন।" (সাহানা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩-১০৪)।

১১ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, "আনন্দ ধারা", পৃঃ ১৯।

১২ সাহানা দেবী, 'স্মৃতির খেয়া', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৭, পৃঃ ৯৮।

১৩ অমিতা সেন, "শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা", পৃঃ ১১৬।

১৪ অমিতা সেন, ঐ, পৃঃ ৭৫।

১৫ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ১৫৯।

১৬ অমিতা সেন, ঐ, পৃঃ ১৫৯।

১৭ অমিতা সেন, ঐ, পৃঃ (১৫৯-৬০)।

১৮ সুকৃতি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

১৯ সুকৃতি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

২০ অমিতা সেন, "শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা", পৃঃ ১৩।

২১ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।

২২ অমিতা সেন, "আনন্দ সর্বকাজে", পৃঃ ১২৮।

২৩ রেবা রায়, 'আনন্দ গান ও সুরের চরণ', দেশ, ২১ কার্তিক ১৩৭১, পৃঃ ৪৫.
২৪ রেবা রায়, ঐ, পৃঃ ৪৫।
২৫ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।
২৬ সুচিত্রা মিত্র, "মনে পড়ে", পৃঃ ৪৩।
২৭ সুচিত্রা মিত্র, ঐ, পৃঃ ৪৭।
২৮ কানন দেবী, "সবারে আমি নমি", পৃঃ ৬।
২৯ কানন দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।
৩০ কানন দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।
৩১ কানন দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০।
৩২ কানন দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৪।
৩৩ কানন দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬।
৩৪ সরযূবালা দেবী, 'সম্রাজ্ঞীর মুখ থেকে', পাক্ষিক বসুমতী, ১৬ নভেম্বর ১৯৯২।
৩৫ তৃপ্তি মিত্র, 'ফ্ল্যাশব্যাক' শূদ্রক।
৩৬ প্রগতি লেখক সংঘের ইশতেহার। উৎস, রীণা ভাদুড়ি, 'প্রগতি থেকে গণনাট্য' প্রগতির পথিকেরা, পৃঃ ৩।
৩৭ জলি কল, 'ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।
৩৮ রীণা ভাদুড়ি, 'প্রগতি থেকে গণনাট্য', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।
৩৯ শোভা সেন, "স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লাল দুর্গ", পৃঃ ১১৮।
৪০ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩।
৪১ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।
৪২ অঞ্জলি লাহিড়ী, 'ঋক' হেমাঙ্গ বিশ্বাস, স্মরণ সংখ্যা (১ম), অষ্টাদশ বর্ষ ॥ তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ১৯৯১, পৃঃ ১০।
৪৩ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮-৯।
৪৪ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।
৪৫ অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।
৪৬ অঞ্জলি লাহিড়ী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।
৪৭ হেনা দাস, 'হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সিলেটের গণনাট্য আন্দোলন', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।
৪৮ হেনা দাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ
৪৯ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।
৫০ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।
৫১ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।
৫২ নিরুপমা দেবী, 'আমার জীবন', এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৪০১, পৃঃ ১৩৪।
৫৩ নিরুপমা দেবী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৫।
৫৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।

'৪৮-'৬০—একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

১৯৪৮	২৩ জানুয়ারি	: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়।
	৩০ জানুয়ারি	: আততায়ীর গুলিতে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু।
	১ ফেব্রুয়ারি	: কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় অধিবেশন।
	২৬ মার্চ	: কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল।
		: কাকদ্বীপ কৃষক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আট মাসের গর্ভবতী কৃষক নারী অহল্যার মৃত্যু।
১৯৪৯	জানুয়ারি	: উদ্বাস্তু আন্দোলন।
	ফেব্রুয়ারি	: হুগলীর ডুবিরভেড়িতে কৃষক পুলিশের সংঘর্ষে, পুলিশের গুলিতে পাঁচজন মহিলার মৃত্যু।
	১ মার্চ	: সরোজিনী নাইডুর মৃত্যু।
	৯ মার্চ	: রেল ধর্মঘট।
	২৭ এপ্রিল	: বন্দীমুক্তির দাবিতে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির' মিছিলে, পুলিশের গুলিতে লতিকা সেন, প্রতিভা গাঙ্গুলী, অমিয়া দত্ত, গীতা সরকারের মৃত্যু।
১৯৫০	২৪ জানুয়ারি	: 'বন্দেমাতরম' এবং 'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রূপে গৃহীত হল।
		: স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান তৈরি হল। স্বীকৃত হল ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষের সমানাধিকার। স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা। নারী-পুরুষের সমানাধিকার আইনী স্বীকৃতি পেল।
	৮ এপ্রিল	: স্বাক্ষরিত হয় নেহরু-লিয়াকত চুক্তি।
	২৭ ফেব্রুয়ারি	: কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।
১৯৫১	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	: আন্তর্জাতিক নিয়মসম্মত রূপে ভারতে প্রথম আদম সুমারী।
	৬ এপ্রিল	: 'বাংলা' ভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে স্বীকৃতির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে 'জাতীয় ভাষা দিবস' উদ্‌যাপন।
	২১ এপ্রিল	: কোচবিহারে ভুখা মিছিলে পুলিশের গুলিতে ৫ জনের মৃত্যু।
	মে	: মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের সত্যাগ্রহ।
		: ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

	মে	: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
		: চলচ্চিত্রকার পুডভকিন ও রুশ অভিনেতা চেরকাশভ ভারত ভ্রমণে আসেন। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' অসাধারণ প্রশংসা পেল তাঁদের কাছে। এখানে তাঁরা ভারতীয় জীবনের খোঁজ পেয়েছিলেন।
১৯৫২	জানুয়ারি	: সারা দেশে লোকসভা ও বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে।
	২১ ফেব্রুয়ারি	: পূর্বপাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ৯ জন ছাত্রের মৃত্যু।
	মে	: গড়ে উঠল বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী।
	৮ ডিসেম্বর	: ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ।
		: ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল।
১৯৫৩	১ ফেব্রুয়ারি	: জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন।
	১৩ মার্চ	: কলকাতায় বেকারী ও ছাঁটাই বিরোধী বিরাট মিছিল।
	২৯ মে	: তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারীর এভারেস্ট বিজয়।
	১ জুলাই	: ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৭ দিন ব্যাপী আন্দোলন।
	৫ জুলাই	: বার্ণপুরে শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিতে ৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু।
	১৯ আগস্ট	: কলকাতায় ২০ হাজার কৃষকের খাদ্য সমাবেশ।
		: কৃত্তিবাস পত্রিকার প্রকাশ।
১৯৫৪	১০ ফেব্রুয়ারি	: প্রথম শিক্ষক ধর্মঘট—পশ্চিমবঙ্গের ২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৩ হাজার শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নেয়।
		: জমিদারি অধিগ্রহণ বিল আইনে পরিণত হল।
	২২ অক্টোবর	: কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু।
		: বোম্বাইতে 'দেবদাসী প্রোটেকশন অ্যাক্ট' পাশ হয়।
		: 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাশ করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাহ আইন সিদ্ধ করা হয়। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর করা হয় এবং বিয়েতে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়।
		: বহুরূপী পরিবেশিত 'রক্তকরবী' সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেল।

১৯৫৫ জানুয়ারি : গোয়ামুক্তি আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষও সোচ্চার হয়ে ওঠে।

: 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' পাশ হবার ফলে হিন্দু নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করে।

সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার বিল পাশ।

: 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কারের প্রচলন। প্রথম অকাদেমি পুরস্কারের সম্মান পান কবি জীবনানন্দ দাশ (মরণোত্তর)।

ডিসেম্বর : পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাদেমী প্রতিষ্ঠা।

৩০ নভেম্বর : রাশিয়ার বুলগানিন এবং ক্রুশ্চভ কলকাতায় এলে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানানো হয়।

: সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' কলকাতায় মুক্তি পেল।

১৯৫৬ ২১ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন।

: দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন।

: 'হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট' মেয়েদের সম্পত্তি লাভের অধিকার দেয়।

: 'হিন্দু মাইনরিটি অ্যান্ড গার্ডিয়ানশিপ অ্যাক্ট' ঘোষণা করে যে শুধুমাত্র পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশুর উপর মায়ের সম্পূর্ণ অধিকার কিন্তু পুত্র ও অবিবাহিত কন্যার অভিভাবক তার বাবা।

: 'হিন্দু অ্যাডাপশন অ্যান্ড মেনটেনান্স অ্যাক্ট' অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেবেন, কিন্তু স্ত্রী দুশ্চরিত্রা প্রমাণিত হলে স্বামী তার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবেন না।

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি : মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম সম্মেলন।

জুন : ভিয়েনায় বিশ্ব নারী-শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৭ জানুয়ারি : 'পথের পাঁচালী' কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'Best Human Document' হিসেবে সম্মানিত হয়।

: কেন্দ্রীয় সরকার বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের খানিকটা অংশ নিয়ে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সূচনা করেন।

১ মার্চ : দ্বিতীয় লোকসভা সাধারণ নির্বাচন।

: কেরালায় ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হল।

: 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য।

	৩০ মে	:	নতুন কর নীতির বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতিরোধ কমিটির ডাকে রাজ্য ব্যাপী ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়।
১৯৫৮	জুন	:	খাদ্যের দাবিতে মহিলা সমিতিগুলির সংযুক্ত বিধানসভা অভিযান।
১৯৫৯		:	চীনের ভারত সীমান্ত আক্রমণ।
		:	পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন, ধর্মঘট, আইন-অমান্য আন্দোলন, ময়দানে কৃষক সমাবেশ।
		:	ভারত, চীন সীমানা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। পরিবর্তিত হতে থাকে চীন-ভারত সম্পর্ক।
	৮ মার্চ	:	আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী।
১৯৬০	জুন	:	অসমে শুরু হয় ভয়াবহ অসমিয়া-বাঙালি দাঙ্গা।
	জুলাই	:	মধ্যরাত্রি থেকে সারা ভারত ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট। ১০ হাজার রেলকর্মী সাসপেন্ড, ৬,৭০৮ জন গ্রেপ্তার।
	ডিসেম্বর	:	জলপাইগুড়ি জেলার 'বেরুবাড়ি' হস্তান্তরের জন্য শুরু হয় আন্দোলন।

চল্লিশের দশকের ক্রমপর্যায়িক বিপর্যয়ের মধ্যেই এল ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট—দেশভাগ ও স্বাধীনতা। প্রায় অর্ধশতকের সংগ্রাম, নির্যাতন ও অসংখ্য প্রাণের মূল্যে অর্জিত

কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতবাসীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ স্বাধীনতা আসেনি। এ স্বাধীনতার পূর্বে দেখা গেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত জালে জড়িত ভারত ব্যাপী হিন্দু মুসলমানেব মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তক্ষরণ। এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তধোয়া পথেই উড়েছে দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার পতাকা, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে........।" কনক মুখোপাধ্যায়, 'নাবীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', 'স্বাধীনতার পরে, পৃঃ ১০৪।

স্বাধীনতা, কিন্তু এই স্বাধীনতাও তো এক বিপর্যয়, জাতির জীবনে নেমে আসা বিপর্যয়। এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলেন দেশের মানুষ তাঁদের জীবনের বিনিময়ে, আদর্শের বিনিময়ে, রক্তের মূল্যে? স্বাধীনতা তাদের কাছে স্বপ্নভঙ্গ—স্বাধীনতার পর শোষণহীন,

মৃনালিনী দাশগুপ্তের মতে, "সুচতুর ইংরাজ সর্বশেষেও বিভাজন নীতি খেলল আর আমরা বোকার মতন খেললাম—মুসলমান বিরোধী হলাম দাঙ্গা হল—দাঙ্গা শেষে ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে দরদস্তুর করে ভারতকে তিন খণ্ড করে এক ঝুটা স্বাধীনতা পেলাম।"
—মৃনালিনী দাশগুপ্ত (মুখোপাধ্যায়), 'আমার রাজনৈতিক চেতনা ও বিকাশ' পৃঃ ১২।

নির্যাতনহীন যে অখণ্ড আদর্শ জাতীয় ভূমির স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, তা মুহূর্তেই হারিয়ে গেল। রেণু চক্রবর্তীর স্মৃতিতে, "১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার দিন এলো।

কিন্তু এই দিনটি এল দেশভাগের দুঃখ যন্ত্রণা আর কান্নায় ভেঙ্গে পড়া দিনগুলির ভিতর দিয়ে। নারীহরণ, ইজ্জত লুণ্ঠন, বলপূর্বক নিকা ইত্যাদির পাইকারী অত্যাচার। পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অশেষ দুর্গতি নেমে এলো। ভারতেও সমান দুর্গতি হলো মুসলমানদের।"[১]

বহু প্রচেষ্টা, প্রতীক্ষা ও সংগ্রামের ফল এই স্বাধীনতা, সত্যিই কতটা কাঙ্ক্ষিত ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার আনন্দোৎসবে সেদিন বাদ পড়েছিলেন সেই সমস্ত সংগ্রামী সৈনিকরা, স্বাধীনতা ছিল যাদের স্বপ্ন-আশা-কল্পনা। তাঁরাই বাদ পড়েছিলেন স্বাধীনতার আনন্দযজ্ঞে। তাঁদের কথা কারুর মনেই পড়েনি সেদিন। বরং পাদপ্রদীপের তলায় এসেছিল, স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের সম্মান লাভ করেছিলেন সেই পুলিশ অফিসাব ও ম্যাজিস্ট্রেটরা, যারা ইংরেজ শাসকের চূড়ান্ত নিপীড়ন, অত্যাচার দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে ছিল, বিদেশী শাসকের প্রতিনিধি রূপে। খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বীণা দাশের ভাই, "খোকা বলে চলল কিছু ভাল লাগছে না আমার। ১৫ই উৎসব করতেও ইচ্ছা করছে না। সমস্ত থানায়, কোর্টে আর অফিসে সেদিন পতাকা তোলার ভার দেওয়া হল কিনা যতসব এস. পি., এস. ডি. ও. আর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর যারা একদিন এই পতাকার কী লাঞ্ছনাই না করেছে! একবার কল্পনা করো তমলুক থানায়, বিপ্লবের দিনে মাতঙ্গিনী হাজরাকে যে গুলি করে মেরেছে, সেই এস. পি. ই আজকে সসম্মানে দাঁড়িয়ে সেই থানাতেই গিয়ে পতাকা তুলবে। স্বাধীনতার এমন অসম্মান, বিপ্লবী শহীদদের এমন চরম অমর্যাদা এর আগে কোনো দেশে হয়েছে কি? কী হত যদি বলা যেত সরকারি বাড়িগুলোর পতাকা তুলবেন সমস্ত জেলার জেলা-কংগ্রেস সভাপতি, সম্পাদক বা অন্য কোনো রাজনৈতিক বহু লাঞ্ছিত কর্মী?"[২] —কিছু প্রকাশ না করলেও বীণা দাশের নিজেব মনও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে তখন, মনে পড়েছে কলকাতার এস. বি, আই. বি. অফিসের চূড়ান্ত অত্যাচারের কথা। ভেবেছেন যারা এতদিন ধরে অত্যাচার করে এসেছে, যাদের উপর নির্ভর করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার নির্মম শোষণ চালিয়ে এসেছে, তাদেরকে যদি স্বাধীন ভারতবর্ষেও সমান মর্যাদা দিয়ে সসম্মানে এগিয়ে দেওয়া হয়, "তাহলে সেই স্বাধীন ভারতের কাঠামোটা তেমন শক্ত হয়ে গড়ে উঠবে কি?"[৩] তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছেন, যদিও উত্তর তাঁর জানা ছিল না। শুধু মনে হয়েছে, "স্বাধীন ভারত সৃষ্টি হয়েছে যে সব শহীদদের অস্থি আর রক্ত দিয়ে তাদের সঙ্গে এই চির স্বার্থান্বেষী মনুষ্যত্বহীন মানুষগুলির আজকের দিনে কর্মধারায় কোনো মিলই থাকবে কি, সমস্ত ইমারতটাই এই বৈপরীত্যের সংঘর্ষে ভেঙে পড়বে না তো?"[৪] আশা করেছেন, যে মানুষরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিল, দেশের স্বার্থে যারা নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিল, দেশের ভার, দেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব কি তাদের হাতে আসবে না, নিশ্চয়ই আসবে।

স্বাধীনতা যখন প্রায় এসে গেল, বীণা দাশের মনে হতে লাগল, স্বাধীন দেশে তাঁদের কি কাজ হবে? কি করবেন তাঁরা? স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার কাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের থেকেও আরও বেশি কঠিন বলে মনে হল। কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে হবে সেই কাজ,

তা' নিয়ে কারুর মনেই কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি ছিলেন কংগ্রেস কর্মী, কংগ্রেসও সোশ্যালিজম্ আনতে চাইত—বীণা দাশের কথায়, "দেশে সোশ্যালিজম্ যে আমরা আনতে চাই সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে পৌঁছবার পথ মনের মধ্যে স্পষ্ট করে আঁকা নেই যেন।"[৫] সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই সোশ্যালিজমের কথা বলতেন, কিন্তু কারোর সঙ্গে কারোর মিল ছিল না, কিন্তু বীণা দাশের মনে হয়েছে, "কথার ফাঁকি দিয়ে কতদিন আর চলবে? এবার সুস্পষ্ট আর বলিষ্ঠ রেখায় নিজেদের লক্ষ্য শুধু নয়, লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ এবং উপায় দুটোই এঁকে নেবার সময় এসেছে, গোঁজামিল আর চলবে না।"[৬] কংগ্রেসে থেকেও বীণা দাশ অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তাঁদেব মত এবং পথ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, প্রয়োজনে সমালোচনাও করেছেন। তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন 'কিষান মজদুর রাজ' এর। বলেছেন হস্তান্তরের অর্থ জনসাধারণের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর কিন্তু স্বাধীন হবার পথে দেশ যত এগিয়ে যাচ্ছিল বুঝতে পারছিলেন, চোখে পড়ছিল কথা আর কাজের ফারাক, প্রতিশ্রুতি পূরণের পথের বাধা-বিপত্তিগুলি। তাঁর বাড়ির 'নতুন জেনারেশনের' কংগ্রেসের প্রতি তেমন আস্থা ছিল না। বীণা দাসের বোনঝিরা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে কাজ করত। কংগ্রেস নিয়ে তাদের সঙ্গে বিতর্ক হত। তারা বলত, "কংগ্রেসের মধ্যে রয়েছে যতসব জমিদার আর বড়ো লোকরা—এদিকে গ্রামে ওদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই করতে হয়। কাজেই কংগ্রেসের কাজ করে আমরা সুবিধা পাই না।"[৭] বুঝতে পারেন স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা করছে বাস্তবের কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে "আজকের বঞ্চিত জাগ্রত জনশক্তির পুঞ্জীভূত দাবির সংঘাতে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়বে এতদিনের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান।"[৮]

স্বাধীনতার পর বাংলায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা রোধ করতে কলকাতায় এলেন গান্ধীজী। সুরাবর্দি গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। গঠিত হল শান্তি সেনা দল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শান্তিসেনার সঙ্গে যোগ দেন স্বাধীনতার ঠিক একপক্ষকাল পর। '৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 'বৃহত্তর শান্তি সংগ্রাম'—গান্ধীজীর অনশন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তাগিদে কলকাতায় গড়ে উঠল, ১০,০০০ শান্তি সেনা। মেয়েরাও এই সংগ্রামে যোগ দিলেন, এগিয়ে এলেন বাংলার মানুষকে মানবতার ঐক্যে দীক্ষিত করতে। রেণু চক্রবর্তীর কথায়, "১৯৪৭-এর ১লা থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃহত্তর শান্তি সংগ্রাম হল দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে। কলকাতা কেঁপে উঠল সেই লড়াইয়ে। গান্ধীজী উপবাস শুরু করলেন। সর্বসাধারণের দাঙ্গা বিরোধী ক্রোধ এবং গান্ধীজীর উপবাস মিলে যে শান্তি সৃষ্টি হল, তাতে দাঙ্গাবাজদের হাতিয়ার ভোঁতা হয়ে গেল। এই লড়াইয়ে আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েদের অবদান কম ছিল না। ১০,০০০ শান্তি সেনা কলকাতায় গড়ে উঠল। কোন ব্যক্তিবিশেষ গড়েনি এই বাহিনী। সাম্প্রদায়িক শান্তির তাগিদে এবং ঐক্যের শক্তি উপলব্ধি করার ফলে এই বিরাট শক্তির উদ্ভব। বিরাট শোভাযাত্রা বেরুল বেলেঘাটায় যেখানে ছিলেন গান্ধীজী। অন্যান্য দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকায় সন্ত্রস্ত মানুষদের সাহস ও আশ্বাস দিয়ে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সেতু বাঁধার প্রচেষ্টায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরাও এই ঐতিহাসিক

মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন সেদিন।"[৯] প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে শান্তিবাহিনীর কুচকাওয়াজ হয় কলকাতা ময়দানে, ১৯৪৭-র ১৪ সেপ্টেম্বর। অক্টোবরের শেষে শান্তিসেনার মেয়েরা, নারী বাহিনী একটি অনুষ্ঠান করেন—মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা তাতে যুক্ত ছিল। পুজোর সময় মুসলমান মেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হয়, ঈদের দিনে হিন্দুদের। এইভাবেই তারা হিন্দু-মুসলমানের হারানো সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল, সুস্থ-স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ জাতির জন্য—জাতির সুস্থ, সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনে। গান্ধীজীর প্রচেষ্টাতেই মূলত সম্ভব হয়েছিল এ সমস্ত আয়োজন। সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯৪৮-র সূচনাতেই, ৩০ জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় এক আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হল গান্ধীজীর। তাঁর মুসলমান প্রীতির জন্যই অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে। ফুলরেনু গুহ বলেছেন, "আজও মনে পড়ে সেই অশুভ দিনটির কথা। সন্ধ্যেবেলা থমথমে গলায়, বেতারে বার বার ঘোষিত হতে লাগল—'আজ প্রার্থনা সভায়, বাপুজিকে হত্যা করেছে জনৈক আততায়ী'। এ খবরে সারা শহর স্তম্ভিত ও শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে। আজও কানে বাজে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সেই মর্মস্পর্শী বেতার ভাষণ।" [১০] শান্তিসুধা ঘোষও তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন, প্রথমে যখন খবরটা শোনেন বিশ্বাস করতে পারেননি—"সেদিন ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। বাবা দৈনন্দিন সান্ধ্য ভ্রমণ সমাপন করে বাড়ি ফিরলেন। অবিচল থাকাই যাঁর প্রকৃতি, তিনি এসেই কেমন যেন বিহ্বল ভাবে বললেন, "আসতে আসতে রাস্তায় এ কী শুনে এলাম? লোকেরা সবাই যেন ফিস্‌ফিস্ করছে, একে' অপরের দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকাচ্ছে, বলছে, 'মহাত্মাজী' নেই!!" ......আমাদের ঘরে সেদিন রেডিওর আমদানি হয়নি। কিন্তু প্রতিবেশীর মুখে শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু রেডিওতে বেতার বার্তায় ঘোষণা করেছেন, একটি লাইন—'বাতি নিভে গেছে। —ভারত অন্ধকার!"

পরদিন প্রত্যূষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবর উদ্‌ঘাটিত হল। দিল্লীর বুকে অপরাহ্নে প্রার্থনা সভায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গুপ্ত আততায়ীর গুলিতে মহাত্মাজীর শেষ নিশ্বাস আকাশে মিলিয়ে গেছে শেষ প্রার্থনা মন্ত্রের সঙ্গে—'হে রাম!' আততায়ী একজন হিন্দু মারাঠী যুবক—নাথুরাম গড্‌স। গান্ধীজির মুসলিম প্রীতি ও নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি উদার মনোভাব এই যুবক সহ্য করতে পারেন নি ;"[১১] পরদিন সকালে দেখলেন বরিশাল শহরে আলেকান্দায় তাঁরই বাড়ির সামনে দিয়ে এক মৌন মিছিল যাচ্ছে, 'নীরব নগ্নপদ, নগ্ন শির বিপুল জনতার'। তাঁদের কারো মুখে কোন কথা নেই, শুধু রয়েছে দু-একটি শোকবার্তা লেখা প্ল্যাকার্ড। সেই মিছিলে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই ছিলেন, আর অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। শান্তিসুধাও সেই মিছিলের সঙ্গে বেরিয়ে খানিকটা পথ অতিক্রম করে ফিরে এলেন। শারীরিক কারণে বেশি রাস্তা হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁকে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সেই শোভাযাত্রা। শ্রদ্ধায় বিনম্র, শোকস্তব্ধ মানুষের গান্ধীজির জন্য শোকযাত্রা এক অননুভূত পূর্ব অনুভূতি জাগিয়ে তুলল শান্তিসুধার মনে। নিজের চটি জোড়া গেটের ভেতর ফেলে তাদের সঙ্গী হয়ে তিনিও যেন এক মহান কর্তব্য পালন করলেন। গান্ধীজির শ্রাদ্ধকৃত্য হওয়া পর্যন্ত এগারো দিন জাতির শোকাশৌচ' বলে গণ্য হবে, সমস্ত

অফিস আদালতে জাতীয় পতাকা নামানো থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। শান্তিসুধার বাবাও এই কদিন পরম শ্রদ্ধায় অশৌচ পালন করেছিলেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘু মানুষের দেশত্যাগ। সেই সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্বেচ্ছাসেবক মেয়েরা দিনরাত শেয়ালদা স্টেশনে পাহারা দিত। উদ্বাস্তু মেয়েদের 'রিলিফ ক্যাম্পে' নিয়ে যেত, যাতে তারা কোনভাবেই বিপদে না পড়ে। সাধনা রায়চৌধুরী বলেছে, "এরপর এলো দেশভাগ আর দাঙ্গা। শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে রিফিউজি নিয়ে আসা, তাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া, মেডিক্যাল স্টোরে ভলান্টিয়ারি করা ছিল আমার কাজ।"[১২] যুদ্ধের সময় থেকেই দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে নারী মাংস ব্যবসায়ীদের বাজার বেশ জমে উঠেছিল। কলকাতা শহরে সবচেয়ে সস্তা হয়ে উঠেছিল বাঙালি মেয়েরা। একটি কাপড় বা একদিনের খাবারের বিনিময়ে তারা বিক্রি হয়ে যেত। শুধু তাই বা কেন, দেশভাগ দুই বাংলার সমাজ অর্থনীতিকে যেমন ভেঙে দিয়েছিল, তারই সঙ্গে ছিনিমিনি খেলেছিল হিন্দু মুসলমান বাঙালি মেয়েদের নিয়ে। শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণে তাদের অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল। বিমলা ফারুক্কী তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, "দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে মানুষ যখন দলে দলে পালাতে শুরু করল মেয়েরা তখন পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারছিল না। অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করার জন্য শত্রুপক্ষ ওত পেতে থাকত। এই দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য ছিল মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে সেই সম্প্রদায়কে কলঙ্কিত করা। তাদের নজর এড়িয়ে মেয়েদের নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসা এক সমস্যা ছিল পুরুষের পক্ষে।"[১৩] তিনি বলেছেন, সেই সঙ্কটের মুহূর্তে মানুষের মত ব্যবহারও তারা পায়নি, এমনকি অতি আপনজনের কাছেও সবসময় নয়। তাদের যেন কোন ব্যক্তিত্ব নেই, স্বাতন্ত্র্য নেই, শুধু একটিই পরিচয় যে তারা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারী। শারীরিক কারণে, সাম্প্রদায়িক বিভেদের সময় নিজের আত্মীয় পরিজনের কাছেও তারা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক সামগ্রী, সঙ্গে রাখলেই বিপদ। শত্রুর হাতে পড়লে নিজের বিপদের তুলনায় পরিবার বা সম্প্রদায়ের সম্মান নষ্টের প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছিল—'এই আশঙ্কায় পুরুষেরা স্ত্রী-কন্যাকে হত্যা করেছে।' পরিবারের সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের। কখনো "ভয়াবহ পথ অতিক্রম করে পুরুষেরা সীমান্তের ওপারে নিরাপদে পৌঁছুবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছে নিজ পরিবারভুক্ত মেয়েদের বিনিময়ে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।"[১৪]

দীর্ঘ প্রায় দুশো বছর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে প্রাপ্ত স্বাধীনতা কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কট, খাদ্য সমস্যা, বেকারী সমগ্র দেশকে বিপর্যস্ত করে ফেলল। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল দ্বিধাবিভক্ত বাংলা। "দেশবিভাগের ফলে শুধু যে দেশের মানুষই ভাগ হয়ে গেল তাই নয়, জীবজন্তু, বনসম্পদ, কৃষি শিল্প সংস্থান সবই ভাগ হয়ে এক ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিল।"[১৫] বাংলার অর্থ ব্যবস্থাও প্রচণ্ডভাবে ঘা খেল। কেননা দুই বাংলার মধ্যে কৃষি শিল্প ব্যবস্থাগুলিও তো ভাগ হয়ে গেল—চটকল শিল্প পশ্চিমবাংলায় থাকল, কিন্তু পাট উৎপাদনের অংশ চলে গেল পূর্ববাংলার সঙ্গে পাকিস্তানে।

ভারতের অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াসে পঞ্চাশের দশকের সূচনায় ১৯৫১ থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) এবং ১৯৫৬ থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা। পঞ্চাশের দশকেই প্রায় সম্পূর্ণ হচ্ছে দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। দুটি পরিকল্পনার কাল সমাপ্ত হলেও এই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক চিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। স্বাধীনতার সময় মাথাপিছু আয় পশ্চিমবঙ্গেই ছিল সবচেয়ে বেশি। উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের থেকে আয়তনে তিন গুণ বড় উত্তরপ্রদেশের পরেই ছিল তার স্থান। ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল সর্বপ্রথম। শিক্ষিতের সংখ্যায় কেরলের পরই ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু দুটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। ভারত সরকারের অবহেলায় কলকাতা বন্দরের অবনতি ঘটলে, ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ অন্য রাজ্যগুলির থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। কৃষির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ক্রমশ ব্যাহত হয়। এই দশকের শেষ থেকেই শুরু হয় সারা রাজ্যে চূড়ান্ত খাদ্য সংকট। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুর চাপে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ জর্জরিত হয়ে ওঠে। সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্থনীতিকে ক্রমশ দুর্বলতর করে তোলে। পাশাপাশি ভারত সরকারের 'রাজকোষ সংক্রান্ত নীতি'র ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবঙ্গ। রাজস্ব বন্টনে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কমে যায় পশ্চিমবঙ্গের অংশ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, বা বলা যায়, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে গঠিত হল বাংলার প্রাদেশিক সরকার। এই সরকার বিনা বিচারে আটকের নিরাপত্তা আইন পাশ করে। এই আইনের প্রতিবাদে শুরু হয় প্রবল গণ-প্রতিবাদ। বিধানসভার সামনে প্রতিরোধ করে শুরু হয় আইন-অমান্য, '৪৭-এর ১০ সেপ্টেম্বর। পুলিশ গুলি চালালে একজন নিহত হয়। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "এইভাবেই স্বাধীন দেশে কংগ্রেস সরকারের শাসন ব্যবস্থার সূচনা হল। সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক জনগণের উপর আক্রমণ শুরু হলো।"[১৬] কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে লাগল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরাও এই আন্দোলনগুলিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গরমিল নিয়ে শেষ হয়ে গেল ১৯৪৭। '৪৮-এর শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ডঃ বিধান চন্দ্র রায় (২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। কলকাতায়

মণিকুন্তলা সেনের কথায়, —"দেশ স্বাধীন হবার অল্প কিছুদিন পরে, '৪৭ সনের শেষের দিকে, কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড রণদিভের উদ্যোগে পার্টি নীতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো। ....এই নতুন নীতির সার কথা হলো : 'কংগ্রেস সরকার পুরোপুরি স্বাধীন নয়। এ সরকার একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে আছে। এই জোট থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থাৎ এ আজাদী ঝুটা।" মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ১৮৫।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত মেয়েরা। মেয়েদের শিক্ষা এবং সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যও বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হত। এরপরই ১৯৪৮-র মার্চ

মাসে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হল। তারা প্রচার করছিল, 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়'—দুশো বছরের পর পাওয়া স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। পার্টি বেআইনী

"১৯৪৮ সাল, কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হলো। এর সঙ্গে বহু সংগঠনকেও বেআইনী ঘোষণা করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল শাসক পার্টি ও সরকারের নির্যাতন। বেশির ভাগ প্রথম সারির নেতা ও নেত্রীরা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। ১১ বছরের কিশোর থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাকে পর্যন্ত ধরা হলো। পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলখানা ভর্তি হয়ে গেল।" মমতা সেন, 'হারানো দিনগুলি', একসাথে, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ১৫৫।

ঘোষিত হবার পরই 'বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়'। সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। কমিউনিস্ট পার্টিরই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা ছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। নতুন কর্মসূচী নিয়ে শুরু হল বন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিউনিস্ট মেয়েদের নেতৃত্বে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী রেনু চক্রবর্তীর লেখায় এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"১৯৪৮-এর ২৬শে মে ৮০ জন মহিলা মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যায়। তাদের দাবি ছিল রাজনৈতিক ও বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি। এই ৮০টি মহিলার মোকাবিলা করবার জন্য ছুটে এল পুলিশের গাড়ী, বেতারের গাড়ী, খোলা বন্দুক হাতে সার্জেন্ট আর একদঙ্গল পুলিশ আর সওয়ারী পুলিশ। মেয়েরা বসে পড়ল রাস্তায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর দপ্তরগুলি থেকে বেরিয়ে এল হাজারো মানুষ। সমস্ত এলাকাটা রাগে যেন অগ্নিবর্ণ হয়ে গেল। এদের পেছনে ধাওয়া করল পুলিশ।"[১৭] পুলিশ যখন কোনভাবেই লাঠি চার্জ করেও মেয়েদের সেখান থেকে সরাতে পারল না, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে লাগল, মেয়েরা তাও সহ্য করল। সন্ধ্যেবেলায় কংগ্রেস নেতা কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সরকারের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস পেয়ে মেয়েরা চলে যান সেখান থেকে। এই বিক্ষোভের ফলে নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেন্ট বেরোল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বেআইনী ঘোষিত হল। সভানেত্রী সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক মহিলা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী মঞ্জুশ্রী দেবীও গ্রেপ্তার হলেন। সমিতির পত্রিকা 'ঘরে-বাইরে' বাজেয়াপ্ত হল।

বন্দী মুক্তি আন্দোলনের অপরাধে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' বেআইনী ঘোষিত হয়ে নেত্রীরা কারারুদ্ধ হলে, তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন বিনা বিচারে বন্দীদের মায়েরা—গড়ে তোলেন 'মাতৃসমিতি'। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী ইরা শর্মার স্মৃতিচারণে 'মাতৃসমিতি' গড়ে ওঠার কথা পাওয়া যায়—"স্বাধীনতার পর ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হলে বহু কর্মীকে আটক করল কংগ্রেস সরকার। জেলের মধ্যে কমরেডরা যখন ৬০ দিন ব্যাপী অনশন ধর্মঘট করেছিলেন বিভিন্ন অবিচারের বিরুদ্ধে, তখন আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেদের মুক্তির জন্য মায়েদের কাছে আবেদন করি—যেন তারা আমাদের মিছিলে সামিল হন। তখন একটি মাদার কমিটিও তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে এইসব মহিলারা আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন।"[১৮] মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা চিঠি দেন এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক দিন ১৯৪৯-র ২৭ এপ্রিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ডাকে বিনা বিচারে বন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে একটি সভা হয় ভারতসভা হলে। সভানেত্রী অনিলা দেবীর বক্তৃতা শেষে সেখান থেকে একটি মিছিল করে মেয়েরা এগিয়ে যেতে লাগলেন। কলেজ স্ট্রীট, বৌবাজার মোড়ের কাছাকাছি

আশুতোষ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন সেই সভা এবং মিছিলে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে—"১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আহ্বানে ভারত সভা হলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সভা আহ্বান করা হয়। তখন কলকাতা শহরের রাস্তায় ১৪৪ ধারা। ঠিক হয় সভার শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বার করার। আমি আর ছায়া তো ফেস্টুন নিয়ে আগেই তৈরি হয়ে রয়েছি।

সেদিন ভারত সভা ঘরের চারদিকে বৌবাজারের রাস্তা জুড়ে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। তাদের সঙ্গে ছিল গুণ্ডারা। সভাঘরের মিটিং-এর দু'শো মেয়েকে ঠেকাবার জন্য হাজার হাজার পুলিশ ও গুণ্ডাদের মোতায়েন করেছিল তৎকালীন কংগ্রেসী সরকার। অত সংখ্যায় পুলিশ দেখে স্বভাবতই মেয়েরা বেশ ঘাবড়ে যায়। মেয়েদের চোখেমুখে প্রচণ্ড ভয়ের চাপ। এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমাদের অনিলাদি (অনিলা দেবী) এমন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন যে মুহূর্তের মধ্যে ভয়ডর বিলীন হয়ে গেল। অনিলাদি বক্তৃতা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন আর একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে। মেয়েরা হুড়মুড় করে রাস্তায় নেমে পড়লেন মিছিল করে। আর সেই মিছিলের অগ্রভাগে আমি এবং ছায়া ফেস্টুন হাতে। কিছুটা যেতেই প্রচণ্ড গুলি আর বোমার আওয়াজ। আমরা তখন ছুটছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখলাম কয়েকজন মহিলা রাস্তায় লুটিয়ে পড়লেন।" সেখান থেকে কিছুক্ষণ চীনা দোকান ও গির্জার মধ্যে লুকিয়ে থেকে রাস্তা ফাঁকা হলে বিমান দত্তের মৃতদেহ কয়েকজন মিলে বহন করে আর.জি.কর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী তাঁদেরই সঙ্গী ডঃ ইলা মিত্র (বসু)র সাহায্যে সেখানে যাবার অনুমতি পান। "ইলাদি বললেন, 'চল দেখি কারা কারা বেঁচে আছে, না আছে।' পর পর বেডগুলো সাজানো। প্রতিভাদির একখানা হাত মাংসহীনভাবে ঝুলে রয়েছে। মৃত্যু অনেক আগেই হয়েছে। অমিয়াদির মাথার খুলি ভেঙে ঘিলুগুলো বালিশে পড়ে আছে। গীতা সরকারের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ আর লতিকা দিকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। নার্স বললে 'বাঁচার কোন আশা নেই।' যন্ত্রের মত ঐ দৃশ্য দেখলাম—কোনও অনুভূতির বালাই ছিল না—কেমন যেন একটা অদ্ভুত অসার মনের অবস্থা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পরনের কাপড়টা বিমান দত্তের রক্তে লাল, সারা শরীরে রক্তের গন্ধ।" বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার স্মৃতিতে সাতাশে এপ্রিল', কালান্তর, ১৪ বৈশাখ, ১৪০৩।

পৌঁছতেই পুলিশের গুলি ছুটে এল মেয়েদের লক্ষ্য করে। মৃত্যু হল কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মহিলা সদস্য লতিকা সেন এবং প্রতিভা গাঙ্গুলী, গীতা সরকার, অমিয়া দত্তর। রেণু চক্রবর্তী বলেছেন, "সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মেয়েদের এমন ঠাণ্ডা রক্তে খুন এর আগে আর হয়নি

"সেই মিছিলের শরিক হিসাবে আমি সেদিন নারীমুক্তির পতাকাটা ঠিকভাবে তুলে ধরার মুহূর্তেই দেখলাম প্রতিভাদি'র দেহটা রাস্তায় লুটিয়ে পড়লো—টুকরো আঙুলগুলো রাস্তায় নড়ছে। সে দৃশ্য আজও ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে শুয়ে শুয়ে ডানদিকের গলির ভিতর দিয়ে উঠে দেখি এক যুবকের মৃতদেহ রক্তে ভাসছে।"' মমতা সেন, হারানো দিনগুলি, একসাথে, বৈশাখ, ১৪০১, পৃঃ ১৫৮।

কলকাতার বুকে। এদের অপরাধ এরা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চেয়েছিল।"[১৯] ভারতসভা হলের এই সভায় বক্তা ছিলেন অনিলা দেবী। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেই দিনটির স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি—" '২৭ এপ্রিল—১৯৪৯ সাল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আহ্বানে কলকাতার ভারতসভা হলে সমাবেশ, সবার সঙ্গে আমিও উপস্থিত সেখানে। দাবি : বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। সমাবেশ শেষে শুরু হবে মহিলা মিছিল। নেত্রীদের নির্দেশ, সমাবেশের সামনে বক্তব্য রাখতে হবে আমাকেই।

বিদেশী শাসন মুক্ত হয়েছে আমাদের দেশ তবু কেন বিনা বিচারে আটক আইন বহাল থাকবে? 'বিচারের বাণীর নীরবে নিভৃতে কান্না রোধে কেন মা-বোনেরা সংকল্পবদ্ধ হবেন না? প্রকাশ্য রাজপথ তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবিতে কেন মুখর হয়ে উঠবে না, মূলত এই আবেদনই আমার ছিল। দেখলাম সকলেই যেন সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠেছেন, মিছিল প্রস্তুতি নিচ্ছে হলের প্রান্তদ্বারে।

এই সময়ে এক শ্রমিক নেতা এসে বললেন, মুসলিম ইনস্টিটিউটে ট্রাম শ্রমিক ভাইদের এক সভা হচ্ছে। তাঁদের এই মহিলা মিছিলে যোগ দেবার আবেদন জানাতে একজন মহিলা বক্তা চাই। আমার উপর দায়িত্ব পড়লো। মিছিলের সকলের সঙ্গে এক সঙ্গে পা মেলাবো না ভেবে মনটা সায় দিচ্ছিল না। আবেদন করলাম, গ্রাহ্য হলো না, যেতেই হলো। যাবার পথে লতিকাদির সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করলেন, 'যান কোথায়?' হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, 'আপনি যান গুলি খেতে, আমি চলি মুসলিম ইনস্টিটিউটে। 'তিনিও হেসে বললেন, 'তা যদি হয় দেখবেন সবাই মিলে আমার অনাথ ছেলেটিকে।" তারপর মুসলিম ইনস্টিটিউটের সভায় আবেদন পেশ করতে করতেই খবর পেলেন মিছিলে গুলি চলেছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটলেন বৌবাজারের দিকে। "বৌবাজারের মোড় তখন মিলিটারি-পুলিস পাহারায় অবরুদ্ধ প্রায়। শুনতে পেলাম, গুরুতর ভাবে আহত লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া ও গীতা। আহতদের পুলিস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। অব্যক্ত ব্যথায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল! প্রতিভা, অমিয়া, গীতা—পরিচিত সবাই। আর লতিকাদি যে বড্ড কাছের মানুষ। একই বিদ্যালয়ের সহকর্মী। তাকে যে গুলি খাবার কথা আমিই বলেছিলাম। তার ছোট্ট সমর যে বাড়িতে তাঁর ফেরবার পথ চেয়ে।"[২০] মণিকুন্তলা সেন তখন মেদিনীপুরে জেলে বন্দী। জেলার রাউন্ডে গেলেন হাতে দু'খানা খবরের কাগজ নিয়ে। কাগজ তাঁকে দেওয়া হতো না। কিন্তু সেদিন "জেলার হাতে করে কাগজ দু'খানা এনে বললেন, 'আপনার জন্য খুব দুঃসংবাদ আছে কাগজে—তাই নিয়ে এলাম।' কাগজখানা মুহূর্তে পড়া হয়ে গেল। জেলার একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। কাগজে লতিকা, প্রতিভা, গীতা, অমিয়ার মৃতদেহের ছবি। ঘটনাটা ২৭ শে এপ্রিল ঘটেছিল। সেদিন বন্দীমুক্তির দাবীতে মেয়েদের মিছিল করতে গিয়ে ওরা নিহত হয়। আমি শুধু ছবির দিকে চেয়েই আছি। কখন যে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল খেয়াল নেই। মনে পড়ছিল, এই সেই লতিকা—যে আমার হাত ধরে প্রথম পার্টি বন্ধু বলে কাছে টেনেছিল। এই সেই লতিকা—যে আমার তখনকার দিনের চালিকাশক্তি ছিল, এই সেই লতিকা—যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।"[২১]

২৮ তারিখ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজবন্দীরা অনশন শুরু করেন। এদিকে প্রশাসন ও পুলিশের বাধা নিষেধের মধ্যে অত্যন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হল আত্মরক্ষা সমিতির পঞ্চম সম্মেলন। কৃষক এবং শ্রমিক মেয়েরাও এতে যোগ দিলেন। এই সম্মেলনে শোষণ এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সিদ্ধান্তই ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতার আগে ’৪৬-এ কৃষকদের উপর জমিদার জোতদারের শোষণের বিরুদ্ধে যে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দেশ স্বাধীন হবার পরও চলেছিল সেই কৃষক

কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, ‘সংগ্রামী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষক রমণীরা যেভাবে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেন ও বহু কৃষক রমণী যেভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন তার নজির ইতিহাসে বিরল। উল্লেখযোগ্য যে তখন সারা ভারতেই চলছিল ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রাম ও গণ সংগ্রাম। ইতিপূর্বে মালাবারের কায়ুর শহীদদের আত্মদান, পুন্নাপ্রার ভায়েলারের বীরত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রামের পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার কৃষক আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও খেত মজুর নারীদের মধ্যে প্রসারিত হতে থাকে গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন-সংগঠন।” কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।

সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলন। স্বাধীন দেশেও কৃষকদের ন্যায্য দাবী স্বীকৃতি পায়নি। পরিবর্তে জোরদার হল পুলিশী ব্যবস্থা।

“১৯৪৮-৪৯ সাল। কৃষকরা ফসলের ভাগের ন্যায্য দাবি জোতদারকে মেনে নেবার জন্য যখন সরকারের কাছে দাবি জানালো, বিধান রায়ের সরকার জোতদারকে দাবি মানতে বাধ্য করার পরিবর্তে বিরাট সংখ্যক পুলিশ বাহিনীকে পাঠালো আন্দোলন দমনের জন্য। পুলিশ বীভৎস আক্রমণ চালাল ২৪-পরগণার ডোঙ্গাজোড়া গ্রামের কৃষকদের উপর। জমিদার জোতদারের দল পুলিশের সহায়তায় ঝাঁপিয়ে পড়লো কৃষক খেতমজুরদের ওপর। আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বাধ্য হলো কৃষকরা। কৃষক রমণীরাও বীরাঙ্গনার ভূমিকা নিয়ে কৃষক ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ালো। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাস। পুলিশ বেপরোয়াভাবে গুলি চালালো। ঝাঁপিয়ে পড়লো হিংস্র পুলিশ। সেদিন সোনালী ধান রক্তে লাল হয়ে উঠলো। একজন ৪০/৪৫ বছরের কৃষক ও দু’জন কৃষক বধূর রক্তে।” প্রভা চ্যাটার্জী, তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলি, একসাথে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০-১০১।

জোতদার, জমিদাররা পুলিশের সাহায্যে জমির ফসল কেটে ঘরে তুলতে লাগল কৃষকদের বঞ্চিত করে।

১৯৪৮-৪৯ এ পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল কৃষক আন্দোলন। হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করল। গ্রামে গ্রামে বসল পুলিশ পিকেট। পুলিশের নির্মম অত্যাচার শুরু হল কৃষকদের উপর। বহু কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হল। এই জমির লড়াইয়ে কৃষক মেয়েদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই আন্দোলনে কৃষক মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল শহরের শিক্ষিত সচেতন অ-কৃষক মেয়েরা। মূলত কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদেরই মহিলা সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা

শহর ছেড়ে দুই বাংলার গ্রামগুলিতে গিয়ে কৃষকদের, বিশেষ করে কৃষক পরিবারের মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। এদেরই সহায়তায় কৃষকরা শুধু তেভাগার দাবিতেই নয়, নিজের জমির জন্য, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কমিউনিস্ট পার্টিও কৃষকদের সচেতন করে তোলে, বাঁচার অধিকার আদায় করতে শেখা। তাদের পরিবারের মেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলে গ্রামে গ্রামে মহিলা সংগঠন। পুলিশ ও জমিদার-জোতদারের চরের চোখ এড়িয়ে গোপনে তারা এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে মিটিং করে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কৃষক মেয়েরাই এগিয়ে আসেন, মহিলা সমিতির সভ্য হয়। অনুভব করে এত কষ্টের ফসল বাঁচানোর জন্য, সারা বছরের রসদ এবং তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য স্বামী, ছেলে বা পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যের পাশাপাশি তাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। কৃষক মেয়েরা তখন সশস্ত্র পুলিশের মুখোমুখি হবার জন্য নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলল। মেয়েরাই সকলে মিলে রক্ষা করত সারা গ্রামের ফসল, আড়াল করত পরিবারের পুরুষদের, আশ্রয় দিত শহর থেকে আসা রাজনৈতিক সংগঠকদের। পুলিশের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে অকাতরে তারা প্রাণ দিত, তবু হার মানত না। নিজেদের গোপন সঙ্কেত শাঁখ বাজিয়ে বা উলু দিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে তারা বিপদের বার্তা ছড়িয়ে দিতেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। মহিলা আত্মরক্ষা কর্মীর মেয়েদের লেখায় উঠে এসেছে কৃষক অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী কৃষক মেয়েদের কথা। তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রভা চ্যাটার্জীর স্মৃতিতে, "১৯৪৮-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার মাশিলা গ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত হন দু'জন কৃষক রমণী ও চারজন কৃষক ভাই। শহীদদের নামে শপথ নিয়ে কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো গ্রামে গ্রামে। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো কংগ্রেসী সরকার। ১৯৪৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটাল গ্রামে ভরদুপুরের নির্জনতায় জমির সোনালী ফসল সব কেটে নিলো জমিদার সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায়। খবর পৌঁছে যাবার সাথে সাথে কৃষক ঘরের মা-বোনেরা শাঁখ বাজিয়ে জানিয়ে দেয় শত্রুর আগমন-বার্তা, বিপদ-সংকেত। ছুটে আসে কৃষক বধূ, মা-বোনের দল গড়ে ওঠে পুরুষ রমণীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের দুর্গ। ঘিরে ধরে পুলিশদের নারী বাহিনী। পুলিশরা তখন ছলনার আশ্রয় নেয়, বলে—'তোমাদের ধান আমরা ফেরৎ—একটু খাবার জল দাও।' গ্রামে মা-বোনেরা ছলনা বোঝে না—তৃষ্ণার্তকে জল দেবার জন্য ঘর থেকে ঘটি এনে পুকুরে ছোটে জল আনতে—পুলিশ ইত্যবসরে গুলি চালায়—লুটিয়ে পড়ে প্রিয় কৃষক নেতা শহীদ সাধন বাগ। নব বিবাহিতা চোদ্দ বছরের কিশোরী বধূ মনোরমার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ছুটে গিয়ে চেপে ধরে হত্যাকারী পুলিশের বন্দুকের নল—নরপশুর দল গুলি চালায় মনোরমার বুকে—শপথের বজ্রমুষ্টি উর্ধ্বে তুলে ধরে—আহ্বান রেখে যায় মহিলা আন্দোলনের কাছে শ্রেণী শত্রুর ক্ষমা নাই। তারপর শহীদ হলেন গর্ভবতী মাধুবালা। মাথায় বন্দুকের কুঁদো মেরে হত্যা করে ১০ বছরের মেয়ে যশোদাময়ীকে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাঁশরীর মা, পঙ্কুর স্ত্রী, আরও চারজন কৃষক রমণী।"[২২] রেণু চক্রবর্তীর লেখাতেও কৃষক অভ্যুত্থানে কৃষক মহিলাদের অবদানের কথা জানা যায়। '৪৮-এর ৩১ অক্টোবর কাকদ্বীপের বুধাখালি গ্রামে চাষীরা ধান কেটে নিজেদের

মরাইতে তুললে জমিদারের ডাকে পুলিস এসে কৃষক নেতা কুমার সাহুকে গ্রেপ্তার করে। আশেপাশের গ্রাম থেকে কৃষক মেয়ে পুরুষ এসে যায়। মেয়েরা পুলিশকে ঘিরে ধরে তাদের চোখে ধুলো ছোঁড়ে। পুলিশ গুলি চালালে দুজন পুরুষ এবং অনেক মেয়ে আহত হয় কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে বা হতাহত কাউকে নিয়ে যেতে পারেনি। কাকদ্বীপ থানার চন্দন পিড়ি গ্রামে কৃষকের সঙ্গে পুলিশের লড়াইয়ে মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজন কৃষক মেয়ের

"১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস দক্ষিণ ২৪-পরগণার চন্দনপিড়ি গ্রামে 'নিজের গোলায় ফসল তোলার' আন্দোলনে সামিল হলেন খেতমজুর ও খেতমজুর রমণীর দল। এদিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পুলিস গ্রামে ঢুকে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালালো। অপর দিকে কৃষক সমিতির আহ্বানে স্লোগান উঠলো—'ধান গোলায় তোল, গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করো।' কৃষক রমণীরা এগিয়ে এলেন—আন্দোলনের পুরুষ কর্মীদের রক্ষা করার জন্য। তেভাগার লড়াই শুরু হলো—পুলিস বেপরোয়া গুলি চালালো—শহীদ হলেন সরোজিনী, উত্তমা, বাতাসী, গর্ভবতী অহল্যা, সূর্যমণি। নরেনের স্ত্রী ও একজন বৃদ্ধ কৃষক।" 'প্রভা চ্যাটার্জী, তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলিতে, পৃঃ ১০১-০২।

—সরোজিনী, উত্তমা, বাতাসী, সূর্যমনি এবং আট মাসের গর্ভবতী অহল্যার মৃত্যু হয়। গুলি লাগে অহল্যার তলপেটে, পুলিসের সঙ্গীন চিরে দেয় তার পেট, বেরিয়ে আসে অজাত

অহল্যার অবর্ণনীয় মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ এর 'পরিচয়' তে (১৩৫৭, আশ্বিন) সলিল চৌধুরী লেখেন অসাধারণ 'শপথ' কবিতাটি—

'কাকদ্বীপ!
শোন কাকদ্বীপ—সেই চন্দন পিঁড়ি শ্মশানে
যেদিন আমরা অহল্যা মাকে
চিতাশয্যায় তুললাম
(আহা!) শপথ আগুনে দাউ দাউ জ্বলা
পাঁজরের চিতাশয্যায়
কলজে জ্বালিয়ে ফেললাম।
কত ভাষা ছিল প্রাণের ছন্দে
জীবনের গীতিলাস্যে
কত আশা ছিল ভ্রূণের স্বপ্নে
শিশুদের কলহাস্যে
এতটুকু ক্ষেত ছোট বেড়া ঘেরা
গভীর বাধাহারা
একটুকু ঘর সকল ঘরের
আনন্দ দিয়ে ভরা
সকলের ভরা খামারে নিজের
অন্নটি খুঁজে পাওয়া

সকল মায়ের চোখ দিয়ে নিজ
বাছাটির প্রাণ চাওয়া।
(হায়!) সেদিন আমরা হু হু করে কেঁদে
চোখের নৌকো ভাসিয়ে
হতাশায় চরে আছড়ে পড়েছি
কেঁদে শুধায়েছি—মাগো।
এমনি করে কি জীবনের যত
মূল্যের বিনিময়ে
বার বার কালো মৃত্যুকে হবে কেনা?
মৃত্যুর দামে কবে শোধ দেবো
জীবনের যত দেনা?
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিলো।
সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ
বৃষ্টির বেদনাকে
বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিলো।
এই পৃথিবীর আলো বাতাসের
অধিকার পেয়ে পায়নি যে শিশু
জন্মের ছাড়পত্র—
তার দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে
কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি
কোন অঙ্কুর মাথাও তোলেনি
প্রজাপতি যত আরো একদিন
গুটিপোকা হয়েছিল,
সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে
হরতাল হয়েছিলো।
তাই—
গ্রাম নগর
মাঠ পাথার
বন্দরে
তৈরি হও।
কার ঘরে
জ্বলেনি দীপ
চির আঁধার
তৈরি হও।..... ”

শিশুর অপুষ্ট একটি হাত। ১৯৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে সন্ধ্যার অন্ধকারে হুগলীর ডুবিরভেড়ি গ্রাম আক্রমণ করে পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী। গ্রামের মেয়েদের শাঁখের আওয়াজে জেগে উঠল সারা গ্রাম। সশস্ত্র পুলিশের সামনে পথ আটকে দাঁড়াল সমস্ত কৃষক মেয়ে বৌরা। পুলিশকে তারা 'গ্রাম তল্লাশে' সকালে আসতে বলল, রাতে তারা কিছুতেই পুলিশদের গ্রামের ভিতর ঢুকতে দেবে না। পুলিশের ভয় দেখানোতেও যখন মেয়েরা পথ ছাড়ে না, গুলি চালাতে শুরু করে তারা। মারা যান পুষ্প মাঝি, পাঁচুবালা ভৌমিক, দাসীবালা মাল, কালীবালা পাখিরা, মুক্তকেশী মাঝি, ভদ্রেশ্বর সামন্তের মা, রাজকৃষ্ণের মা।

রাণী দাশগুপ্ত বলেছেন, "........................নারীমুক্তি আন্দোলন এতদিন নগরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারী সমাজের মধ্যে। বাংলার গ্রামের নারী সমাজকে প্রথম জাগিয়ে তুলেছে তেভাগা আন্দোলন। কৃষক-নারী এই আন্দোলনে নিজেরা অংশগ্রহণ করেছেন, প্রচারপত্র বিলি করেছেন, ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, বক্তা হিসাবে সাধারণ কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ধান কাটার সময় লাঠি হাতে জমি ঘিরে পাহারা দিয়েছেন, ধান পাহারা দিয়েছেন, গ্রাম পাহারা দিয়েছেন। গ্রামে পুলিশ পিকেট থাকাকালে হাটে সওদা করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। বাড়ির পুরুষদের পুলিশ গ্রেপ্তার করতে এলে এই বীরাঙ্গনারা ঝাঁটা, বঁটি, লাঠি, গাইন নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করেছেন। গ্রেপ্তার হয়ে অকথ্যভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন। পুরুষরা গ্রেপ্তার বা পলাতক হলে ঘরবাড়ি ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ফলে এখানে মেয়েরা সামাজিক অধিকারও অর্জন করেন। স্বামীর মারপিট অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেয়েরা সরাসরি এসে তেভাগা কমিটির কাছে নালিশ জানাতেন। এইভাবে কৃষক সমিতির অঞ্চলগুলিতে নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্য অনেকখানি দূর হয়েছিল। এমনকি স্বামীর ইচ্ছে নয় কিন্তু স্ত্রী কৃষক সভায় নালিশ করলে মীমাংসা হয়েছে নারীর পক্ষে।" রাণী দাশগুপ্ত, '৪৮-'৪৯ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন, কালান্তর, ২০.১.১৯৯৭, ৬ মাঘ, ১৪০৩।

এই টুকরো টুকরো ছবিগুলি গ্রামের অশিক্ষিত, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নারীর সচেতন হয়ে ওঠারই আভাস দেয়। তারা ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠেছিল। নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে স্বামী ছেলে বা অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়ের সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সহজাত আশ্রয়দাত্রীর অনুভূতি থেকে তারা এগিয়ে এসেছিল সামনের সারিতে। তাদের বহু কষ্টে বোনা জমির ফসল, তাদের স্বামী পুত্র পরিবারের সারা বছরের পেটের ভাত রক্ষা করতে তারা এগিয়ে এল। আধুনিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ পুলিশের সঙ্গে তারা সমানে সমানে লড়াই করেছে, গুলি খেয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে, তবুও হারেনি বরং তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ, ঝাঁটা, বঁটি, দা, কুড়ুল, লঙ্কার গুঁড়োর আক্রমণে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। প্রাণ দিয়ে তারা স্বামী-পুত্রকে রক্ষা করেছে, ফসল আগলেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কৃষক নারীই এই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল। এই লড়াই মুসলমান মেয়েদের পর্দার আড়াল থেকে বের করে এনেছে, তারা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন

হয়েছে, স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। সর্বোপরি জমির লড়াই সার্বিকভাবে হয়ে উঠেছে তাদের জীবনের লড়াই, অস্তিত্বের সংগ্রাম। কৃষক মেয়েদের এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই, কিন্তু স্বাধীনতা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। মহাজন, জোতদার, জমিদারের ভয়ঙ্কর শোষণের কারাগার থেকে তারা মুক্তি পায়নি, তাই এই লড়াই চলেছিল স্বাধীনতার পর দুই বাংলাতেই। পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক বিদ্রোহের কথা উঠে এসেছে ভানু দেবী, অপর্না পাল চৌধুরীর স্মৃতিকথায়, নাচোলের কৃষক নেত্রী ইলা মিত্রের লেখায়। ভানুদেবী চিরকালের মত পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন পুলিশের অত্যাচারে। জেল থেকে বেরিয়ে যে বিছানায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই শয্যাই হয়ে

> *"........ক্রমশই আমার নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হয়ে গেলে পুলিস প্রস্তাব দিল, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করব না— এই মুচলেকা দিলে পুলিস আমাকে মুক্তি দেবে এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেবে। ঘৃণাভরে আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। শরীরের অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তখন পুলিস বিনা শর্তে চট্টগ্রাম জেল থেকে ১৯৫৩ সালে আমাকে মুক্তি দেয়।*
>
> *তারপর আমার দাদা বলরাম আমাকে কলকাতার বিজয়গড়ের বাসায় নিয়ে এলেন চিকিৎসার জন্য। সেদিন যে খাটের উপর যে বিছানায় এসে শুয়েছিলাম আজ প্রায় একত্রিশ বছর সেই একই বিছানায় শুয়ে আছি একান্ত অসহায় অবস্থায়।" —ভানু দেবী, 'স্মৃতিচারণা', একসাথে, বৈশাখ ১৪০১। পৃঃ ২৭।*

উঠেছে তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী। পেটে পুলিশের বুটের আঘাতে অজাত সন্তানের রক্তে ভেসে গেছেন সন্তানসম্ভবা অপর্ণা পালচৌধুরী কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, তার ওপরও পড়েছে পুলিসের লাঠি। তাঁর নিজের কথায়, "আমার পেটে বুটের লাথি মেরে আমার গর্ভের সন্তানকে শেষ করে দিয়েছে। আমার কাপড় রক্তাক্ত হয়ে গেল। হাঁটতে পারছি না, বসতে পারছি না। এই অসামর্থ্য শত্রুদের বুঝতে দিলাম না। সোজা হয়ে বসে রইলাম। বসা অবস্থায় আবার আমাকে মারতে শুরু করলো। একজন সিপাই তার বন্দুকের পেছন দিয়ে কোমরে জোরে আঘাত করে, আমি প্রায় এক ফুট উপরে ওঠে আবার বসে পড়লাম। সকলেই আবার চিৎকার আরম্ভ করলাম। আবার মারছে দেখে চারিদিকের লোকগুলো খিলখিল করে হাসছে। তাদের হাসি গল্পের পিশাচের হাসি বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জলও বের হয়নি, কেবল ক্রোধ ঝরে পড়ছিল। কিন্তু আমরা তখন বন্দী, করার কিছু নেই।"[২৩] ইলা মিত্র বলেছেন, —"গরীবের কৃষক আন্দোলনেও কখন সুড়ি সুড়ি ঢুকে পড়েছিলাম টেরও পাইনি। রাজনৈতিক কর্মীর সিদ্ধান্ত নিয়ে নেমে পড়ার পারিবারিক প্রতিকূলতাকে কি সাধ্য আমি নিজে ছিঁড়ব? কিন্তু দেশের বানই ঘরকে ভাসিয়েছিল।"[২৪] বিয়ের আগে থেকেই ইলা মিত্র কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। বিয়ের পর জমিদার বাড়ির বৌ হয়ে প্রায় বন্দী জীবন কিন্তু কমিউনিস্ট স্বামী রমেন মিত্র জমিদার বাড়ির ছেলে হয়েও কৃষক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। তাঁদেরই আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন কৃষক আন্দোলনের মধ্যে। নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন রমেন মিত্র ও ইলা মিত্র। নাচোলের 'তেভাগা' আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে

তাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন ইলা মিত্র, হয়েছিলেন তাদের 'রাণী মা'। সেখান থেকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে সীমান্ত পেরনোর সময় তিনি ধরা পড়েন পাকিস্তানি পুলিশের হাতে। তিনি জানিয়েছেন, "আমাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগের সত্যাসত্য আলোচনা বৃথা। তবে একথা নিশ্চিত চারজনের একটি পুলিশ পার্টি জোর করে খাজনা আদায়ের জন্য গ্রামে ঢুকে আর ফিরে এল না। পুলিশ কোন দিন তাদের লাশও খুঁজে পায়নি। গ্রামের গরীব শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন দমিত হয়, তখন তার বিস্ফোরণের ইতিহাস কিন্তু নতুন নয়।"[২৫] কি অমানুষিক যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেছিলেন পুলিশের অত্যাচারে, তাঁর জবানবন্দীতে তিনি লিখেছেন। শেষে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে চিরকালের জন্য তাঁর কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ইলা মিত্রের জবানবন্দী—

How Humanity Attacked Under
Liakat—Nurul Amin Regime?

Below is the statement of Sm. Ila Mitra made before the Court at Rajshahi with regard to inhuman treatment meted out to a lady, only because she holds a political opinion other than that of Liakat-Nurul Amin Feudal class :—

Sm. Ila Mitra in her statement pleading not guilty to the charges said,

I know nothing about the case. On 7.1.50 last I was arrested in Rahamanpur and taken to Nachole the next day. The police guards assaulted me on the way and thereafter I was taken inside a cell. The S. I. threatened to make me naked if I did not confess everything about the murder. As I had nothing to say, all my garment were taken away and I was imprisoned inside the cell in stork naked condition.

No food was given to me, not even a drop of water. The same day in the evening the sepoys began to beat me on the head with butt ends of their guns, in the presence of the S. I. I was profusely bleeding through the nose. Afterwards my garments were returned to me and at about 12 midnight I was taken out of the cell and lead possibly to the quarters of the S.I. but I was not certain.

In that room where I was taken they tried brutal methods to bring out confession. My legs were pressed between two sticks, and the people around me was being administered a pakistani injection. When this torture was going on they tied my mouth with a napkin. They also pulled off my hairs, but as they could not force me to say anything. I was taken back to the cell carried by the Sepoys, as after the torture it was not possible for me to walk.

Inside the cell again the S. I. ordered the Sepoys to bring four hot eggs, and said, now she will talk. Thereafter four or five Sepoys forced me to lie down on my back, and one pushed one hot egg through my private parts. I was feeling like being burnt with fire and became unconcious.

When I came back to my senses in the morning of 9.1.50. the S. I. and some Sepoys came into my cell and began to kick me on the belly with boots on. Thereafter a nail was piereed through my right heel. I was then lying half conscious, and heard the S. I. muttering we are coming again at night, and if you do not confess, one by one the sepoys will ravish you. At dead of night, the S. I. and his sepoys came back and the threat was repeated. But as I still refused to say anything, three or four men got hold of me, and a sepoy actually began to rape me, shorty afterwards I became unconcious.

Next day on 10.1.50., when I became concious again, I found that I was profusely bleeding and my cloth was drenched in blood. I was in that state taken to Nawabganj from Nachole. The sepoys in Nawabganj jail gate received me with smart blows.

I was at that time in a prostate condition and the Court Inspector and some Sepoys carried me to a cell. I had high fever then and I was still bleeding. A doctor, possibly from the Govt. Hospital at Nawabganj had noted the temperature of my body to be 105°. When he heard from me of the profused leeding I had he assured me, I would be treated with the help of a women nurse. I was also given some medicines and two pieces of rugs.

On 11.1.50 the woman nurse of the Govt. Hospital examined me. I do not know what report she gave about my condition. After she came the blood stained piece of cloth I was wearing was changed for a clean one. During all this time I was in a cell of the Nawabganj P. S. under the treatment of a doctor. I had high fever and profuse bleeding and was unconcious from time to time.

On 16.1.50 a stretcher was brought before my cell in the evening and I was told that I would have to go elsewhere for examination. On my protest that I was too ill to move about, I was struck with a stick and forced to get on the stretcher after which I was carried on it to another house. I told nothing them, but the sepoys forced me to sign a blank paper. I was at time in a semi-concious state with high fever. As my condition was going worse I was next day transferred to the Nawabganj Govt. Hospital and on 21.1.50 when the state of my health was still very precarious, I was brought from Nawabganj to Rajshahi Central Jail, and was admitted to the jail hospital.

I had not under any circumstances said anything to the police, and I have nothing more to say than I have stated above."[২৬]

পঞ্চাশের দশকে বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে কিছু ভূমি সংস্কার আইন হয়। জমিদারি অধিগ্রহণ হল কিন্তু অবস্থার সত্যিই কোন পরিবর্তন ঘটল না। পরিবর্তন যা হচ্ছে আইনী, বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন কার্যকরী হল না—আন্দোলনও চলতেই থাকল।

১৯৫০-র ২৬ জানুয়ারি তৈরি হল ভারতবর্ষের নতুন সংবিধান। নতুন প্রবর্তিত সংবিধানে স্বাধীন ভারতবর্ষ এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। কমলা দাশগুপ্তের কথায়, "১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এসেছে পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাদের শাসনের সংবিধান আজ প্রস্তুত।"[২৭] এই সংবিধানে ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়। স্বাধীন চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাও স্বীকৃত। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। সংখ্যালঘু, তফসিলি ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়।

মণিকুন্তলা সেনের কথায়, "দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এলো। আর এরি সঙ্গে খণ্ডিত পশ্চিম বাঙলায় লাইন দিয়ে এলো 'আমরা কারা—বাস্তুহারা' 'স্লোগানে আকাশ মাথায় করে সর্বস্ব খোয়ানো উদ্বাস্তু মানুষ। ....প্রথমে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, তারপর শিয়ালদা, তারপর ক্যাম্প। নতুন সরকারের সাধ্য ছিল কি ছিল না—তা আমি জানি না, কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা যে অবাঞ্ছিত মানুষের মতোই হয়েছিল, তাতে কোন ভুল নেই। মানুষ যেমন করে হোক বাঁচার চেষ্টা করবেই, বন জঙ্গল কেটে হলেও তারা বসতি স্থাপন করবেই। আদিমকাল থেকে এটাই মানুষের ইতিহাস। অতএব সরকারী দাতব্যশালা নামে শিয়ালদা, ধুবুলিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি বারোয়ারী 'ভিক্ষুকের' ক্যাম্পে যাঁরা থাকতে চাইলেন না, তাঁরা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতায় তাঁদের বসতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। খালি বাড়ি, খালি জায়গা আর পড়ে থাকল না। কত না বন-জঙ্গল কেটে, কত মাটি কেটে, জলাজমি ভরাট করে তাঁরা কুঁড়ে ঘর তুলে নিত্য নতুন জনপদ তৈরি করতে লাগলো।" মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ১৮১।

পঞ্চাশের দশকের সূচনাতেই পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে ভয়াবহ আকার ধারণ করে উদ্বাস্তু সমস্যা। দেশভাগের পর দলে দলে মানুষ চলে আসছিল পাকিস্তান থেকে। পশ্চিমবাংলা, পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে উদ্বাস্তু সমস্যাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। আশ্রয় এবং খাদ্যের সংগ্রামে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা। মেয়েরাই ছিল এই সংগ্রামের পুরোভাগে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যে আশ্রয় নিতে থাকে—"পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে স্থাপিত হল উদ্বাস্তু শিবির। যাঁদের

'বঙ্গীয় পুনর্বসতি প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী ১৯৫০ সালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত ৬১, ৬৭, ৬৯৭ উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতে আসেন।" —অমলেন্দু দে, সাতদশক, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই ১৯৯৩।

কোনো আত্মীয়স্বজন আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অবলম্বন করে কেউ কেউ সাময়িকভাবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছেন, সে সৌভাগ্য যাঁদের হয়নি, তাঁদের সাময়িক আশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছেন ভারত সরকার। লক্ষ লক্ষ মানুষকে তো ঝেড়ে বা মেরে ফেলা যাবে না, সুতরাং দেশ বিভাগের উদ্যোগ যাঁরা করেছিলেন, পরবর্তী অবস্থাকে সামাল দিতে হবে সেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দেরই।"[২৮] সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী '৫০-এর জুলাই মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৬১, ৬৭, ৬৯৭। শিয়ালদা স্টেশনে আশ্রয়হীন মানুষের ভিড় উপচে পড়তে লাগল।

রামকৃষ্ণ মিশন, রেডক্রস সোসাইটি প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্গত মানুষের মধ্যে খাবার, গুঁড়ো দুধ এবং ওষুধ বিতরণ করে। প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে। এখান থেকে উদ্বাস্তুদের রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে, ধুবুলিয়া আশ্রয় শিবির, কাশীপুর ক্যাম্প, এবং অন্যান্য আশ্রয় শিবিরগুলিতে পাঠানো হয়।

অপ্রতিরোধ্য বন্যার স্রোতের মত উদ্বাস্তুর আগমন। তাদের আশ্রয়-খাদ্য-জীবিকা পশ্চিমবঙ্গে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল

স্বাধীনতার পর নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুত পরিবর্তিত ছবিটি ধরা পড়েছে, শান্তিসুধার স্মৃতিকথায়। স্বাধীনতা উপলক্ষে ছাত্রীদের আয়োজিত একটি সভায় তিনি সভানেত্রী হয়েছিলেন। সেখানে 'নবোদিত' ছাত্র নেতা মহীউদ্দিনের বক্তব্যে শান্তিসুধা ঘোষের প্রতিক্রিয়াই এখানে উঠে এসেছে—"মহীউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। সভার আহ্বায়িকাগণকে প্রথম লাইনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেই দ্বিতীয় লাইন থেকে তাঁর সুর বদলাল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন, তাঁদের উদ্বোধন সঙ্গীত নির্বাচনে একটি দুঃখজনক ত্রুটি রয়ে গেছে। তারা ভুলে গেছেন যে, আজ আমরা একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক, আমরা আর ভারতবর্ষের নয়। মেয়েরা আবেগের সঙ্গে গেয়ে গেলেন—

"চল্লিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন"—

কিন্তু আজ কি আমরা চল্লিশ কোটি? আমাদের প্রিয় পূর্ব পাকিস্তান সাড়ে চার কোটি নাগরিক নিয়ে গঠিত। একথা অবশ্যই সত্য যে, "হতে পারি দীন তবু নহি কভু হীন"। কিন্তু আমরা কারা সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আজ নূতনভাবে পরিবর্তিত করতে হবে। চিরাভ্যস্ত গান, চিরাভ্যস্ত ধ্বনিগুলি বর্জন করতে শিখতে হবে। ইত্যাদি।

সমবেত ছাত্রীগণ অবশ্যই স্বীয় ভুলের জন্য লজ্জিত হলেন। কিন্তু আমি অকস্মাৎ মনের কোণে একটি অপ্রত্যাশিত মোচড় অনুভব করলাম। সত্যই তো, মহীউদ্দিন তো কোনো অসঙ্গত কথা বলেন নি, তাঁর নবজাগ্রত দেশপ্রেমের তন্ত্রীতে তো এই চল্লিশ কোটির গৌরব ঘোষণা বেসুরো ঝঙ্কার তুলবেই। তাঁরা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়েছেন, এখনো অখণ্ড ভারতের মাহাত্ম্য কীর্তন কেন? কিন্তু আমার মন যে বেদনায় বিরস হয়ে উঠল। আমি তো ভারতমাতার অখণ্ড মূর্তিকে ভুলতে পারি নি। আন্তর্জাতিক আইনের মাপকাঠিতে আজ আমরা দুটি পৃথক জাতি বটে, কিন্তু যুগ যুগ ব্যাপী ভারতীয় ভ্রাতৃত্বের ঐক্যবোধ তো মুছে ফেলতে পারছি না। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রচণ্ড আঘাতের পর পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে বেশ তো নিজেকে ধীরে-ধীরে মানিয়ে নিতে আরম্ভ করেছিলাম। আমার এই মুসলিম ছাত্রছাত্রীগণকে হিন্দু ছাত্রছাত্রীর মতো একইভাবে ভালোবাসছিলাম। হঠাৎ এই রূঢ় প্রভেদাত্মক চাবুক খেয়ে স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ব্যথা বাজল। মহীউদ্দিনের বুকে নব প্রতিষ্ঠিত এই স্বাধীন রাষ্ট্র ক্ষুদ্রায়তন হলেও জাগিয়েছে অসীম গৌরব ও আশা। আমার বুকে এ যে এনেছে পূর্ণতার আসন থেকে বিচ্যুতি। যে অখণ্ডতার গৌরব ছিল, তাকে হারানোর ব্যথা।"—শান্তিসুধা ঘোষ, জীবনের রঙ্গমঞ্চে, পৃঃ ১০৪-৫।

নেহরুও স্বীকার করেন যে, দেশভাগের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় নানাভাবে উদ্বাস্তু সমস্যা

সমাধানের চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুত পরিবর্তিত ছবি, সংখ্যালঘু মানুষের উপর অত্যাচার, সেখানকার হিন্দুদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। ফলে দেশত্যাগী মানুষের স্রোত অব্যাহতই থাকে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের খবর শত চেষ্টাতেও পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছনো বন্ধ করতে পারে না পাকিস্তান সরকার। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫০-র জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হয় দাঙ্গা। শান্তিসুধা ঘোষের লেখায়, বরিশালের দাঙ্গার বিস্তৃত বিবরণ এবং সেই ঘটনারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের মুসলমানদের আক্রান্ত হবার বিবরণ পাই—'কিন্তু আগুনের স্ফুলিঙ্গ তো বেশিক্ষণ চাপা রাখা যায় না, আর এ যে একেবারে লেলিহান জিহ্বা! তিন চারদিনের মধ্যে যেন কেমন করে কাকের মুখে বার্তা ওপারে পৌঁছে গেল। সর্বপ্রথম 'যুগান্তর' পত্রিকার মাধ্যমে বরিশালের কণামাত্র কাহিনী প্রকাশ লাভ করে ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করেছিল। জলধারা একবার যখন প্রবেশের পথ পেয়েছে, আর কি তাকে রোধ করা যায়? কল্ কল্ করে মর্মন্তুদ কাহিনীর স্রোত ছুটে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে যা অনিবার্য তাই ঘটল, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা অনেক সহ্য করেছে, ব্রিটিশের প্রশ্রয়পুষ্ট মুসলিম লীগের হাতে অনেক অত্যাচার তাদের হজম করতে হয়েছে, এমন কি দেশের অখণ্ডতাকে পর্যন্ত বলি দিয়েছে, আর নয়। এখন তারা স্বাধীন ভারতের নাগরিক, তারা এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে।"[২৯] পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কংগ্রেস ও বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি উদ্যোগী হয়। প্রশাসনও তাদের এ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করে। ১৯৫০-র ১৩ ফেব্রুয়ারি সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর জন্য শরৎচন্দ্র বসু সবাইকে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী নেহরু খণ্ডিত বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং উদ্বাস্তু সমস্যাকে শুধু 'সর্বভারতীয় সমস্যা' বলেই উল্লেখ করেননি, সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধানের দায়িত্বও ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেহরুর প্রচেষ্টায় সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন হিন্দু মহাসভা, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনগুলি। যারা পশ্চিমবঙ্গে আসতে চায় তাদের জন্য নিরাপদে এখানে আসার ব্যবস্থার কথাও ঘোষণা করেন নেহরু।

পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর 'ভারবহন করা' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শান্তিসুধা ঘোষের কথায়, "ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অভূতপূর্ব গণহত্যা ও পশ্চিমবাংলায় তার পাল্টা উত্তর ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের উদারতাকেও নাড়া দিয়েছে। তিনি অতি তীব্র ভাষায়, পাকিস্তানকে প্রতিবাদ জানালেন। অতি শীঘ্র এ তাণ্ডব বন্ধ করবার জন্য দৃঢ় দাবি জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করবার পরেও যখন উপযুক্ত প্রতিকার আসছে না, তখন ধৈর্যচ্যুত জওহরলাল পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করলেন, পাকিস্তান যদি অবিলম্বে এ অগ্নি প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। করাচীর নেতৃবৃন্দ উৎকর্ণ হয়ে ঘোষণাটি শ্রবণ করলেন। এই "অন্য উপায়" দ্বারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী কী বোঝাতে চাইছেন? এ কিসের ইঙ্গিত? তবে কি—? মিঃ লিয়াকৎ আলী

এবার ছুটলেন দিল্লীতে। স্বাক্ষরিত হল বিখ্যাত নেহরু লিয়াকৎ আলি চুক্তি। ......উভয় রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের থেকে অনতিবিলম্বে অব্যাহতি দিতে হবে এবং দুর্গত নাগরিকদের স্বদেশ ত্যাগ করে আশ্রয়ের জন্য পররাষ্ট্রে প্রবেশ অধিকার উভয় রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিতে হবে। চুক্তিতে এ সম্পর্কে আরো অনেক খুঁটিনাটি কথা লিপিবদ্ধ হল।" শান্তিসুধা ঘোষ, জীবনের রঙ্গমঞ্চে, পৃঃ ১৩৩।

এই সময় ভারত সরকার পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যোগী হন। ১৯৫০-র ৮ এপ্রিল সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান এবং তাদের বিপদমুক্ত করার উদ্দেশ্যে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি (ভারত পাকিস্তান চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। এখানে ভারত পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রেই সংখ্যালঘুদের "জীবন সংস্কৃতি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা হয়, আর মত প্রকাশের ও ধর্ম আচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়। তাছাড়া এই চুক্তি অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিজেদের বাসভূমিতে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকারসহ ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়।"[৩০] এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ কিছুটা ঠেকানো গেলেও, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি কেননা ভারতে এই চুক্তির শর্ত কার্যকরী করা গেলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা হয়নি—প্রশাসনের পক্ষ থেকে সে চেষ্টা আদৌ হয়নি। বরং ১৯৫১ থেকে '৫৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের আইন সভায় এমন কিছু আইন পাশ হয়, যার ফলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজেদের সম্পত্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে বিপন্ন হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পঞ্চাশের অক্টোবর মাসের মধ্যেই 'কাঁচরাপাড়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠে।[৩১] কলকাতা এবং তার আশেপাশে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কলোনী তৈরি করে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্যে গড়ে তোলে বিভিন্ন সংগঠন—'নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ', 'দক্ষিণ কলকাতা শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি', 'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ' প্রভৃতি। মণিকুন্তলা সেনের স্মৃতিচারণে,—"এই অগণিত মানুষদের চাহিদাকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। সংগঠন গড়া হলো, সরকারের কাছে দাবী দাওয়া পেশ করা হলো। তাই নিয়ে কখনও সংগ্রাম, কখনও আপোস—এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে জবরদখল কলোনীগুলি স্বীকৃতি পেল।"[৩২]

উদ্বাস্তু সমস্যার কোন সমাধান করতে না পারায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সরকার তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেনি অথচ তারা নিজের বসবাসের যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল সেখান থেকে উচ্ছেদের জন্য 'অধিকারী উচ্ছেদ বিল পাশ করতে উদ্যোগী হন। এই বিলের প্রতিবাদে ১৯৫১-র ২৮ মার্চ অনধিকার উচ্ছেদ কমিটির ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, চারুচন্দ্র রায়, লীলা রায় ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

রাণী দাশগুপ্তের লেখায়, 'পশ্চিমবাংলায় আগত এক জাতীয় উদ্বাস্তু যারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ, তারা জঙ্গল কেটে, জলা বুজিয়ে চারটি বাঁশের খুঁটির মাথায় প্লাস্টিকের ছাউনি খাটিয়ে দিনের পর দিন জলে ভিজে, রোদে পুড়ে, শীতে কষ্ট পেয়ে বাস করেছেন।

জমির মালিক ছুটে এসে পুলিশের সাহায্যে ছাউনি ভেঙে দিলে আবার খুঁটি পুঁতেছেন, দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন করেছেন। জাতীয় নেতাদের নামে একটি কলোনী গড়ে তুলেছেন।

এরা নানা দলমতের মানুষ হলেও রাজনীতিকে প্রতিবন্ধক হতে দেননি। তাঁদের একমাত্র পরিচয় ছিল 'উদ্বাস্তু'। একসাথে সংগ্রাম করেছেন। বাস্তুভিটা তুলেছেন, রাস্তা বেঁধেছেন, স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে দীর্ঘদিন পরে সরকারি স্বীকৃতি আদায় করেছেন।" —রাণী দাশগুপ্ত, 'দেশভাগ, উদ্বাস্তু ও মেয়েরা', চলার পথে, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, সংখ্যা, পৃঃ ৪৪।

পরিচালনায় কলকাতার প্রায় পাঁচ হাজার উদ্বাস্তু নর-নারীর শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বের হয়। অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশের লাঠি চালনায় ১২ জন আহত হয় এবং ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পাশাপাশি সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের আহ্বানে মনুমেন্টের পাদদেশে একটি সভা হয়। সেখানে বক্তারা উদ্বাস্তু শোভাযাত্রায় পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদ করেন এবং উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন—"১৯৫১-র ১৪ এপ্রিল অনধিকার উচ্ছেদ বিলটি পাশ হলে গোটা পঞ্চাশের দশক ধরে উদ্বাস্তু কলোনিগুলির স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে চলে।" [৩৩] উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মনিকুন্তলা সেন বলেছেন, 'সরকারের তরফ থেকেও কম অর্থ ব্যয় হয়নি। পাকা বাড়ি তুলে দেওয়া হলো অনেক। আবার জবরদখল জমিগুলো উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য সরকারি পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে মারামারি পেটাপেটি করতেও কসুর করল না। সরকারের চোখে তখন মানুষের চেয়ে আইনটাই বড় হয়ে উঠেছিল। মালিকের জলাজমিকে উদ্ধার করেও বসতি করা যাবে না, এই আইনটাই যেন তাদের কাছে শেষ কথা। কিন্তু যেসব উদ্বাস্তু একবার চালার তলায় মাথা দিতে পেরেছে সরকার সেখান থেকে তাদের আর নড়াতে পারেনি। 'জান দেব তো ধান দেব না।'-র মতো আর একটি শ্লোগান উঠল—'জান দেব তো ঘর দেব না'। একবার পুলিশ ঘর ভাঙ্গে আবার ওরা ঘর তোলে। দেশটাকে যাঁরা টুকরো করলেন, ইংরেজদের বদলে সেই নেতাদের স্বাধীন সরকারই এদের আর এক দফা লাঠি পেটা করলেন।" [৩৪]

উদ্বাস্তু আন্দোলনে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা বা বলা যায় পুরুষের থেকে বেশি সংখ্যায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল, তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে। এবং এই সংগ্রামে

'পূর্বে যে উদ্বাস্তু কলোনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সংগ্রামে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে তো বটেই, কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণেই অংশগ্রহণ করেছেন, পুলিসের লাঠির মোকাবিলাও করেছেন।' —রাণী দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

তারা পাশে পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত সচেতন মেয়েদেরও। পায়ের নীচে একটু মাটির জন্য, রুজির জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়াই করেছে মেয়েরা, আশ্রয় বাঁচিয়েছে, পরিবার বাঁচিয়েছে। কলোনী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের অন্ন সংস্থানের জন্যও লড়াই করতে হয়েছে। লড়াই করেছে কোথাও পুরুষের সঙ্গে একযোগে কোথাও বা তার সাহায্য

ছাড়া একাই। বেঁচে থাকার জন্য, জীবনধারণের প্রয়োজনে, স্বামী-সন্তান-বা ভাই-বোন-বাবা-মাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে যে কোন জীবিকা তারা গ্রহণ করেছে। প্রয়োজনে অশিক্ষিত মেয়েরা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজেছে, খাবার বিক্রি করেছে, ফরমাইশী পোশাক সেলাই করেছে, অফিস পাড়ায় নাটক করেছে।

দেশভাগ ও স্বাধীনতা মেয়েদের সুখী গৃহকোণ থেকে টেনে নামাল বাস্তবের কঠিন মাটিতে। শিকড় ছেঁড়া মানুষগুলির জীবনধারণের প্রয়োজনে অধিকাংশ উদ্বাস্তু পরিবারেই নারী পুরুষ উভয়কেই বেরিয়ে পড়তে হল কর্মক্ষেত্রে। দেশভাগের ধাক্কায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মেয়েরা জীবিকার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই হানা দিতে শুরু করল। সর্বস্ব হারানো সেই মেয়েরা বেঁচে থাকার জন্য সংসারের হাল ধরার প্রয়োজনে সমস্ত বন্ধ দরজাগুলোতে ঘা দিতে লাগল। মণিকুন্তলা বলেছেন—"পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানী-কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে

'শিকড়হীন এই মানুষগুলি জীবিকার প্রয়োজনে কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করল। কেউ কেউ চাকরি পেল। জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা ইস্পাতের মত দৃঢ় করে তুলল তাদের মন। এই জীবন সংগ্রামে ব্রতী হল মেয়ে-পুরুষ উভয়েই। ওদের কাজের উদ্যোগ সমাজের মূল্যবোধে মস্ত এক পরিবর্তন নিয়ে এল। জাতপাত, ধর্মের ব্যাপারটা অনেকটাই গৌণ হয়ে গেল।

মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা আগে কখনও বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম করেনি। আজ পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে প্রত্যেকের রোজগার করা একান্তভাবে জরুরি।" —বিমলা ফারুক্কী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।

কি উপকার করেছে তা হয়ত কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে সমস্ত বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপে ছাড়া সহজে হতো না।"[৩৫] পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মেয়েদের স্রোতে হঠাতই চাকরির বাজারে মেয়েদের সংখ্যা ভীষণভাবে বেড়ে গেল। সরকারি নথিতেও এর সাক্ষ্য মেলে—"Lastly the partition of India has dealt a severe blow to the family life of several millions of Bengalees in East Pakistan who were compelled to migrate to India leaving behind their sources of income in land and properties. They have been landed in such a plight that joint efforts of male and female members are needed in most cases to retrieve their fallen fortunes. There are numerous families which in the absence of male earners, have to depend entirely on one or more of their female members. All these factors have tended to progressively increase the number of women job-seekers."[৩৬] স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছরে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নথিভুক্ত (প্রতি মাসে) মহিলা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এক্সচেঞ্জ থেকে গৃহীত তথ্য অনুযায়ী, "In 1953, the average number of monthly women registrants with the employment exchange of India was 4,256 per month. While in 1957

it rose to 8,563 per month, i.e. there was a 100 percent increase during the last five years." [৩৭]

মেয়েরা যখন চাকরি করতে এলো, দেখল কাজের বাজারে পুরুষের প্রতিযোগী হিসেবে তারা অত্যন্ত দুর্বল। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব ও অন্যান্য নানাবিধ অসুবিধা, সামাজিক পরিস্থিতি সমস্ত কিছুই মেয়েদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে—মূল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেই শুরু হল মেয়েদের সত্যিকারের জীবন সংগ্রাম। তবে তারা ক্রমশ নিজেদের বিভিন্ন জীবিকার উপযুক্ত করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। রুজি রোজগারের পথে পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে সংখ্যায় অল্প হলেও মেয়েরা আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসতে লাগল। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রাণী দাশগুপ্ত বলেছেন—"বাবা-মা, স্বামী-পুত্র সব হারিয়ে যে মেয়েরা শুধুমাত্র প্রাণটুকু নিয়ে এই বাংলায় পৌঁছতে পেরেছিলেন তাদের জীবনে ভিক্ষাবৃত্তি, শিবিরে আশ্রয়, সামান্য কোনও জীবিকা জুটিয়ে নেওয়া বা অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নানা কিছুই ঘটেছিল। যারা ভাঙ্গা বা পুরো সংসার নিয়ে এপারে এসে স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে, রেললাইনের ধারে, শুধুমাত্র গাছতলায়, ভাগ্যে জুটলে উদ্বাস্তু শিবিরে স্থান পেলেন তাদেরও অনেকের সংসার ভাঙ্গা ছিল। সে পরিবর্তনে যেমন মন্দ ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল ভাল, বিস্ময়কর রকম ভাল—যা ঘটেছিল দুঃসাহসী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। যারা স্থল, জল বা আকাশ পথে সহজে এপারে চলে এসে আস্তানাও সংগ্রহ করে নিতে পেরেছিলেন, তাদের কেউ কেউ শিক্ষকতা, নানা সরকারি, আধা বা বে-সরকারি জীবিকা সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন, এমনকি পুলিশের চাকরিও। পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল পশ্চিমবাংলার মেয়েদের কাছে এক মহাবিস্ময়। সামান্য শিক্ষিত মেয়েরা অফিস দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, দোকানে সেল্‌স গার্ল, বাড়ি-বাড়ি ফেরি করে বিক্রির কাজ ইত্যাদি নানা পেশা গ্রহণ করেছিলেন যা সেযুগে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত।

অশিক্ষিত মেয়েরা বাড়ি বাড়ি বাসন মাজা, রান্না, অফিস পাড়ায় টিফিন দোকান, বাজারে শাক-তরকারি-ফল-ফুল, তেলে ভাজা, মুড়ি, চিড়ের দোকান চালান এবং পরবর্তীকালে হকার্স কর্ণারে, ফুটপাথে নানা জিনিস ও বিশেষ করে চা-টিফিনের দোকান, পোষাকের দোকানে ফরমাইশী পোষাক সেলাই করা এবং উপার্জনের আরও কত বিচিত্র উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন।

এমন কি এদের অনেককে দিয়ে ব্যবসায়ীরা পুলিসের অত্যাচার সহ্য করে চালের চোরাই চালান ও চোলাই এর দোকানও চালিয়েছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে। এখনও এসব চলছে। এই অর্থে তারা বেকার, বৃদ্ধ বা অসুস্থ স্বামী, ভাই, বাবা, মা, সন্তানের অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এই পরিশ্রমী স্বাবলম্বী মেয়েরা এই বাংলার মেয়েদের কাছে শুধু বিস্ময় নয়, অননুকরণীয় আদর্শও স্থাপন করেছে।" [৩৮] কোন কোন মেয়েরা অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মঞ্চই হয়েছিল তাদের কর্মক্ষেত্র। ভেঙে পড়া সংসারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছে অভিনেত্রী। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের শুরুতে গ্রুপ থিয়েটারে এসেছিলেন দীপালি চক্রবর্তী। দেশভাগের পর

এই নির্বাচনে জয়ী হন বিধানচন্দ্র রায় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। মনিকুন্তলার লেখায় এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণ পাই—"অবশেষে নির্বাচন হয়ে গেল। আমরা ২৮টা সীট জিতলাম এবং ১০.৭৬ পার্সেন্ট ভোট পেলাম। আইনসভা জমজমাট। আমরাই প্রধান বিরোধী দল। অন্য বিরোধী দলের সঙ্গে মিলে আমরা সংখ্যায় তখন মোট ৪১ জন। জ্যোতিবাবু হলেন বিরোধী দলের নেতা।"[৪৩]

ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতিতে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল। মেয়েরা যাতে সচেতনভাবে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা গ্রাম, শহরের মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে মেয়েদের সংগঠিত করতে থাকে। কনক মুখোপাধ্যায়ের 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা' লেখায় তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘদিনের বহু সংগ্রামের পর '৫২ তেই প্রথম ভারতবর্ষের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ভোটদানের অধিকার পেল। সেদিক থেকে এই নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দুই নেত্রী মণিকুন্তলা সেন ও রেণু চক্রবর্তী বিধানসভা ও লোকসভায় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। মণিকুন্তলা ও রেণু চক্রবর্তীর প্রতিনিধিত্বে যে যাত্রা শুরু, তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তাঁদের উত্তরসূরীরা। লোকসভা, বিধানসভা ছাড়াও সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং করছেন। কনক মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের সাফল্যের এও একটি দিক'।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন ক্রমশ সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠতে থাকে। উদ্বাস্তু সমস্যার কোন সমাধান হয় না, কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, শুরু হয় জীবিকা সমস্যা। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ উপার্জনও মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, দু'বেলা দু মুঠো খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাও সম্ভব হয়না, শুরু হয় খাদ্যের আকাল। তারই মধ্যে স্বাধীনতার আগে থেকেই চলছে জোতদার-জমিদার-মহাজনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সমস্ত কিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যায়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের সমগ্র '৫০ ও '৬০ এর দশক জুড়ে চলতে থাকে একের পর এক আন্দোলন, সংগ্রাম—উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, খাদ্য আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, কলকারখানায় শ্রমিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সরব হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। এবং এই সমস্ত আন্দোলন সংগঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের ভূমিকাও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে রাজনীতিতে তাদের হাতেখড়ি, সেই রাজনৈতিক বোধ, রাজনীতি সচেতনতা তাদের ক্রমশ মানবতার অধিকার রক্ষার

আন্দোলনেও সক্রিয় করে তুলেছে। রাজনীতি সচেতনতা ছাড়াও পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মন্বন্তর, দাঙ্গা মেয়েদের সামাজিক অবস্থানকে বদলে দিয়েছিল। রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে মেয়েদের বেরিয়ে আসা, বাস্তবের মাটিতে নিজের দুটি পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো সম্পূর্ণতা পেল স্বাধীনতা ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে—দেশভাগের ধাক্কায় উদ্বাস্তু হয়ে আসা পূর্ববঙ্গের মেয়েদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই তাদের শিখিয়েছিল যে মানুষের মত বেঁচে থাকার প্রতিটি অধিকারই তাদের আদায় করতে হবে, ছিনিয়ে নিতে হবে সমাজের থেকে, প্রতিকূল পরিবেশের থেকে। স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক বেশি সংখ্যক মেয়ের এগিয়ে আসা। রুজি রোজগারের কোন পথই তারা বাদ দিল না। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এগিয়ে এল গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মেয়েরা। পুরুষের সঙ্গে একই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে তারা সংগ্রাম করেছে, প্রতিবাদে মুখর হয়েছে, খোলা আকাশের নিচে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েছে। খাদ্যের দাবিতেও শুরু হয় আন্দোলন। ১৯৫০ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে চালের দাম ভীষণভাবে বেড়ে যায়। বিভিন্ন জেলায় এক এক রকম দামে চাল বিক্রি হতে থাকে। "নদীয়ায় চালের মণ ৩৫ টাকা তো মালদায় ৪৫ টাকা। এমনকি একই জেলার নানা অঞ্চলে বিভিন্ন রকম দামে চাল বিক্রি হতে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি মহকুমায় চালের মূল্য ২১ টাকা মণ, সদর মহকুমায় সাড়ে ছাব্বিশ টাকা মণ। লালবাগে ২৮ টাকা মণ ও জঙ্গিপুরে ৩৮ টাকা মণ।"[৪৪] অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দামও অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিষপত্র চোরাকারবারি ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত হয়ে পড়ায় 'পরিস্থিতি জটিল হয়'। বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

এই সময় কোচবিহার জেলার কোন কোন অঞ্চলে চালের দাম প্রায় ৭০ টাকা মণ উঠে যায়। ১৯৫১-র ১৯ এপ্রিলে পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবিতে ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টি, আর. এস. পি., হিন্দু মহাসভাও অন্যান্য দলের উদ্যোগে কোচবিহার শহরে এক ভুখা মিছিল বের হয়। তারা ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর অফিসের সামনে বসে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তের কথা বলে। পরের দিন ২০ এপ্রিল হরতাল পালিত হয় এবং নারী ও শিশুসহ দেড়হাজার মানুষের এক বিরাট মিছিল বের হয়। ২১ এপ্রিল আবার হরতাল হয় এবং প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের এক ভুখা মিছিল বের হয়। মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ ও গুলিতে ৫ জন মিছিলকারী নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়। ৪ অফিসার সহ ২৪ জন পুলিশ আহত হয়। আইন শৃঙ্খলার জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়।"[৪৫] অপরাজিতা গোপ্পী এক সাক্ষাৎকারে ১৯৫১ কোচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের কথা বলেন। তিনি তখন কলকাতা থেকে কোচবিহারে গিয়ে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিশের গুলিতে তাঁর বন্ধুর মৃত্যু হয়, তিনি আহত হন। পুলিশের গুলিতে ৫ জনের মৃত্যু হয়।[৪৬]

'৫০ এর দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় খাদ্য সঙ্কট এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে খাদ্য আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, বিস্তৃত আকার ধারণ করে

১৯৫৬ থেকে '৬০-র দিকে। অপরাজিতা গোপ্পী '৫৯ এ কলকাতার খাদ্য আন্দোলনের কথা বলেছেন—"ওরা ঘোড়সওয়ার চালিয়ে দিল। আমি ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় আহত হয়ে পড়ে গেলাম। একজন ভদ্রমহিলা আমায় বাঁচিয়ে ছিলেন।"[৪৭] কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখাতেও রয়েছে এই সময়কার খাদ্য আন্দোলনের কথা, "১৯৫৯ সালের সূচনা থেকেই পশ্চিমবাংলার সর্বত্র দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিতে থাকল। সরকার থেকে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ আদেশ চালু করার পরই বাজার থেকে চাল উধাও হতে থাকল। চোরাকারবারী ফুলে ফেঁপে উঠল। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় চালের জন্য হাহাকার পড়ে গেল। কলকাতায় ন্যায্য মূল্যের দোকানে অতি অল্প পরিমাণ এবং অখাদ্য চাল দেওয়া হতে থাকল। অথচ অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে কালোবাজারে ভালো চাল বিক্রি হচ্ছে, খাদ্য মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে মানুষ 'দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ জানাল।

কলকাতা মহানগরীতে ক্ষুধার অন্নের দাবিতে গণসমাবেশ ও মিছিলের জোয়ার উঠল। অগণিত মানুষের এই দাবির জবাবে উদ্ধত কংগ্রেসী সরকার দমন পীড়নের রথচক্র চালিয়ে এক কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করল। খাদ্য আন্দোলনে হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত

কনক মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উঠে এসেছে সেই ৩১ আগস্টের কথা—"খাদ্য আন্দোলনে শত শত বামপন্থী নেতা ও কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। অবশেষে এল সেই অবিস্মরণীয় ৩১ আগষ্ট, যখন নিরস্ত্র লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশের উপর উন্মত্ত পুলিসী আক্রমণে শহীদ হলেন ৮০ জন গ্রাম শহরের নারী-পুরুষ। আজও সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের অমর শহীদ বেদী। প্রতি বৎসর ৩১ আগস্ট সেখানে মালা দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসেন অসংখ্য মানুষ......" কনক মুখোপাধ্যায়, নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃঃ ১৬৩।

মানুষ সর্বত্র আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে থাকল। কলকাতার রাজপথে ভিক্ষাপাত্র হাতে গ্রামাঞ্চলের চাষীরা দলে দলে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে ক্ষুধার মিছিলে সামিল হল। এমনিভাবেই মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি জনজীবনকে গ্রাস করতে থাকল।"[৪৮] রেশনে সস্তার চাল, গ্রামের দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য, চালের বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং মজুত চাল উদ্ধার করে সস্তা দরে বিক্রির দাবি জানায় সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি। খাদ্যহীন মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। অসংখ্য মানুষ গ্রেপ্তার হয়। এরই মধ্যে ৩১ আগস্ট দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ডাকে কলকাতায় প্রায় তিন লক্ষ মানুষের এক সমাবেশ হয়। গ্রাম থেকে এসেছিলেন প্রায় বিশ হাজার কৃষক মহিলা ও পুরুষ, কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ সেদিন খাদ্যের দাবীতে একত্রিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের সেই সুবিশাল সমাবেশে পুলিশের আক্রমণে প্রায় ৮০ জন নিহত হন এবং আহত হন কয়েক হাজার মানুষ। ঐ সমাবেশে বক্তা ছিলেন মণিকুন্তলা সেন। তাঁর লেখায় সমাবেশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"প্রচার শেষে ময়দানে খাদ্যের দাবীতে একটা বিরাট জমায়েত করার কথা। জমায়েতটি দেখে আমরাও বিস্মিত হয়েছিলাম। অস্থি-চর্মসার, অর্ধ-উলঙ্গ দেহ নিয়ে মাঠ জুড়ে বসে আছে আমাদের গ্রামের কৃষককুল—যাদের মেহনতের ফলে আমাদের অন্ন

জোটে। আমাদের প্ল্যান ছিল সভাশেষে আমরা রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে বসে থাকব—যতক্ষণ আমরা খাদ্যের প্রতিশ্রুতি না পাই—ততক্ষণ।"[৪৯]

তাঁর উপর নির্দেশ ছিল সভায় বক্তৃতা শেষ করেই বেরিয়ে আসার। তিনি বলেছেন, "সভায় বক্তৃতা করতে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল। অন্য নেতারা প্রকাশ্যে ছিলেন না। আমার উপর নির্দেশ ছিল বক্তৃতা শেষ করেই অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসার। তাই করলাম।

কিন্তু যে ভয় আমি করেছিলাম, সরকার ঠিক সেই কাণ্ডটাই করে বসলেন। সভাশেষে একটা মিছিল রাইটার্সের দিকে পা বাড়াতেই পুলিশ তাদের পেটাতে শুরু করল। গ্রামের কৃষক এসেছে কলকাতা শহরে। পালাবার পথঘাটও তারা জানে না। শুধু মুখ বুজে পড়ে পড়ে তারা মার খেল এবং নারী পুরুষ মিলে সম্ভবত ৮০ জনকে খুন করল কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ বাহিনী। না, এদের মারা হলো বন্দুকের গুলিতে নয়। শুধু লাঠি দিয়ে থেৎলে থেৎলেই এদের শেষ করা হয়েছিল প্রকাশ্য রাজপথে।"[৫০] এই ঘটনায় ধিক্কার জানাল সমস্ত পত্রিকাগুলি। সারা দেশ যেন শিউরে উঠল হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতায়। 'ধিক্কারে ও প্রতিবাদে কলকাতা মুখর হয়ে উঠল। ঐসব শহীদ কৃষক নারী-পুরুষের বীভৎস ছবি ও পোস্টারে দেওয়াল ভরে গেল।'[৪৬] শুরু হল প্রতিবাদ আন্দোলন, স্ট্রাইক হরতাল সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল পুলিশের প্রতিরোধ। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির মেয়েরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসে, আন্দোলনে যোগ দেয়।

তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে এসে গেল আরেক সমস্যা। উত্তরবঙ্গের ন'টি জেলার ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ৪,১৩৬ বর্গমাইল অঞ্চল ভেসে যায়। শতাধিক মানুষের সঙ্গে হাজার হাজার গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। রাজনৈতিক, অ-রাজনৈতিক নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রিলিফের কাজে নেমে পড়ে। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি বিশেষ উদ্যোগ নেয়। জেলায় জেলায় বন্যা-ত্রাণ তহবিলে অর্থসংগ্রহ, খাদ্য, বস্ত্র কম্বল সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে অনেক মেয়েরা যুক্ত হয়ে পড়ে। অপরাজিতা গোপ্পী বলেছেন, "ভয়ঙ্কর বন্যা হল [illegible]। আমি একটা কমিটি করে ফেললাম এখানে কলকাতায় বসে, প্রবাসী উত্তরবঙ্গ [illegible]দের নিয়ে। সেই একমাস ধরে এখানে কালেকশান করে করে সব লোক মিলে আমরা ওখানে রিলিফের সাহায্যার্থে দুর্দান্ত কাজ করেছিলাম জলপাইগুড়িতে।"[৫১]

সমগ্র পঞ্চাশের দশক জুড়ে চলতে থাকে একের পর এক আন্দোলন। আন্দোলনে উত্তাল সময় শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, খণ্ডিত বাংলার অপর অংশ পূর্বপাকিস্তানেও লীগশাহীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর থেকেই চলতে থাকে আন্দোলন।

দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ ভাষা-আন্দোলন। হামিদা রহমান বলেছেন, "১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান তো প্রতিষ্ঠিত হলো, কিন্তু এর রাষ্ট্রীয় ভাষা কি হবে এ নিয়ে অনেকদিন থেকে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। সেই সময় কোলকাতায় আজাদ পত্রিকা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু হবে বলেই প্রচার চালাচ্ছিল। পূর্ব বাংলার কিছু লোকও উর্দুকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে প্রচারের চেষ্টা করছিল।"[৫২] ভাষা আন্দোলনে হামিদা রহমান অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।

দেশভাগ হবার পর তিনি মাইকেল মধুসূদন কলেজে বি. এ. ক্লাশে ভর্তি হন, "এমন সময় সারা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের প্রবল ঢেউ এসে নাড়া দিল। ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠল ভাষা আন্দোলন পরিচালনা করবার সংগ্রাম পরিষদ।"[৫৩] পাকিস্তান সরকারের জাতিগত নির্যাতনেরই অন্যতম অঙ্গ ভাষা-সংক্রান্ত নীতি। পশ্চিম পাকিস্তানের গোঁড়া রাজনীতিকরা উর্দুর পক্ষেই মত দিলেন। জিন্নাও ঢাকার জনসভায় সে কথা ঘোষণা করলেন। প্রতিবাদ করে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সারা দেশের মানুষও সে কথা অনুভব করেছিল। '৪৭ সালের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ মানুষের মধ্যেও। পরবর্তী পাঁচ বছরে (১৯৫২) মুষ্টিমেয় মানুষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিবর্তিত হল গণ আন্দোলনে। ১৯৫২ সালে এসেম্বলীর অধিবেশনে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করার

বদরুদ্দীন উমরের কথায়, "বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সামগ্রিক আক্রমণ হিসাবে ধরে নিয়ে তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ব্যাপকভাবে। তাই সে আন্দোলন ১৯৪৭ সালে শুরু হয়েছিল, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ছাত্র যুবকদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসাবে সেই আন্দোলন মাত্র কয়েক বৎসর পর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই পরিণত হলো সারা পূর্ব বাংলা ব্যাপী এক গণ-আন্দোলনে।" বদরুদ্দীন উমর, একুশে ফেব্রুয়ারি আহ্বান, পূর্ব-বাংলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩।

বিলটি আনা হলে ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ, সদস্যদের বিধানসভা ত্যাগ করার আহ্বান জানান, তারা বিধানসভা ঘেরাও করেন। তাদের চাপের মুখে মৌলানা আব্দুল রশীদ তর্কবাগীশ সাহেব সর্বপ্রথম সদস্যপদ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন এবং সকলকে বিধান সভা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। সদস্যরা সে আবেদনে সাড়া না দিলে ছাত্ররা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিধানসভার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ গুলি চালায়। ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্য প্রাণ দিল ছাত্ররা। —"গণ আন্দোলনের আঘাতে সরকার তখন পিছু হটিতে বাধ্য হয় এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি সরকার আইনসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য গণপরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করে।"[৫৪] এই আন্দোলন শুধুমাত্র 'বাংলা' ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং শিক্ষার মাধ্যম করার আন্দোলনই ছিল না, ছিল আর্থিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বা বলা যায় যথাযথ বিকাশের সংগ্রাম। এর শুরু ছাত্র আন্দোলন রূপে হলেও ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারিতে পরিণত হয়েছিল কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে। ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এমন একটি গৌরবময় ঘটনা যার গুরুত্ব ১৯৫২ সালের পর কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিণতি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। ভাষার জন্য তারা জীবন দিয়েছে, নিজেদের রক্তের বিনিময়ে গড়ে তুলেছে নতুন রাষ্ট্র, বাঙালির রাষ্ট্র—বাংলাদেশ।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩-র জুলাই মাসে শুরু হয় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন। ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানী তখনকার কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন নিয়ে 'এক পয়সা' ট্রাম ভাড়া

বাড়ালে বামপন্থী দল 'ট্রাম বাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে' কমিটি গঠন করে। প্রায় একমাস ধরে পুলিশের আক্রমণ ও ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে কলকাতা ও হাওড়ায় আন্দোলন চলে। কলকাতার সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মণিকুন্তলা সেনের কথায়—"স্বাধীনতা লাভের পর কলকাতায় এক বিরাট গণআন্দোলন হয়েছিল। সেটা 'এক পয়সার আন্দোলন' নামেই পরিচিত। তখন কলকাতায় ট্রাম কোম্পানী ছিল ইংরেজদের হাতে। প্রথম নির্বাচনের পর '৫৩ সনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঐ সময়ে ট্রাম কোম্পানী যাত্রী ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরোধী দল এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু কোম্পানী তার মত বদলায় না।"[৫৫] ভাড়া বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। তারা কিছুতেই বর্ধিত ভাড়া দেবেন না। বিনা ভাড়াতেই তারা ট্রামে

"পুলিশ পাইকারী হারে লাঠি আর গ্রেপ্তার চালালো। লোকের মুখে মুখে ধ্বনি উঠল, 'ইংরেজ কোম্পানী মুর্দাবাদ', 'কংগ্রেস সরকার দালাল'—ইত্যাদি। এরপর চললো ট্রাম বয়কট করার আন্দোলন। রাস্তায় রাস্তায় আওয়াজ উঠল, 'হেঁটে যাব, বাসে, যাব, তবু ট্রামে চড়ব না'। আগের মত লোকে আর ট্রামে ওঠে না। ফলে কোম্পানীর হল মুশকিল।" মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ২৪১।

চড়তে লাগলেন। প্রথমে কয়েকটা দিন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল। তারপর পুলিশ জোর করে ভাড়া আদায়ের চেষ্টা শুরু করলেই আরম্ভ হয় সংঘর্ষ, লাঠি, গুলি, গ্রেপ্তার। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ট্রাম জ্বলতে লাগল। ব্যারিকেড করে, ট্রামের তার কেটে ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেবার চেষ্টা শুরু হল। তারপর হল ট্রাম বয়কট। মানুষ ট্রামে ওঠা বন্ধ করে দিল। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে মণিকুন্তলা সেনের মনে হয়েছে, "ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলকাতায় যে বিরাট অভ্যুত্থান সেদিন দেখা গেল, ১৯৪২-৪৩ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনও সেই আকারে কলকাতায় দেখা যায়নি।"[৫৬] শেষ পর্যন্ত কোম্পানী দেখল যে ঐভাবে চলতে থাকলে একটা ট্রামও বাঁচবে না। তখন সরকার 'এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি' প্রত্যাহার করে এবং আন্দোলনের জন্য যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মুক্তি দেয়। আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হলে কলকাতা শান্ত হয়ে গেল।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ১৮,০০০ মাধ্যমিক শিক্ষক ১৯৫৪-র ১০ ফেব্রুয়ারি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষাবিদরা শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন—ইংরেজ আমলের 'কেরানী' তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে শিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেই পথেরও সন্ধান হতে থাকে। মণিকুন্তলা সেন, তাঁর স্মৃতিকথায় শিক্ষক আন্দোলনের কথা তুলে ধরেছেন—"দেশের শিক্ষক সমাজও এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরাই এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, সিলেবাস সমস্যা, পরীক্ষা সমস্যা, ছাত্রদের বেতন সমস্যা, বিদ্যালয়ের খরচ সংকুলান সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষকের বেতন সমস্যার সঙ্গে

তাঁরা জড়িত। উপর থেকে কেউ কিছু করুন আর নাই করুন, দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই সমস্যাগুলোকে সাধ্যানুযায়ী সমাধান করতেই হয়। বহুকাল ধরে শুধু ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করেই এ দেশের স্কুলগুলি চলে এসেছে। অসংখ্য স্কুল গড়ে উঠেছে সমাজ কল্যাণকারীদের দানের উপর নির্ভর করে। শুধু স্কুল নয়, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু চিরকাল তো এভাবে চলে না। গরীবের সংসারে গৃহিনীদের যেমন নিয়ম করে কম খেতে হয়, প্রাইভেট স্কুলগুলিতেও দানের উৎস শুকিয়ে গেলে এবং ছাত্র বেতনে ঘাটতি পড়লে, অন্যান্য সমস্ত আবশ্যিক খরচ মিটিয়ে তবেই শিক্ষকদের জীবনধারণের জন্য ভাগ করে নিতে হয় অবশিষ্ট অর্থ।"[৫৭] স্বাধীনতার পর থেকেই 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি' তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া, স্কুল-চালানোর খরচ, শিক্ষকদের বেতন—এ সমস্ত কিছু নিয়ে বার বারই তৎকালীন সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাতে কিছুই ফল হয়নি। শিক্ষা সংস্কারের অনেক প্রস্তাবও তাঁরা দিয়েছেন এবং প্রতিকারের কথাও জানিয়েছেন। আন্দোলন শুরুর কয়েক মাস আগে শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের কাছে যে কয়েকদফা দাবি পেশ করেন, সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ৩৫ টাকা মহার্ঘ ভাতা এবং ৭৩ টাকা থেকে ১৮০ টাকা পর্যন্ত বেতনের দাবি ছিল। সরকার শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে ১৯৫৪ সালে তাঁরা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। এর আগে তাঁদের দাবির সমর্থনে অনেক সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা হয় কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তখন শুরু হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'—প্রকাশ্য রাজপথে অনশন সত্যাগ্রহ। ধর্মঘট শুরু করার পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী প্রমুখ শিক্ষক নেতার পরিচালনায় শিক্ষকদের এক বিরাট মিছিল মহাকরণের দিকে এগোতে থাকে। পুলিশ বাধা দিলে তাঁরা রাজভবনের সামনে অবস্থান শুরু করেন। প্রথমে একদল অনশনে বসলেন এবং 'অন্য দল তাঁদের পালা আসবার প্রতীক্ষায় রইলেন'। প্রায় কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা সেখানে সম্মিলিত হন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অধিকাংশ মেয়েরাই বিভিন্ন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফলে তাঁরাও ছিলেন এই অবস্থানে। সাধারণ মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থন ছিল শিক্ষকদের পক্ষে। ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে হরতাল হয়। শিক্ষকদের এই অবস্থান ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চললে, সেদিন গভীর রাতে পুলিশ এসে শিক্ষকদের শিবির ভেঙে দেয় এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করে। শিক্ষক আন্দোলনের যুক্ত শিক্ষাবিদ্ মৃণালিনী দাশগুপ্তের লেখায় উঠে এসেছে শিক্ষক আন্দোলনে সেদিনের ছবি—"স্থির হয় শিক্ষকদের প্রাথমিক স্তরে ৫০ (ত্রিশ টাকার পরিবর্তে) এবং মাধ্যমিক স্তরে ৮০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা করতে হবে—এই দাবী নিয়ে বিধান রায় সরকারের বিরুদ্ধে শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৪ সালের বিখ্যাত আন্দোলন সম্ভবত মার্চ মাসে সংগঠিত হয়। এ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিই। তিনদিন তিন রাত্রি ডালহৌসী থেকে এসপ্ল্যানেডের উপরে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অবস্থান ধর্মঘটের সামিল হয়, হাজার-হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা। মানুষের কি অচিন্ত্যনীয় সমর্থন, দ্বারিক আমাদের খাইয়েছিল। স্থানীয় ক্লাব ইত্যাদি বসার জন্য সতরঞ্চি দিয়েছিল, মাড়োয়ারী রিলিফ তিনদিন ধরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে। সে এক

অকল্পনীয় অভিজ্ঞতা। ছোট ছেলের মায়েরা দিনের বেলা অবস্থান করবেন, অন্যরা রাত্রে। আমি দুই পুত্র নিয়েই দিনে যেতাম। প্রথম রাত্রে বাড়ী ফিরতেই পারিনি, পরদিন সকালে ফিরতেই দেখি শ্বশুরমশাই বিস্মতভাবে আমাকে দেখছেন, আমার স্বামীও বলছেন 'তোমার ছেলেদের কথাও মনে হয়নি?' পরে অবশ্য সত্যপ্রিয় বাবু মায়েদের জন্য ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় রাত্রে শেষ প্রহরে হঠাৎ পুলিস এসে শিবির ভেঙ্গে সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অ্যারেস্ট করে। আমরা সকলে রেডিও শুনেই আলিপুর জেলে দেখা করতে যাই।"[৫৮]

শিক্ষকদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ও তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের এক বিরাট মিছিল বিধানসভা ভবনের সামনে পৌঁছলে পুলিশ বাধা দেয়। এর আগেই পুলিশ বিধানসভা ভবনের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল, কিন্তু আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে, লাঠি চার্জ করে ও গুলি চালায়। ৬ জন নিহত ও ১৫৭ জন আহত হন। সারা কলকাতায় ১৪৪ ধারা জারি হলেও ১৭ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। মিলিটারি ও পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ চালায়। বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিধানসভায় বিরোধী দলনেতারা শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে এবং তাঁদের উপর প্রশাসনের দমনমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। মণিকুন্তলা সেন শিক্ষক আন্দোলনে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে বিধানসভায় জুতো ছুঁড়ে মারেন এবং তার দু'চারদিন পরেই তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনি বলেছেন, 'সরকারও মধ্যরাত্রিতে জনতাবিহীন শিবির থেকে শিক্ষকদের তুলে নিয়ে জেলে পাঠানো নিরাপদ মনে করলেন। রোজ সকালে দেখতাম দলে দলে শিক্ষিকারাও এসে ফিমেল ওয়ার্ড ভর্তি করে দিচ্ছেন। আমাদের মহিলা সমিতির নেত্রীদেরও ধরে জেলে পোরা হলো।"[৫৯]

শেষ পর্যন্ত সরকার থেকে শিক্ষকদের কিছু কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয় এবং আন্দোলনের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। মণিকুন্তলা বলেছেন, 'জেলের মধ্যে এসে

> *"ঐদিন ছাত্ররা বন্‌ধের ডাক দেয় এবং শিক্ষকদের মুক্তির জন্য মিছিল বার করে। বিধান রায়ের পুলিশ গুলি চালায়, একটি ছাত্র মারা যায়—এই সংবাদে অনিলা দেবী ও সত্যপ্রিয়বাবু জেলে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলন তুলে নেন। আমরা চাই নি আমাদের শ্রেণী স্বার্থে ছাত্ররা প্রাণ দেবে।" —মৃণালিনী দাশগুপ্ত, আমার রাজনৈতিক চেতনা ও বিকাশ, পৃঃ ১২।*

সরকারের প্রতিনিধিরা শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ও দুর্মূল্য ভাতার দাবীটি মেনে নেন"।[৬০] এই সময় ছাত্ররাও শিক্ষকদের সমর্থনে পথে নামে। মৃণালিনী দাশগুপ্ত বলেছেন, যেদিন শিবির ভেঙে গভীর রাতে শিক্ষকদের গ্রেপ্তার করা হয় সেদিনই ছাত্ররা বন্‌ধের ডাক দেয় এবং শিক্ষকদের মুক্তির জন্য মিছিল বের করে। পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র মারা গেলে শিক্ষক নেতা অনিলা দেবী. সত্যপ্রিয় রায় জেলে বসেই আন্দোলন তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেন, কেননা তাঁরা চাননি শিক্ষকদের স্বার্থে ছাত্ররা প্রাণ দেবে।

'৫৮-এর ফেব্রুয়ারিতে মাধ্যমিক শিক্ষকরা আবার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের সুদীর্ঘ আন্দোলনের পর সরকার যে নতুন বেতনক্রম ঘোষণা করে, প্রয়োজনের তুলনায়

তা ছিল অত্যন্ত কম। এছাড়া এই নতুন প্রস্তাবিত বেতনক্রম পেতে হলে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।' এই অপমানজনক শর্ত আরোপের ফলে প্রায় শতাধিক মাধ্যমিক শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবীর নেতৃত্বে সপ্তাহব্যাপী অনশন ধর্মঘট করেন। শিক্ষকদের দাবি দাওয়া ও মানমর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরই সহানুভূতি ছিল।

শিক্ষক আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থান ধর্মঘটে শিক্ষিকার প্রাচুর্য দেখে মণিকুন্তলার মনে হয়েছে যে এই সমাবেশ ও অবস্থান না হলে জানতেও পারা যেত না যে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের এত অসংখ্য স্কুল আর এত ত়ার শিক্ষিকা। দেশভাগের পর প্রয়োজনের ধাক্কায় বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য স্কুল এবং কিছু কলেজ। এগুলিকে বলা যায় 'need based' স্কুল। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু মেয়েদের শিক্ষার দাবিতে, অবস্থার চাপে গড়ে ওঠা এরকমই একটি কলেজ, আসানসোলের 'মণিমালা গার্লস্ কলেজের' কথা বলেছেন শান্তিসুধা ঘোষ—" ......একদিন একখানা ডাক চিঠি এসে পৌঁছল আসানসোল থেকে। কিছু বিস্মিত হলাম, আসানসোলে তো আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আছে বলে মনে পড়ে না। চিঠিটি খুলে বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। লিখেছেন শ্রীযুক্তা কমলা সেন, আসানসোল কোলিয়ারির সি. এস.ও. ও ডাঃ ললিতমোহন সেনের পত্নী। মিসেস সেন নিজেকে কল্যাণী দাস ও বীণা দাসের দিদি বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। চিঠিখানির বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ নারী পশ্চিমবঙ্গে হুড়মুড় করে প্রবেশ করার কারণে পশ্চিমবাংলায় শুধু যে অর্থনীতিতে আঘাত লেগেছে, তাই নয়, সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থাও ভেঙে পড়ছে। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা বরাবরই স্ত্রীশিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কিছুটা প্রাগ্রসর ; সুতরাং উদ্বাস্তুদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও শিক্ষার প্রয়োজন ও প্রেরণা তারা এখনো ভুলতে পারে নি, তাই রাশি রাশি উদ্বাস্তু কন্যা পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজগুলিতে প্রবেশের জন্য দাবি জানাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখলেন একটা কিছু অবশ্যই অচিরে করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি নূতন পরিকল্পনার অধীনে মেয়েদের জন্য তিনটি মহিলা কলেজ বিভিন্ন জিলা-শহরে স্থাপন করবার উদ্যোগ করেছেন। একটি খোলা হচ্ছে আসানসোল শহরে ; অপর দুটি জলপাইগুড়ি ও বহরমপুরে। বিশিষ্ট সমাজসেবিকা হিসাবে শ্রীযুক্তা কমলা সেনকে সরকার সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আসানসোলের ভাবী কলেজটির নবনিযুক্ত গভর্ণিং বডির সভানেত্রী রূপে তিনি আমাকে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করবার জন্য আসানসোল চলে যাবার অনুরোধ জানিয়েছেন।"[৬১] সরকারের সাহায্য ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল বেসরকারি সাহায্যপুষ্ট বহু স্কুল এবং কলেজও। মণিকুন্তলাও বলেছেন যে, অবিভক্ত বাংলায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে ছিল কিন্তু দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মেয়েরা শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদেরও অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। শিক্ষক আন্দোলনে যেসব স্কুলের শিক্ষিকারা এসেছিলেন, সেগুলি অধিকাংশই সরকারের গড়া স্কুল নয়। নিজেদের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় তাঁরা এইসব

স্কুল একসময় গড়ে তুলেছিলেন! বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কলোনীর মানুষরাই অতিকষ্টে গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন অস্থায়ী স্কুল। প্রয়োজনের তাগিদে সেগুলি বড় হয়েছে, স্থায়িত্ব পেয়েছে। মৃনালিনী দাশগুপ্ত সে সময় এরকমই একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। —'১৯৫২-তে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ বালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দিই, সবই উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়ে। এক ছিটেবেড়ার গৃহ—ছাত্রী সংখ্যা মোট প্রায় এক হাজার।" [৬২] —সেদিন শিক্ষক শিক্ষিকারা আন্দোলনে নেমেছিলেন এই সমস্ত স্কুলগুলির সরকারি স্বীকৃতি ও সাহায্য লাভের জন্য।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একই সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে রাস্তায় বসে থাকতে দেখে মণিকুন্তলা সেনের মনে হয়েছে, মেয়েরা সত্যিই সংস্কার ভেঙে বেরোতে পেরেছে। নাহলে নারী-পুরুষ শিক্ষকদের জন্য আলাদা-আলাদা শিবির করতে হত। পরিচয় তাদের এক, সমস্যা তাদের এক, একই আদর্শের জন্য তারা লড়াই করছে। যেহেতু তারা নারী এবং পুরুষ, এই দুটি বিপরীত নামে পরিচিত, একসঙ্গে চলার ওঠা-বসার অধিকার সমাজ তাদের দেয়নি। এই অধিকার তারা অর্জন করেছে। মণিকুন্তলার কথায়,—"এ অধিকার কোন আইন করে পাওয়া নয়, জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এই অধিকার।"[৬৩] জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই পরিচয় তারা লাভ করেছেন যে তারা শুধু নারীই নয়, তারা পরিপূর্ণ মানুষ—তাঁদের মনুষ্যত্বে উত্তরণ ঘটেছে।—মণিকুন্তলার স্মৃতিতে উঠে এসেছে দেশভাগের অব্যবহিত পরের সেই সময়টি। সেই সময়ে দেখা নতুন মেয়েদের প্রতিচ্ছবি যেন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার অর্জন করা রাজপথে বসে থাকা মেয়েগুলির মধ্যে—"দেশভাগের পর সেই যে দেখতাম—মেয়েরা অবাধে ট্রেনে বাসে বোঝাই হয়ে স্কুল-কলেজ যাচ্ছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের নয়—পরিবারের ভার কাঁধে নিচ্ছে, আজ এই ভিড়ের মধ্যে তাদেরও যেন খুঁজে পাচ্ছি।

আগে হলে হয়তো শিক্ষিকাদের জন্য একটা আলাদা শিবির খুলতে হতো। কিন্তু সে যুগ আর নেই। এখন রাজপথে নারী-পুরুষ সমান অধিকারেই বসে আছেন।"[৬৪]

১৯৫৫-র একদম গোড়ার দিকে, জানুয়ারি মাস নাগাদ, গোয়ামুক্তি আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষও সোচ্চার হয়ে ওঠে। পর্তুগীজ শাসন থেকে গোয়ার স্বাধীনতা এবং ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'গোয়া বিমোচন কমিটি'। ভারতীয় সংসদে সমস্ত রাজনৈতিক দল, তাদের এক যুক্ত কনভেনশনে গোয়ার পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, 'গোয়ায় পর্তুগীজ অবস্থিতি ভারতীয় শাসন পদ্ধতির উপর হস্তক্ষেপ'। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কয়েকশো সত্যাগ্রহী গোয়ায় যায়, সেখানকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশ নিতে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও সত্যাগ্রহীরা সেখানে যায়। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরাও গোয়ার মানুষের দাবির সমর্থনে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে ১৫ হাজার সত্যাগ্রহী গোয়ায় সত্যাগ্রহ করলে পুলিশ তাদের আক্রমণ করে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। পর্তুগীজ বর্বরতার প্রতিবাদে, গোয়ায় গণহত্যার বিরুদ্ধে ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কনক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'সারা পশ্চিমবাংলায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারি ধর্মঘট করেন।'[৫৫] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় মেয়েরা গোয়া মুক্তি আন্দোলনের জন্য তহবি সংগ্রহ করেন এবং সভা সমাবেশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষর মধ্যে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন। এই আন্দোলনে গোয়ার মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা এবং অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়া বিমোচন সমিতির অন্যতম সদস্য, সত্যাগ্রহী মালিনী তুলপুলের লেখায় সেখানকার মেয়েদের ভূমিকার কথা জানা যায়, "......মেয়েদের অংশগ্রহণ এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একটি অন্যতম উজ্জ্বল দিক। এখানে এই সর্বপ্রথম গুপ্ত সংগঠনে শত শত নারী বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ১২ জন গ্রেপ্তার হন প্রচার কার্য চালাবার সময় এবং ৬ জন সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারে দেড় বৎসর থেকে চার বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রীমতী মিড়া কাকোদর, সেলিনা মোনেজ, শশীকলা হোদারকর, লক্ষী পাইগণকর, মালিনী লোলাইকর, সূর্যকান্ত ফলদেশাই এখনো কারান্তরালে রয়েছেন। গোয়া জাতীয় কংগ্রেস এরপর সিদ্ধান্ত নিলেন যে গুপ্ত আন্দোলনের পথ ছেড়ে তাঁরা প্রকাশ্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন। স্থির হলো মাপুকাতে তাঁরা তাঁদের সম্মেলন করবেন। গোয়ার ইতিহাসে গোয়ার ভূমিতে বসে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। শ্রীমতী সুধা যোশী এই সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করবেন বলে ঘোষণা করা হলো। এই ঘোষণা সমগ্র দেশকে বিদ্যুতের মতো চালিত করল। ১৯৫৫ সালের সম্মেলনের ধার্য দিন ৬ই এপ্রিলের জন্য সকলে অপেক্ষা করতে লাগল। ৭ই এপ্রিল উদ্‌গ্রীব পৃথিবী সংবাদ পেল যে, শ্রী সুধা যোশীর সভানেত্রীত্বে পুলিসের তৎপরতা সত্ত্বেও সময়মতো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। পুলিশ সীমান্তে তাকে আটকাতে পারে নাই। কিন্তু এরপরই তাকে প্রচণ্ড প্রহার করে পঞ্জিম জেলে আটক করা হলো। এই সঙ্গে অনেক মহিলা সহ বহু প্রতিনিধি বন্দী হলেন। দু'সপ্তাহ পরে তাঁর বড় বোন শ্রীমতী আশা ফাডকে সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন। কুমারী দেশপাণ্ডে গুপ্তভাবে আন্দোলনের কাজ চালাচ্ছিলেন। তিনিও শীঘ্রই গ্রেপ্তার হলেন। পঞ্জিম জেল বন্দীতে ভর্তি হয়ে গেল। এমনকি একটি ছোট-ছোট সেলে তিনটি করে মেয়েকে রাখা হলো।"[৫৬] মালিনী তুলপুলের লেখা থেকে গোয়ায় মেয়েদের জাগরণের ছবিটি উঠে এসেছে। পর্তুগীজ শাসন, তাদের অত্যাচার মেয়েদের সচেতন করে তুলেছিল। নিজের অধিকার আদায়ের জন্য, দেশকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি গোয়ার মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিল এবং ক্রমশ তারা সামনের সারিতে এগিয়ে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, কারাবরণ করেছে। পুলিশের লাঠি, গুলি, অত্যাচার, গ্রেপ্তার তাদের চলার পথ রোধ করতে পারেনি, বরং সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতার লক্ষ্যে তারা এগিয়ে গেছে জীবণপণ সংগ্রাম করে। তাদের সংগ্রামী চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নারী পুরুষকে। মালিনী তুলপুলে পূর্বোক্ত লেখাটির অন্য একটি অংশে সহোদরা বাই রাওয়ের কথা বলেছেন—পুলিশের গুলি বৃষ্টি তুচ্ছ করে

স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছিলেন দৃঢ়, স্থির লক্ষের দিকে। 'সহোদরা বাইয়ের প্রসঙ্গ মনে পড়িয়ে দেয় বেয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মেদিনীপুরের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলা—"ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের নামের সঙ্গে সেদিন ১৫ই আগষ্ট আর একটি বীরাঙ্গনার নাম যুক্ত হলো। এ নামটি হলো সাগরের সহোদরা বাই রাওয়ের নাম। যেখানে অজস্র গুলিবৃষ্টি হচ্ছে, তারই মাঝে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সহোদরা চলেছেন—মুখে তাঁর স্বাধীনতার সংকল্প বাণী। তাঁর যাত্রাকে স্তব্ধ করা বুলেটের সাধ্যের অতীত।"[৬৬]

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬-তে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রতিবাদের সুর শোনা যায়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় একটি যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গবিহার সংযুক্তির আহ্বান জানান। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারকে একটি প্রদেশে পরিণত করতে চান। এই চুক্তি 'রায় সিংহ' চুক্তি নামে পরিচিত। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, আন্দোলনে সামিল হয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে সভা সমাবেশ করে আইন অমান্য করে। কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "গ্রামের কৃষক মহিলাদের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ

কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। —"১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী সারা পশ্চিমবাংলা সম্মেলন উপলক্ষে বিরাট জনসমাবেশ হয়। এই সমাবেশে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের স্বার্থে ভারতের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। এরপরই ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের প্রতিবাদে এবং ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিতে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জায়গায় শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। এইদিন পশ্চিমবঙ্গের ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির উদ্যোগে ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য শুরু হয়। বিধান রায়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। প্রথম দিকে এই আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কমিউনিষ্ট পার্টি, আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কস্‌বাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের পক্ষ থেকে সরোজ মুখার্জী, যতীন চক্রবর্তী, হেমন্ত বসু, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সকলেই কারারুদ্ধ হন। এই আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিদিন দলে দলে আইন অমান্য করে কারাবরণ করতে থাকেন।"

—কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পৃঃ ১৫১।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারা রাজ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কয়েকশত সদস্য সত্যাগ্রহে যোগ দেন।"[৬৭] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রায় ৫০ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। ১১ ফেব্রুয়ারি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার বাসীর স্বার্থে ভারতীয় ঐক্য ও

সংহতি রক্ষার জন্য এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি আইন অমান্য করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। ক্রমশ এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার হন বহু মানুষ। শেষ পর্যন্ত ৪ মে মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হন এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সচেতনতা সম্পর্কে 'ঘরে বাইরে' পত্রিকার চৈত্র, ১৩৬২-র সম্পাদকীয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'গত দেড় মাসের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় প্রায় ছয় সহস্র মানুষ আইন অমান্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা দুই শতাধিক। এই মহিলাদের মধ্যে আছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের মেয়েরা এবং রাজনৈতিক পার্টির সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেক সাধারণ ঘরের মেয়েরা। ইহাদের মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধা হইতে শুরু করিয়া তরুণ ছাত্রী পর্যন্ত সমস্ত বয়সের মহিলা আছেন।

পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্কা চারুবালা বসু রায়, পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধা দেশসেবিকা তরঙ্গিনী দেবী, রাজলক্ষী গাঙ্গুলী লাঠি ভর দিয়া আইন অমান্য করিতে গিয়াছেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ভগ্নী চারুশীলা দেবীও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩৩ সালের আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্য বহনকারী নারী সমাজের অগ্রণী মহিলারা আজ বাংলার জাতিসত্তা রক্ষার আন্দোলনে তাঁহাদের যে মূল্যবান স্বাক্ষর রাখিলেন তাহা কোনদিনই মুছিবার নয়।"[৬৮]

'ঘরে বাইরে'র সম্পাদকীয় বা গোটা '৫০ এর দশক জুড়ে বিভিন্ন আন্দোলনগুলিতে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের বাঙালি মেয়েদের যোগদানের যে তথ্য পাওয়া যায়, তাতে একটি কথাই বোঝা যায় যে, মেয়েদের ক্রমশ পাষাণ মুক্তি ঘটছে। পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকের চাপে, শিক্ষার প্রসারের ফলে, অনেক বেশি সংখ্যক মেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল—সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। নিজের মতামত প্রয়োগ করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা তারা খুঁজে পেল। স্বাধীনতার পরবর্তী এই সময়টি যে বড় অন্যরকম। স্বাধীন দেশের নাগরিকের দু'চোখ ভরা স্বপ্ন—নতুন যুগ, নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে হবে। এই যুগ, এই সময়, পরিস্থিতি পাষাণকায়া অহল্যার নবজন্ম ঘটাল। সময়ের কষ্টিপাথরে, বাস্তব জগতে জীবনের মাঝে সে নিজেকে নিজের কাছেই যেন একবার যাচাই করে নিল। কোন স্থান, জীবনের কোন বিশেষ ক্ষেত্র নয়, সর্বত্রই তার অবাধ বিচরণ। সমাজের, দেশের সমস্ত সমস্যাই তাকে নাড়া দিতে লাগল—নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে চাইল সে। আন্দোলনময় এই সময়ের প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি সমাবেশে, পুরুষের সঙ্গে দেখা যেতে লাগল অধিক সংখ্যক নারীকে। একই সঙ্গে তারা পুলিশের হাতে মার খাচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে, জেলের কুঠুরি ভরিয়ে তুলছে। জীবন ও জীবিকার প্রতিটি অগম্য স্থানেই তারা পৌঁছে যাচ্ছে।

এই সময় বাস্তব প্রয়োজনের কারণেই বিভিন্ন ধরনের জীবিকা গ্রহণ করতে থাকে

মেয়েরা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল সংসারের প্রয়োজনে তারা পথে বেরোচ্ছে, যে কোন ধরনের জীবিকা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে উপার্জনের জন্য। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি তখন মেয়েদের জীবিকার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে। এই সময় ১৯৫৫-র ১ মার্চ মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে জীবিকার দাবিতে প্রায় পাঁচ হাজার মেয়ের এক বিরাট মিছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা অভিযান করে। জীবিকার দাবিপত্রে ২২ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তারা। কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, “এই সময় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনগুলির বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল নারীদের জীবিকার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা। ইতিমধ্যে মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালের ১লা মার্চ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা অভিমুখে জীবিকার দাবিতে পাঁচ সহস্রাধিক মহিলার ঐতিহাসিক মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। সেই সমাবেশে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ৩,০০০ মহিলা যোগদান করেন। জীবিকার দাবিপত্রে ২২ হাজার স্বাক্ষর করেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সমাজ উন্নয়ন বোর্ডের সরকারি সাহায্যে কলকাতা ও হাওড়ায় দুটি কর্মকেন্দ্র সংগঠিত করে।”[৬৯] ১৯৫৬-র ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অষ্টম সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলির মধ্যে নারীর জীবিকা সংস্থান ও শিক্ষা ছিল অন্যতম।

এই বছরই জুন মাসে (১৯৫৬, জুন) বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ডাকে ভিয়েনায় বিশ্বনারী শ্রমিকদের একটি সম্মেলন হয়। এখানে বিভিন্ন দেশের নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের জন্য সমান কাজে সমান মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলির জন্য সুপারিশ করা হয়। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরাও যোগ দেন।

পঞ্চাশের দশকে ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই সময় বঙ্গীয় ছাত্র ফেডারেশনের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। স্কুল-কলেজে বেতন বৃদ্ধি, ‘ইংরেজি শিক্ষার নামে অসংখ্য ছাত্র ফেল করানোর প্রতিবাদে, এবং শিক্ষার সুযোগের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন করে। বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন করে, কারাবরণ করে এমন প্রতিবাদ গড়ে তোলে যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেতন বৃদ্ধির নির্দেশ তুলে নিতে বাধ্য হন। এছাড়া ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটে এবং খাদ্য আন্দোলনেও ছাত্ররা অংশ নেয়। পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে এবং হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করার দাবিতেও ছাত্রেরা সরব হয়ে ওঠে। গোয়ার মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধেও ছাত্ররা আন্দোলন করে। অর্থাৎ এই দশকের সমস্ত আন্দোলনগুলিতেই ছাত্রদের একটি ভূমিকা রয়েছে। পড়াশোনার ক্ষেত্র ছাড়াও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজ রাজনীতির যে কোন রকমের পরিবর্তনই তাদের ধাক্কা দিচ্ছে, তারা বেরিয়ে আসছে তার সমর্থনে বা বিরোধিতায়। সেই সময়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সমস্ত মানুষই যেন পরিবর্তনের নেশায় মেতে উঠেছিল। আর দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বৃহত্তর ছাত্র-সমাজ, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা তখন আদর্শের খোঁজে নতুন ভবিষ্যৎ গঠনের স্বপ্নে বিভোর।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৭-র ১ মার্চ। এই নির্বাচনেও কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় জয়ী হয় এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। '৫৭-র নির্বাচনে বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির আসন সংখ্যা ২৮ থেকে ৪৬ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বামপন্থী দলগুলি শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ হিসেবে বিভিন্ন আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দেয়। মণিকুন্তলার কথায়, " '৫২ সনের ২৮ টির জায়গায় এবার ৪৬টি আসন কমিউনিস্ট পার্টি পেয়ে গেল। ভোট পেল শতকরা ১৭.৮২। সমস্ত বিরোধী দল মিলিতভাবে আসন পেলেন ৬১টি।"[৭০]

"এই নির্বাচনে বিধানসভায় কমিউনিস্ট পার্টির আসন সংখ্যা ২৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ হয়। ....এবারও জ্যোতি বসু বিরোধী দলের নেতা হন। এই দুটো নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কয়েকটি বামপন্থী দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল হিসেবে প্রধানত তারাই বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগঠিত করে।" অমলেন্দু দে, 'সাতদশক'—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ জুলাই, ১৯৯৩।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে '৫৬-র জুলাইতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। "নির্বাচনের পর নবগঠিত লোকসভায় চিনি, দেশলাই, কেরোসিন, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর কেন্দ্রীয় সরকার শুল্ক ধার্য করে, খাদ্যের মূল্য ও রেলভাড়া বাড়িয়ে দেয়। শুধু যাত্রীভাড়াই নয়, মালের উপরও মাশুল হার বাড়ানো হয়।"[৭১] খাদ্য সঙ্কট দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়, মানুষ লঙ্গরখানায় গিয়ে পৌঁছয়। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হল 'মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'। নতুন কর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে এই কমিটির ডাকে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে 'রাজ্য ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল' পালিত হয়। " '৫৮-র ৪ জুন মহিলা সমিতিগুলি যুক্তভাবে খাদ্যের দাবিতে মিছিল করে বিধানসভায় যান এবং অবস্থান করেন। তাদের কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি দেন" '১৯৫৮ সালের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ও আয়ের উপর কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সদস্যরা ১২ হাজার পোস্টকার্ড প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান।"[৭২]

নির্বাচনের আগে ১৯৫৫-র শেষে ৩০ নভেম্বর রাশিয়ার বুলগানিন এবং ক্রুশ্চভ কলকাতায় এলে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানানো হয়। মণিকুন্তলার কথায়, "১৯৫৭ সনে হলো দ্বিতীয় নির্বাচন। তার দু'বছর আগে ১৯৫৫ সনে ভারতের আমন্ত্রনে সোভিয়েট থেকে ক্রুশ্চভ ও বুলগানিন এলেন ভারত সফরে। ক্রুশ্চভ ছিলেন পার্টি নেতা, বুলগানিন প্রধানমন্ত্রী। সোভিয়েটের সঙ্গে তখন ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। ....সোভিয়েটের দুই নেতাকে নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার জনসভার কোন তুলনা হয় না। এতবড় জনসভা, আমার ধারণা, কলকাতায় অতীতে আর হয়নি।"[৭৩] ডিসেম্বরে আসেন চীনের প্রধানমন্ত্রী 'চৌ-এন-লাই'। বিরাট জনসভায় তাঁকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯৪৯-এ চীনের মুক্তি সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে, ভারত সরকার স্বাধীন

চীনকে স্বীকৃতি জানায় সঙ্গে সঙ্গেই। দুই সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বও স্থাপিত হয়। সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই সৌজন্য সফরে আসেন চৌ-এন-লাই। কিন্তু ১৯৫৯ থেকেই চীন ভারত সম্পর্ক পরিবর্তিত হতে থাকে। ভারত চীন সীমানা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। মার্চ মাসে তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়, ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরু তাকে সমর্থন জানান। নেহরুর তিব্বতের বিদ্রোহ সমর্থনের কারণে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। তিব্বতের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে চীন বিরোধী প্রচার প্রবল হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও ভাঙন ধরতে শুরু করে। ১৯৬০-র জানুয়ারিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখা যায়, 'দেশের সংকট মুহূর্তে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টিতে ভাঙন, চীন ঘেঁষা নীতির বিরুদ্ধে একাংশের মধ্যে বিক্ষোভ।'

পঞ্চাশের দশকের অস্থিরতা ও ভাঙাগড়ার ছাপ পড়ল সমকালীন সাংস্কৃতিক জগতেও। স্বাধীন দেশের নাগরিকের নতুন স্বপ্ন, নতুন অনুভূতি। দায়িত্ব কিন্তু আরও অনেক বড়, সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। গণনাট্য সঙ্ঘের দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য টাকা তোলার প্রয়োজনও সাময়িকভাবে ফুরলো। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে, মহামারী কবলিত মানুষকে কুশীলব করে যে নতুন ধারার নাটক তৈরিতে মেতে উঠেছিল একদল ছেলেমেয়ে, তাদের সেই খেয়ালখুশীর পাগলামি বাংলা সংস্কৃতির জগতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। পেশাদারী যাত্রা থিয়েটারের গতানুগতিক ধারা থেকে আলাদা এক 'অন্য থিয়েটারের' জগৎ তৈরি হতে লাগল। বিপর্যয়ের মধ্যে মোড় ফিরল বাংলা নাটকের জগতে। তৃপ্তি মিত্রের কথায়, "অন্নবস্ত্রের অভাবে জর্জরিত এই দেশে—যে দেশের মানুষ একবেলা খেয়েও বা মাসে পনেরো দিন খেয়েও বেঁচে থাকার এক অপূর্ব কৌশল শিক্ষা করেছিল সেই বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ একবেলা খাবার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হল। শস্যশ্যামলা (?) গ্রামের মানুষ শহরের রাস্তায় এসে 'একটু ফ্যান দেবে গো' 'একটু ফ্যান' এই বলে দুর্বল গলায় যথাসাধ্য চীৎকার করতে করতে পরপারের রাস্তার সন্ধান পেতে থাকল। (ভাত চাইবার সাহস তাদের ছিল না!)। আর ঠিক তখনই 'সাধারণ রঙ্গালয়ে'র বাইরে আবার কতগুলো মানুষ জড়ো হল ওই 'ফ্যান দাও ট্র্যাজেডি'র একটা রূপ দেবার জন্য। জন্ম হল নবনাট্য আন্দোলনের। থিয়েটারের মোড় ঘুরল। তখন যদিও অনেকে (তার মধ্যে কিছু বুদ্ধিজীবীও ছিলেন) এই নাটক করাকে কোন মূল্যই দিতে চাননি (তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই)। তবুও দামাল শিশুর মত এই আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। আস্তে আস্তে এই শিশু যৌবন প্রাপ্ত হল, বাংলা নাটক আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। এর ছোঁয়া সাধারণ রঙ্গালয়েও লাগল। শিশিরবাবু প্রযোজনা করলেন 'দুঃখীর ইমান'। অবশ্য এটাই হয়তো একমাত্র, একইমাত্র উদাহরণ।

সাধারণ রঙ্গালয়ে'র পাশে পাশে অ-সাধারণ আশাবিহীন রঙ্গনাট্যও এগিয়ে চলল তার কর্তব্য সমাপনের ব্রত নিয়ে। হ্যাঁ ব্রতই বলব। কারণ এই কাজে ব্রতী যাঁরা ছিলেন তাঁরা এর থেকে কোন পয়সা পেতেন না। বরং নানা জায়গায় এই ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য টাকা তুলে আনতেন।

নাটকের মোড় ফিরল! একঘেয়েমি থেকে বাংলা মঞ্চের মুক্তি হল। কিন্তু তার জন্যে দরকার হল—একটা মহাযুদ্ধ, একটা দুর্ভিক্ষ, বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ লোকের অনাহারে মৃত্যু।" [৭৪] তাঁর নিজের মনে হয়েছে এরকম একটা বড় ধাক্কা না হলে হয়ত বাংলা নাটকের মোড় ফেরা সম্ভব হত না। এবং পরবর্তীকালে নাট্য জগতের পরিবর্তনের দিশারী এবং নতুন নাটকের স্রষ্টা বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন যাঁরা, সকলেই সে সময় কোনও না কোনভাবে গণনাট্য

"এমনি আজকে যাঁরা চলচ্চিত্র জগতে বিখ্যাত পরিচালক বা সঙ্গীত পরিচালক বলে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে এই 'ফ্যান দাও' নাটক থেকে দূরে ছিলেন না। তাই মনে হয় ইতিহাসের ধাক্কা বড় প্রচণ্ড।" তৃপ্তি মিত্র, শতবর্ষের নাটক, দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৯। পৃঃ ৪৫।

সঙ্ঘের সঙ্গে অল্প দিনের জন্য হলেও যুক্ত ছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যভাবনাই পরবর্তীকালের নাটকের পথ সূচিত করেছিল। বাস্তব জীবন, সমকালের মানুষের সংকটই হয়ে উঠেছিল নাটকের বিষয়বস্তু—অতি সাধারণ ভাষায়, অতি সাধারণ মানুষের কথা কিন্তু অতি সত্যি কথা। এভাবেই তৈরি হয়ে উঠল নতুন নাটক। স্বাধীনতার পর থেকেই নানারকম দলীয় মতভেদ ও অন্যান্য কারণে কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে গেল। গণনাট্য সঙ্ঘের ভেঙে যাবার কথা, এই সঙ্ঘের দুই শিল্পী তৃপ্তি মিত্র এবং শোভা সেনের লেখায় পাওয়া যায়। অন্যান্য কারণের সঙ্গে সঙ্গে শোভা সেন বলেছেন, "পার্টি নেতৃত্ব তখন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে এগিয়ে নিতে বিফল হয়েছেন। এরপর অবিশ্যি পার্টিও বেআইনী ঘোষিত হল। অনেকেই জেলে গেলেন থলি ধরার লোকই বা কোথায়?"[৭৫] স্বাধীনতার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৃপ্তি মিত্র বলেছেন, "এতদিন তো শুধু বলতে গেলে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য দুর্ভিক্ষেরই নাটক করে টাকা তোলা হয়েছে। এখন সে অবস্থা নয়। পুরো নাট্যবস্তুটাই কী করে আরও রঙে রসে ফুলে ফলে ভরে ওঠে তারই চিন্তা, আলোচনা। স্বাধীনতা কাগজে কলমে হলেই স্বাধীনতা হল না। এখানেও আমাদের নাটকের মধ্যে দিয়েই অনেক কিছু করবার আছে। তাছাড়া আমাদের নিজেদেরও অনেক শেখবার আছে, উপলব্ধি করবার আছে। নাটক করা শুরু করেছিলাম, যাকে বলে একটা মিশন বা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যেই। যে কারণেই হোক সেটাই হয়ে গিয়েছিল। তাই কিছু করতে গেলে সেটাকে একেবারে নাকচ করা সম্ভবই হত না। এখন সে বিবরণ শুনলে অনেকের হয়তো সেটা পাগলামি বলেই মনে হবে। পাগলামিই বটে। তবে এই ভেবে একটু ভাল লাগে যে সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে কতগুলো লোকের পাগলামির ফলেই তো আজ নাটকের এত দল! এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে।"[৭৬]

গণনাট্যের নাটক পাগল নতুনত্বের নেশায় মেতে ওঠা ছেলেমেয়েগুলোর কাছেও স্বাধীনতা স্বপ্নভঙ্গের হতাশাই শুধু নিয়ে এল। 'গোপীনাথ' ছবি শেষ করে তৃপ্তি মিত্র ও শম্ভু মিত্র যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, দেখলেন গণনাট্যের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যত নাটকের প্রস্তাব হতে লাগল, সবই নাকচ হয়ে যাচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। গণনাট্যের একাংশের শিল্পীরা মনে করেন, এর আগে কমিউনিস্ট পার্টির

সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট হলেও গণনাট্যকে কখনই রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের মাধ্যম করে তুলতে হয়নি নাটককে। প্রতিভাধর শিল্পীরা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা রূপায়নের মধ্য দিয়ে যথার্থ শিল্পসৃষ্টিই করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন মত পথের মানুষ এবং অ-রাজনৈতিক মানুষ এখানে এসে জড় হয়েছিলেন নতুন কিছু করার নেশায়, অন্য রকম কিছু করার আশায়, গতানুগতিক ছকটাকে ভাঙার আগ্রহে। ক্রমশ দেখা গেল, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষের আশু

‘কলকাতায় ফিরে দেখি আই. পি.টি.এ.র চেহারাই পাল্টে গেছে। যে উৎসাহে ‘অনেক নতুন ধরনের নাটক করবেন বলে শম্ভু মিত্র মনে মনে ঠিক করে এসেছিলেন দেখা গেল সে পরিবেশ এবং পরিসর আর নেই। সমস্তটাই যেন শ্রীহীন উদ্যানের চেহারা, অথচ কড়া মালীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। খুব পোক্ত করে বেড়া দেওয়া হয়েছে গরু ছাগল যাতে না ঢোকে, কিন্তু তার সঙ্গে যে জলসেচের ব্যবস্থাও বন্ধ হয়েছে সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। কিংবা অতর্কিতে যদি দৃষ্টি পড়েও থাকে কারো, হয় সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে না হয় তাদের উপেক্ষা না করে উপায় ছিল না।” —তৃপ্তি মিত্র, ‘ফ্ল্যাশব্যাক’, তিন, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃঃ ২১।

প্রয়োজনটা সরে গেলে পার্টির নেতৃস্থানীয়রা গণনাট্য সঙ্ঘকে কমিউনিস্ট পার্টিরই মুখপত্র করে তুলতে চাইল, ব্যাহত হল শিল্পীর স্বাধীনতা। যখন কোনভাবেই কিছু করা যাচ্ছে না, শিথিল হয়ে যাওয়া সম্পর্ক ডেকে আনল বিচ্ছেদ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মহঃ ইসরাইল, কলীম শরাফীরা গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তৃপ্তি মিত্রের কথায় এই সময়ের ছবিটি উঠে এসেছে। গণনাট্য সঙ্ঘের ভাঙনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তৃপ্তি মিত্র বলেছেন,—“সত্যি শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির কোথায় একটা বিরাট পার্থক্য আছে

“সম্পর্ক শিথিল হচ্ছিলই, এইবার একেবারে ছেদ হল। মহর্ষি, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, মহঃ ইসরাইল, কলীম শরাফী সবাই গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ....একটা বিরাট শিল্প সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠানের যে ইমারত গড়ে উঠেছিল, সারা ভারত যার শিল্পকর্মে চমৎকৃত হয়েছিল, আরও কিছু পাবার জন্য অপেক্ষা করছিল, তার ভাঙন শুরু হল।”—তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।

বোধহয়। ঠিক ঐ চরকা বা তাঁত যন্ত্রের সঙ্গে বাঁশী বা বেহালার পার্থক্যের মতই। মেলে না একেবারেই। তাই মেলাতে গেলে ছন্দপতন ঘটে। একটির গায়ের জোর গলার জোর বেশি বলে সেটি বোধহয় কেবল অপরটির ওপর বড্ড বেশি চেপে বসে। তাই বাঁশীর সুর বেসুরো বাজতে থাকে।

নাটক নিশ্চয়ই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হতে পারে, কিন্তু নাট্যশিল্পকে রাজনীতির তাঁবেদার করতে গেলে শিল্প নষ্ট হয়। তখন নাট্য বস্তুটাই হয়ে ওঠে প্রচারপত্র। খুব ভাল সার্থক পরিবেশনাও যদি হয় তবু তা সাময়িকভাবে অংশবিশেষ মানুষের প্রায় বাধ্যতামূলক ভাল লাগার বস্তু হয়ে ওঠে। মহৎ শিল্পের কথা তো দূর অস্ত!

তাই কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল গণনাট্য সংঘের বৃহৎ প্রতিমার প্রতিষ্ঠিত প্রাণ কোথায় চলে গেছে!”[৭৬]

গণনাট্যের পালা সাঙ্গ করে যাঁরা বেরিয়ে এলেন, নাটক করার ইচ্ছেটা তো তাদের সরে যায় নি, বরং সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে নতুন কিছু করা, নাটক করার জন্য তারা উন্মুখ।

"১৯৫০ সালের ১লা মে তে আমাদের দলের নাম 'বহুরূপী'। আর বহুরূপী নাম দিয়ে আমরা প্রথম যে নাটক করলাম —১৯৫০ সালের ১২ আগস্ট তার নাম 'উলুখাগড়া।' —তৃপ্তি মিত্র, ঐ, পৃঃ ২৫।

এইভাবেই এরা শুরু করলেন নতুন নাটকের মহড়া—নাটকও হল। তারপর ১৯৫০-র ১ মে নাটকের দলের নতুন নাম হল বহুরূপী। আগস্ট মাসে মঞ্চস্থ হল বহুরূপী'র প্রথম নাটক উলুখাগড়া।

যে নতুন নাটকের, নতুন ভাবনার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে গণনাট্যের প্ল্যাটফর্মে, তারই উত্তরসূরী পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটারগুলি। যারা কোন আর্থিক স্বার্থ না দেখে শুধুমাত্র আদর্শের জন্য, মনের তাগিদে নতুন নতুন নাটক তৈরির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যায়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে একদল নাটক পাগল ছেলেমেয়ে নাটককে ভালবেসে সূচনা করে নবনাট্য আন্দোলনের—এক সুস্থ নাট্যবোধ, নাট্যধারা তথা জীবনবোধের। তারা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে, নিজের সমস্ত সুখ সুবিধে বিসর্জন দিয়েছে, পাগলের মত ছুটে বেরিয়েছে তাদের স্বপ্ন সার্থক করে তোলার জন্য—নতুন ভাবনা, নতুন আঙ্গিকের নাটকের মধ্য দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে চেয়েছে, বদলাতে চেয়েছে সমাজটাকে। সমাজ বদলের নেশায়, মানুষের অবক্ষয়িত মানসিকতা বদলের খেয়ালে হাতিয়ার হয়েছে তাদের নতুন ভাবনার নাটক। এই নাটক কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র নয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, সুস্থ চেতনা সম্পন্ন মানুষের সমাজ বদলের ভাবনা। '৫০-র দশকে ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে অনেকগুলি ছোট-ছোট নাটকের দল—'গ্রুপ থিয়েটার' নামে যাদের পরিচিতি। এই দশকে বহুরূপী ছাড়াও ছিল উৎপল দত্তের এল. টি. জি., লিটল থিয়েটার গ্রুপ। তারা তখন শেক্সপীয়ার প্রযোজনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। অন্যদিকে বহুরূপী মৌলিক নাটক ছাড়াও কোন কোন বিখ্যাত বিদেশী নাটকের বাংলা অনুবাদ এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গল্প-উপন্যাসকেও সার্থক নাট্যরূপ দিতে লাগল। বিদগ্ধ দর্শকদের কাছে তাদের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি হতে লাগল। ১৯৫০-র ডিসেম্বরের শেষ থেকে ১৯৫১-র ১ জানুয়ারি বহুরূপীর প্রথম নাট্যোৎসব হয়। —"সাড়া পাওয়া গেল খুব। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহুরূপীর নাটকগুলোর খুব প্রশংসাও বের হল। এবং বহুরূপী নামটার সঙ্গে জনসাধারণের একটা পরিচিতি ঘটে গেল।"[৭৭] এবং ক্রমশ ভারতবর্ষের দর্শক সমাজের কাছেও স্বীকৃতি পেতে থাকে বহুরূপীর প্রযোজনাগুলি। আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বপন মজুমদারের কথায়, "অন্যদিকে যেন এক সৃষ্টির উৎসব শুরু হয়ে গেল অপেশাদার বাংলা নাট্যে। বিশ্বনাট্যের উত্তরাধিকার স্বীকার করে গণনাট্য বিকশিত হয়ে উঠল নবনাট্যে। বহুরূপীর অনুবর্তী হয়ে চলতে শুরু করে উৎপল দত্তের 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' (১৯৫৩), তরুণ রায়ের 'থিয়েটার সেন্টার' (১৯৫৪), সবিতাব্রত দত্তের 'রূপকার' (১৯৫৫), পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও মনোজ মিত্রের

'সুন্দরম্' (১৯৫৭), বীরেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাসের 'শৌভনিক' (১৯৫৭), শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'থিয়েটার ইউনিট' (১৯৫৮), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপেন সেনগুপ্তের 'নান্দীকার' (১৯৬০), জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের 'মাস থিয়েটার' (১৯৬০) প্রভৃতি। আন্দোলনের কেন্দ্র অবশ্য সরে এল গণনাট্য থেকে। যদিও আদর্শগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণ পাল্টাল না।"[৭৮]

নতুন দলগুলির কোন নির্দিষ্ট মঞ্চ ছিল না, তারা বিভিন্ন মঞ্চের ফাঁকা সময়গুলিকে কাজে লাগাত। এই দশকেই বহুরূপীর 'রক্তকরবী' প্রযোজনা সর্বভারতীয় নাটকের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেল। স্বপন মজুমদারের লেখায় উঠে এসেছে গ্রুপ থিয়েটারের অসাধারণ প্রয়াসের সত্যিকারের ছবিটি। —"নিজস্ব মঞ্চ নেই, বিত্তবান প্রযোজক নেই, নেই তৈরি দর্শক, নেই শিল্পীদের পারিশ্রমিক, এতসব নেইয়ের মধ্যে শুধু অনুরাগ, শিল্পানুভূতি আর শিল্পানুরাগের গুণে কী করা যায়, তার প্রমাণ করলেন 'রক্তকরবী' (১৯৫৪) তে।"[৭৯] সত্যিই তাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু তাদের আদর্শ ও স্বপ্নের সততা এবং অনুশীলনই এনে দিয়েছিল সার্থকতা। পেশাদারী থিয়েটারের বাধার মুখে এবং তাদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় শুধু মাত্র নতুন ভাবনা, আদর্শবোধ ও আত্মশক্তির মূলধন নিয়ে তাঁরা নাটককে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছিলেন, পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে। এল.টি.জি.র প্রযোজিত 'ম্যাকবেথে'র প্রসঙ্গে শোভা সেন বলেছেন, "নাটকটা জমে গিয়েছিল। তার সাফল্য বোঝা গেল যখন কল-শো আসতে লাগল একের পর এক। আমরা ভাবতেও পারিনি, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে শ্রমিক অঞ্চলে সর্বত্র 'ম্যাকবেথ'-এর এতটা চাহিদা হবে। আমরাও করে চলেছি। সে এক কর্মকাণ্ড। আমাদের ছেলেরাই মঞ্চ লাগায়, লাইট ও মাইক সামলায়।"[৮০]

নতুন কিছু করার তাগিদে, আদর্শের নেশায় মেতে ওঠা একদল ছেলেমেয়ে এসে জুটেছিল এই সমস্ত নাটকের গ্রুপগুলিতে। নাটকের নেশায় উনিশ শতকের শেষ থেকেই

তৃপ্তি মিত্র বলেছেন, "........এই অন্য থিয়েটারের নব্বুই ভাগ মানুষ নির্ভেজাল নাটক পাগল। পুরুষদের পক্ষে তো এ পাগলামি কবে থেকেই স্বীকৃত। আর উনিশ শতকে মেয়েরা যখন নাটক করতে এলেন, তাঁরা এর মর্ম বুঝে আসেননি, এসে বুঝেছিলেন ক্রমে ক্রমে। গতানুগতিক সমাজের চোখে নিকৃষ্ট জীবনযাপনের থেকে সে জীবন পুরো ছাড়তে না পারলেও একটা মুক্তি অনুভব করেছিলেন। তাই তো অত সব সুন্দর চরিত্র চিত্রনের কথা শুনি।

গণনাট্য সঙ্ঘে যে সব মহিলারা এসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সচেতনভাবেই এসেছিলেন। কেউ রাজনীতির জন্য, কেউ কেউ বা সমাজসেবা, মানবসেবার কথা ভেবে। কিছু একটা করবার তাগিদে। তবু চল্লিশের দশকে কাজটা খুব সহজ ছিল না। সে যে থিয়েটারেই হোক না কেন।"
—তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ —৫১।

মেতে উঠেছিল বাঙালি পুরুষ। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে দেখা গেল শুধু পুরুষরাই নয়, আদর্শ পাগল নতুনত্বের স্বপ্ন দেখা শিক্ষিত মেয়েরাও ক্রমশ এসে জুটে যাচ্ছে গণনাট্য সঙ্ঘে এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে ছোট-ছোট নাটকের দলগুলিতে। নাটক করতে

গিয়ে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হত মেয়েদের। এই সমস্ত গ্রুপগুলো যখন কলকাতার বাইরে কোথাও কল শো করতে যেত, নাটক সেরে ফিরতে ফিরতেই তাদের মাঝরাত হয়ে যেত। মেয়ে বা বৌ'র মাঝরাতে বাড়ি ফেরা কোন পরিবারই মেনে নিত না, নেয় না। পারিবারিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেও অনেক মেয়ে চেষ্টা করত নাটক করার কিন্তু দেখা যেত লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একদিন সে থিয়েটার করা ছেড়ে দেয়। সেই সময় অর্থের প্রয়োজনে মেয়েরা বাড়ির থেকে বেরিয়েছে, চাকরি নিয়েছে কিন্তু যেখানে কোন অর্থকরী লেনদেন নেই শুধুমাত্র আদর্শের জন্য, শখের জন্য মেয়ে-বৌর নাটক করে দুপুর রাতে বাড়ি ফেরা বা নিয়মিত মহলা দিতে যাওয়া মেনে নেবার মত পরিবার আদৌ আছে কি? মেয়েরাও তাই বাধ্য হত মাঝপথে নাটক ছেড়ে দিতে, গ্রুপগুলি পডত্ বিপদে। শোভা সেন বলেছেন, "মাঝরাতে মেয়ে বা বোন বা বৌ থিয়েটার করে বাড়ি ফিরলে যে কোন গৃহস্থ বাড়িতেই নানা বিরূপ মন্তব্য ও ব্যবহার মিলবেই। যত রাত বাড়ে মেয়েদের বুক দুরদুর করতে থাকে। এভাবে কিছুদিন লড়াই চলার পর সে মেয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে থিয়েটার করাই বন্ধ করে দেয়। কত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে এইভাবে। গ্রুপও বিপদে পড়ে।"[৮১]

সমাজের এবং জীবনের সব ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণেই মেয়েদের বিশেষ কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়, যা শুধু তাদেরই। সমবয়স্ক, সমযোগ্যতা সম্পন্ন এবং সমমনোভাবাপন্ন পুরুষকে এই দায় ভোগ করতে হয় না। তবুও দেশের জন্য কিছু একটা করার তাগিদে, দুর্ভিক্ষ পীড়িত বিপর্যস্ত মানুষের প্রয়োজনে ছেলেদের পাশাপাশি বহু সংখ্যক মেয়েরাও এগিয়ে এসেছিল নাটক করতে। অভিনয়ের নেশায় প্রথমে তারা আসেন নি, এসেছিলেন দেশের কাজ করার তাগিদে। পরে সেই অভিনয়ই হয়ে উঠল তাদের কারুর কারুর নেশা এবং পেশাও। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও থিয়েটারে মেয়েরা এসেছে, আসছে, কাজ করে যাচ্ছে—কখনো অর্থের তাগিদে, কখনো বা খেয়ালের বশে আদর্শের তাগিদে। থিয়েটার করতে গিয়ে তারা সব কিছু ছেড়েছে।

তৃপ্তি মিত্র বলেছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। দুর্ভিক্ষেরও শেষ। দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তোলার প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের নাটক করার প্রয়োজন ফুরোল না। তাই আমার ডাক্তার বা রাজনৈতিক কর্মী বা সমাজসেবিকা কিছুই হওয়া হল না। আমি পুরোপুরি অভিনেত্রীই হয়ে গেলাম।" —তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ —১৯।

গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এবং তার পরবর্তীকালে কিভাবে বাংলা নাটকের এক নতুন যুগ তৈরি হয়ে উঠেছিল, তৃপ্তি মিত্রের লেখায় তার বিবরণ পাওয়া যায়— "প্রচলিত এবং সমসাময়িক ধারাটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার প্রবণতা, তার ফলেই শুরু হল এই নতুন পর্ব। যার সঙ্গে কোন দিক থেকেই আর আগের থিয়েটারের সঙ্গে কোন মিল ছিল না। নাটকে নয়, আঙ্গিকে নয়, অভিনয় ধারায় নয়. আবহ সঙ্গীতে নয়। এই নাটকে নায়ককে রাজা, জমিদার বা কোন মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিতও হতে হয় না। সেই চটের সামনে একটা বেঞ্চ বসিয়ে অনায়াসেই তৈরি হতে পারে কলকাতার পার্ক।

গাঁয়ের ভাষায় dialect বললে হয়তো আরও স্পষ্ট হবে, সেই dialect-এ কথা বলে চাষা সেজে তৈরি হতে পারে এক নতুন অভিনয় শৈলী। এর উদ্দেশ্য তখন ছিল হয়তো এক বিশেষ মনোভাব বা মতবাদকে প্রকাশ করা, উলঙ্গ সত্যের মুখোমুখি করা সবাইকে। কিন্তু তারই ফাঁকে তৈরি হল এক নতুন অভিনয় ধারা।"[৮২]

নাটকের পাশাপাশি চলচ্চিত্রেও এক নতুন ধারার সূচনা হল পঞ্চাশের দশক থেকেই। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত অনেক শিল্পীরাই পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তারা তখন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রচলিত ধারাটিকে ভাঙতে চাইছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ছিন্নমূল' ছবির নায়িকা শোভা সেন বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা—"নতুন ধরনের চলচ্চিত্র করবার মানসে তিনি বেছে নিয়েছেন দেশভাগ ও বাস্তুচ্যুত মানুষের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের সন্ধানে দিশাহারা যন্ত্রণার ইতিহাস। নায়িকা চরিত্রের জন্য নির্বাচিত করেছেন আমাকে।"[৮৩] ছিন্নমূল ছবিটিকে প্রথম বাস্তবধর্মী বাংলা চলচ্চিত্রের সম্মান দেওয়া হয়। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এটাও ছিল একটা experiment। শোভা সেন বলেছেন যে, একদিন গণনাট্য সঙ্ঘের এক সহশিল্পী নিমাই ঘোষ এসেছিলেন 'ছিন্নমূল' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অনেক দিনের বহু চেষ্টায়, নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু অর্থকরী সাফল্য আনতে পারেনি। সম্ভবত নতুন ধ্যানধারণা, স্বতন্ত্র বক্তব্য সমন্বিত অন্য ধরনের ছবিটি তখনকার সাধারণ দর্শক গ্রহণ করতে পারেন নি। ১৯৫১-তে চলচ্চিত্রকার পুডভকিন ও রুশ অভিনেতা চেরকাশভ ভারত ভ্রমণে এসে ভারতীয় ছবি দেখতে চান। পুডভকিন যতগুলি ভারতীয় ছবি দেখেন তার কোনটাতেই তিনি ভারতীয় জীবন এবং মানুষকে খুঁজে

স্বপনকুমার ঘোষের কথায়, "লাইট হাউস মিনিয়েচারে 'ছিন্নমূল' দেখতে দেখতে পুডভকিন উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'হিয়ার আই সি ইওর কান্ট্রি, হিয়ার আই সি ইওর পিপ্‌ল...........।" বলা বাহুল্য এই ছিন্নমূল ছবিটিকে আজও প্রথম বাস্তবধর্মী বাংলা ছবি বলা হয়। এক অর্থে প্রথম বাস্তবধর্মী ভারতীয় ছবিও। ছবিটিকে কেউ কেউ 'পথের পাঁচালী'র সলতে পাকাবার ইতিহাসে রীতিমত উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবেও চিহ্নিত করে থাকেন।" —স্বপন কুমার ঘোষ, 'সেদিন সিনেমা। এল ছবির নতুন ভাষা।" আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই, ১৯৯৩ পৃঃ ৪।

পাননি। সবকটিই তাঁর মতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছবি। তখন লাইট হাউস মিনিয়েচারে তাঁদের নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ছিন্নমূল দেখতে দেখতে পুডভকিন বলেন, 'হিয়ার আই সি ইওর কান্ট্রি, হিয়ার আই সি ইওর পিপল......।'[৮৪] এই ছবির নিজস্বতাই মুগ্ধ করেছিল পুডভকিনকে। শোভা সেনের কথায়, "নিমাইবাবু তাঁর এই প্রচণ্ড বলিষ্ঠ সাহসিকতার পুরস্কার পেলেন ১৯৫৩ সালে—যখন সোভিয়েত চলচ্চিত্রের দুই দিকপাল এখানে চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে এলেন। পুদভকিন সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের অন্যতম। চেরকাসভ আইজেনস্টাইনের 'আলেকজান্দর নেভস্কি' ও 'আই ডান দ টেরিবল' এর নাম ভূমিকাভিনেতা। তাঁরা এলেন, 'ছিন্নমূল' দেখলেন, অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। তাঁদেরই উৎসাহে ছবিটি সোভিয়েত ইউনিয়ন কিনল, নিমাই ঘোষ মস্কোয়

আমন্ত্রিত হলেন। তাতে প্রযোজক শ্যামল দে বাঁচলেন। নিমাইবাবুও আন্তর্জাতিক পরিচালক রূপে স্বীকৃতি পেলেন। আমরা 'ছিন্নমূল'-এর শিল্পীরাও তাতে আনন্দিত ও গর্বিত।"[৮৫] বাংলা চলচ্চিত্রের পেশাদারী গতানুগতিকতায় নাড়া দিল নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'। দেশভাগের ধাক্কায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু জীবনের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় ছবিটি। সেই ঘটনাই তখন '৫০-এর দশকে বাঙালি জীবনের যন্ত্রণাময় বর্তমান।

ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল বোম্বাইতে ১৯৫২-য়। সেখানে মূলত ইতালিয়ান, ফরাসি, জাপানি ছবি দেখানো হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের

> *"ওই উৎসব যুদ্ধোত্তরকালীন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের নবীন রূপটি এ দেশের দর্শকের সামনে তুলে ধরে। এককথায় দর্শকের চোখ খুলে দেয়। দর্শক রুচিতে বিরাট এক বিপ্লব ঘটে যায়। '৫২-র আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন ভারতের কিছু সংখ্যক পরিচালক। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শুরু হয় নতুন পথ, নতুন রূপের জন্য অস্থির সন্ধান। যার ফলশ্রুতিতে ঘটল সবচেয়ে বড় ঘটনা। 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায়ের অভ্যুদয়। 'পথের পাঁচালী' ভারতীয় ছবিতে এনে দিল নতুন ভাষা।" পূর্বোক্ত।*

প্রতিনিধিত্ব করে রাজকাপুরের 'আওয়ারা'। এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের রূপ ও ভাবনা এদেশের দর্শকের সামনে তুলে ধরল। তাদের ভাবনার ধারাটা বদলে গেল। ভারতীয় চলচ্চিত্রে শুরু হল নতুন পথের সন্ধান। এর আগে চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কলকাতারই কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখের খেয়ালে গড়ে উঠেছিল ফিল্ম সোসাইটি। ১৯৪৯-'৫০-এ 'দ্য রিভার' ছবির শুটিং উপলক্ষে জাঁ রেনোয়ার ভারতে আগমন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রেনোয়ার কাছ থেকে এই সমস্ত সিনেমা পাগল তরুণদের 'হাতে-কলমে' সিনেমা তৈরির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। রেনোয়া তাঁদের নতুন ভারতীয় সিনেমার স্বপ্ন দেখালেন। জাঁ রেনোয়ার কলকাতায় আসার প্রসঙ্গটি বিজয়া রায়ের 'নিজের কথা'য় উঠে এসেছে—"জাঁ রেনোয়া কলকাতায় এলেন, তখন আমাদের বিয়ে হয়েছে। তিনি যখন প্রথম এসেছিলেন তাঁর 'দ্য রিভার' ছবির জন্য লোকেশন দেখতে, মানিকের কথায় ভীষণ ইমপ্রেস্‌ও হয়েছিলেন। সিনেমায় এত আগ্রহ দেখে তিনি মানিককে খুব এনকারেজ করেছিলেন।"[৮৬] প্রচলিত মূল্যবোধের পরিবর্তে জন্ম নিল নতুন ভাবনা—তারই ফসল নতুন বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমা। ঋত্বিক ঘটক প্রসঙ্গে শোভা সেন বলেছেন, 'ও বলত, একবার সুযোগ পেলে ও দেখিয়ে দেবে ভাল ছবি কাকে বলে। বস্তা পচা গতানুগতিক ছবির মোড় ঘোরাতে চেয়েছিল ঋত্বিক।'[৮৭] 'নাগরিক' ছবি প্রসঙ্গে ঋত্বিকের কাজ করবার ধরন সম্পর্কে বলতে গিয়ে শোভা সেন বলছেন, 'অভিনয়ের ব্যাপারেও ওর চিন্তাভাবনা অন্য ধরনের ছিল। ও যখন 'নাগরিক' করে তখন আমি বাইরে কমার্শিয়াল ছবি অনেক করি। ও আমায় সবসময়ই বলত, অভিনয়ের কিছুই জানো না, শেখোনি। আমিও ওর সব গালাগাল বিদ্রূপ সহ্য করতাম, বুঝতাম ওকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না বলেই ওর এই ক্ষোভ।"[৮৮] 'মেঘে ঢাকা তারা'য় অভিনয়ের দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুপ্রিয়া দেবী বলেছেন ঋত্বিক ঘটকের নতুন ভাবনার কথা, রিয়ালিজম্-এর

প্রতি আগ্রহ এবং অসাধারণ ডিটেলের কাজের কথা—"ঋত্বিকদার কিছু মানসিকতা এই ছবির বিরাট একটা প্লাস পয়েন্ট। যেমন উনি সবসময় বলতেন, আমরা এই ছবির শিল্পীরা ভীষণভাবেই উদ্বাস্তু। কিন্তু এককালে যখন আমরা ওপার বাংলায় থাকতাম, তখন আমাদের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার ছিল। নীতার বাবা একবার নীতাদের পাহাড়েও বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি শিক্ষকতা করতেন। আর সেই জন্যই বোধহয় আর পাঁচটা উদ্বাস্তু পরিবার যেমনভাবে জীবনধারণ করতেন, সেইভাবেই উনি কাজ করতেন। খুব সকালে উনুন ধরানো, অফিসের ভাত রাঁধা। আর ঠিক সেই সময় সকালের রোদ এসে বেড়ার ফাঁক দিয়ে যে ঝিলমিল আলোটা ফেলত সেটা তিনি ছবিতে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। নীতারা যে ঘরটায় থাকত তার ঠিক পাশে একটি পুকুর ছিল। পুকুরে দুপুরে যখন রোদের আলো এসে পড়ত আর সেই আলো নীতার মুখে এসে খেলা করত সেটাও উনি কাজে লাগিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে চারিদিকে যখন অন্ধকার, সেই সময় নীতার দাদার কাছে গান শিখতে চাওয়া। চারিদিক যখন শুনশান, অন্ধকার, সেই সময় নীতার গলায় কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া। সেই শুটিং হয়েছিল গভীর রাতে। সেই রক্ত পড়ার দৃশ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রাত বোধহয় বারোটা, শটটা ছিল নীতা গমকে গমকে কাশছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, পাছে বাবা কাশির আওয়াজ শুনতে পায়। নীতা মুখ চেপে কাশছে, ঠিক

"পরোক্ষভাবে রেনোয়া প্রত্যেককে ভারতীয় সিনেমার প্রচলিত মূল্যবোধকে ঝেড়ে ফেলে নতুন ভারতীয় সিনেমার স্বপ্ন দেখালেন। আরও বললেন, 'ইউ ক্যান শেক হলিউড আউট অফ ইয়োর সিসটেম, ইউ উইল বি মেকিং গ্রেট ফিল্মস।' এল ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম্ বা নয়া বাস্তববাদ। নতুন ভারতীয় সিনেমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। সার্থক চেহারা নিয়ে হাজির হল সত্যজিতের অপরাজিত, পরশপাথর, জলসাঘর এবং অপুর সংসার।" স্বপন মজুমদার,

সেই সময় গল গল করে নীতার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্যাঁচা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ডেকে উঠল। ঋত্বিকদা চিৎকার করে কাট বলে এক ছুটে সাউন্ড ভ্যানের কাছে গিয়ে বললেন, ওই—প্যাঁচার ডাকটা আমার চাই।"[৮৯] প্রচলিত মূল্যবোধ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় সিনেমার নতুন প্রজন্ম বাংলা সিনেমায় নিয়ে এল ইতালিয়ান নিওরিয়ালিজম, নয়া বাস্তববাদ। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ছবি তৈরির পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিজয়া রায় বলেছেন", 'বাইসাইকল থিভ্স' দেখে মানিক রিঅ্যালাইজ করল যে ঐভাবে তো ছবি করা যায়! নন-অ্যাকটার্স বা অপেশাদারদের নিয়ে—স্বাভাবিক আউট ডোরে শুটিং করা যায়—বৃষ্টির মধ্যেও ছবি তোলা যায়—সবই করা যায়—তাহলে আমিই বা পারবো না কেন?"[৯০] কমার্শিয়াল সিনেমার পাশাপাশি বাংলা সিনেমার এক নতুন ধারা তৈরি হল, বাংলা সিনেমার উত্তরণ ঘটল, শুধুমাত্র অবসর বিনোদনের উপকরণের স্তর অতিক্রম করে স্পর্শ করল বিদগ্ধ পাঠকের মননশীলতা, সচেতন ভাবনার স্তর।

১৯৫৫-তে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' কলকাতায় মুক্তি পায়, এবং '৫৭-র জানুয়ারিতে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'Best Human Document' হিসেবে সম্মানিত হয়। পথের পাঁচালী থেকে শুরু হল বাংলা সিনেমার এক নতুন ধারা, স্পর্শ করল শিল্পের সূক্ষ্মতম স্তর। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে ডিটেলের প্রতি তাঁর অসম্ভব যত্নের কথা বলেছেন "পথের

পাঁচালী'র 'দুর্গা" উমা দাশগুপ্ত (সেন)—"যেদিন দরকার সেদিন যখন বৃষ্টির মেঘটা এল, সকলের কী আনন্দ। কী চেঁচামিচি সব বৃষ্টি দেখে। আসলে ডিটেলের প্রতি এত যত্ন

সর্বজয়া চরিত্রাভিনেত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "সত্যজিতের বাস্তবতা' সম্পর্কে আমার নতুন কিছু বলার নেই, ছবিতেই তার পরিচয়। কিন্তু আমি অনেক সময় সেই বাস্তবতার শিকার হয়েছি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। সর্বজয়া রান্নাঘরে উনুনের সামনে বসে। হরিহর এসে ঢোকে, বলে কী রাঁধছ? ইত্যাদি। শট আর হয় না, সমস্ত যখন রেডি, তখন একটা মেঘ এসে আলোকে ম্লান করল, বা ঠিক সেই সময়ে ডায়ালগের মধ্যে কোকিল ডেকে উঠল বা বেড়ালের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল মুখের কথার আওয়াজকে। আমি বসেই আছি জ্বলন্ত কাঠের চুলোর সামনে আগুনের হলকায় লাল মুখ করে। বার কয়েক শট বন্ধ হওয়ার পরে সাঙ্ঘাতিক বদমেজাজী আমি 'রিয়ালিজমকে গাল দিতে দিতে উঠে চলে গেলাম।" —করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ, বিশেষ সত্যজিৎ সংখ্যা, পৃঃ ১২৮।

ছিল।"[৯১] সত্যজিৎ রায়ের অভিনয় ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মাধবী চক্রবর্তী 'রিয়ালিজম্' এর প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন অন্য পরিচালকের ছবিতে 'এ্যাকটিং' করতে হয় কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে 'শুধু ফীল করলেই যথেষ্ট'। মাধবী চক্রবর্তীর নিজের কথায়—"এই প্রথম সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যখন আমরা যাই অভিনয় করতে তখন বুঝতে পারি যে না এ্যাকটিং করার কোনো দরকার নেই। ফিল্ম একটা এমনই অদ্ভুত মিডিয়াম যেখানে 'এ্যাকটিং'-এর কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু ফীল করলেই যথেষ্ট। ক্যামেরাটা এতো বেশি সেন্‌সেটিভ যে সেখানে একটা চোখের পাতাও ভেবে ফেলতে হবে। তারও একটা অর্থ তৈরি করা যায়, একটা চোখের পাতা ফেলা বা না ফেলা দিয়ে। চরিত্রের সঙ্গে মিশে গেলে অটোম্যাটিক্যালি সেগুলো বেরিয়ে আসবে।"[৯২] সত্যজিতের পরিচালনা-পদ্ধতি, ভাবনা, অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণাই বদলে দিয়েছিল—বাংলা সিনেমায় তৈরি হয়েছিল এক নতুন যুগ। এই দশকেই পর পর মুক্তি পায় তাঁর আরও কয়েকটি ছবি—'অপরাজিত' ('৫৬), 'পরশপাথর' ('৫৭), 'জলসাঘর' ('৫৮), 'অপুর সংসার' ('৫৯), 'দেবী' ('৬০)। ১৯৫৯-এর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে সমাদৃত হয় 'অপুর সংসার'। প্রচলিত ধারাকে বদলে দিয়ে চলচ্চিত্রকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিলেন সত্যজিৎ রায়। তিনি সিনেমার এক 'আর্টফর্ম', একটি নতুন দিক তুলে ধরেন। এই ধারায় পাই তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনকে।

১ রেণু চক্রবর্তী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি 'চলার পথে', ১৯৯৩, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা', পৃঃ ১৩।

২ বীণা দাস, "শৃঙ্খল ঝঙ্কার", পৃঃ ১২৯।

৩ পূর্বোক্ত।

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৩।

৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।
৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।
৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮
৯ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২-১৩।
১০ ফুলরেণু গুহ, 'স্বাধীনতার আগে-পরে : নানা মুখ' "এলোমেলো মনে এলো", পৃঃ ৪৬।
১১ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১০৫।
১২ সাধনা রায়চৌধুরী, 'আত্মরক্ষা সমিতির স্মৃতি', একসাথে, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ১২৮।
১৩ বিমলা ফারুক্বী, 'ভারত ও পাকিস্তানের মেয়েদের ওপর দেশবিভাগের আঘাত'—'চলার পথে', স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃঃ ৪৭।
১৪ পূর্বোক্ত।
১৫ কনক মুখোপাধ্যায়, "নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা", পৃঃ ১০৫।
১৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৫।
১৭ রেণু চক্রবর্তী, 'মোহভঙ্গ ও সংগ্রাম', নারী আন্দোলনে কমিউনিস্টরা, পৃঃ ৯৩।
১৮ ইরা শর্মা, 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা', একসাথে, পূর্বোক্ত, বৈশাখ ১৪০১, পৃঃ ৮৭-৮৮।
১৯ রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃঃ -৯৩।
২০ অনিলা দেবী, 'যে স্মৃতি ভোলার নয়', 'একসাথে', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪।
২১ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ২০৩।
২২ প্রভা চ্যাটার্জি, 'তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলি', একসাথে, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০১।
২৩ অপর্ণা পালচৌধুরী, 'নারী আন্দোলনের স্মৃতি', একসাথে, বৈশাখ ১৪০১।
২৪ ইলা মিত্র, আমার জানা পূর্ব বাংলা, "ইলা মিত্র", মালেকা বেগম, পৃঃ ১০৪।
২৫ ইলা মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।
২৬ ইলা মিত্র, জবানবন্দী—বদরুদ্দীন ওমর—"পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি", প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১।
২৭ কমলা দাশগুপ্ত, "রক্তের অক্ষরে", পৃঃ -১৪৬।
২৮ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনেব রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১০৯।
২৯ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১২৯।
৩০ অমলেন্দু দে, 'সাত দশক', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই, ১৯৯৪।
৩১ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত।
৩২ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ১৮২।
৩৩ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত।
৩৪ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮১।
৩৫ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।
৩৬ 'Introduction, Unemployment among women in West Bengal'—Directorate of National Employment Service, West Bengal, 1958, Chapter–1, Pg–I.
৩৭ পূর্বোক্ত।
৩৮ রাণী দাশগুপ্ত, 'দেশভাগ উদ্বাস্তু ও মেয়েরা', চলার পথে, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃঃ ৪৫।

৩৯ দীপালি চক্রবর্তী, গ্রুপ থিয়েটারের 'হারিয়ে যাওয়া চার কন্যা', বর্তমান, চতুষ্পর্ণী, ১৯ এপ্রিল, ১৯৯৭।
৪০ তাপসী দাস, পূর্বোক্ত।
৪১ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, 'অভিমানী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়', সুকন্যা, ১৬-৩০ এপ্রিল, ১৯৮৫।
৪২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ জুলাই ১৯৯৩।
৪৩ মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ২২৯।
৪৪ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত।
৪৫ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত।
৪৬ অপরাজিতা গোপ্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৮.৪.৯৮ তারিখে।
৪৭ পূর্বোক্ত।
৪৮ কনক মুখোপাধ্যায়, "নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা", পৃঃ ১৬৩।
৪৯ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ -২৮৪।
৫০ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৫।
৫১ অপরাজিতা গোপ্পী—সাক্ষাৎকার ১৮.৪.৯৮ তারিখে।
৫২ হামিদা রহমান, "জীবনস্মৃতি", পৃঃ ৬০।
৫৩ হামিদা রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।
৫৪ মহম্মদ আবদুল হান্নান, "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস" (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ৫।
৫৫ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ -২৪৩।
৫৬ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।
৫৭ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ (২৪৫-২৪৬)।
৫৮ মৃণালিনী দাশগুপ্ত (মুখোপাধ্যায়), 'আমার রাজনৈতিক চেতনা ও বিকাশ'।
৫৯ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ -২৪৮।
৬০ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত-।
৬১ শান্তিসুধা ঘোষ, "জীবনের রঙ্গমঞ্চে", পৃঃ ১৩৩।
৬২ মৃণালিনী দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।
৬৩ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭।
৬৪ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭।
৬৫ মালিনী তুলপুলে, গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম, ঘরে বাইরে, ভাদ্র ১৩৬২।
৬৬ পূর্বোক্ত।
৬৭ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫১।
৬৮ সম্পাদকীয় ঘরে বাইরে, চৈত্র ১৩৬২।
৬৯ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ (১৫২-১৫৩)।
৭০ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৬।
৭১ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮।
৭২ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯।
৭৩ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৪।

৭৪ তৃপ্তি মিত্র, শতবর্ষের নাটক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।
৭৫ শোভা সেন, "স্মরণে বিস্মরণে, নবান্ন থেকে লাল দুর্গ", পৃঃ -(২০-২১)।
৭৬ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১।
৭৭ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।
৭৮ স্বপন মজুমদার, 'গণনাট্য থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র সরে এলে নবনাট্যে', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৬।
৭৯ পূর্বোক্ত।
৮০ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯।
৮১ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০।
৮২ তৃপ্তি মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯।
৮৩ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
৮৪ উৎস : স্বপনকুমার ঘোষ, 'সেদিন সিনেমা। এল ছবির নতুন ভাষা'। আনন্দবাজার পত্রিকা, পূর্বোক্ত, সংখ্যা, পৃঃ ৪।
৮৫ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
৮৬ বিজয়া রায়, 'নিজের কথা', এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯, পৃঃ ২৯০।
৮৭ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৩।
৮৮ শোভা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৪।
৮৯ সুপ্রিয়া দেবী, 'আমার জীবন আমার উত্তম', সানন্দা, পৃঃ ৫৮।
৯০ বিজয়া রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৩।
৯১ উমা দাশগুপ্ত (সেন), 'আমাদের নিয়ে কাজ করেছেন', দেশ, বিশেষ সত্যজিৎ সংখ্যা, ২৮ মার্চ, ১৯৯২, পৃঃ -১২৯।
৯২ মাধবী মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী), সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে 'মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার', নন্দন জুলাই ১৯৯২, পৃঃ ১১৯।

পরিবর্তনের কালপর্ব '৬০—'৭২

১৯৬১ ১৮-২১ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলন।

— : রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব পালন।

— : 'পণ-প্রথা' বিরোধী আইন পাশ হয়। পণ দেওয়া বা নেওয়া আইনত অপরাধ বলে ঘোষিত হয়।

— : 'মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট'-এ সন্তানসম্ভবা চাকুরিরতা মেয়েদের জন্য কলে-কারখানায়, সরকারি-অফিসে বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা আইনী স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৬২ তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এক তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কংগ্রেস কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকার গঠন করে।

২০ অক্টোবর : ভারত, চীনের পারস্পরিক মতভেদের পরিণতিতে চীন যুদ্ধ ঘোষণা করল।

: চীন ভারত প্রশ্নে মতভেদ শুরু হল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে।

: ভারতীয় সংবিধানের ১৫২ ধারায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ভারতরক্ষা আইন জারী করা হল।

১৯৬৪ —ভাগ হয়ে গেল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। অতি বামপন্থীরা তাদের নামের শেষে 'মার্কসবাদী' শব্দটি ব্যবহার করতে লাগলেন। —সি. পি. আই. এবং সি. পি. আই(এম) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা।

২৭ মে : জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু।

১৬ আগস্ট : খাদ্যের দাবিতে কলকাতায় বিরাট মিছিল হয়।

২৫ আগস্ট : খাদ্যের দাবিতে কলকাতায় সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

২২ নভেম্বর : কমিউনিস্ট বন্দীরা দমদম জেলে অনশন ধর্মঘট করেন।

২২ নভেম্বর : মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তীর আহ্বানে একটি কনভেনশন হয়।

১৯৬৫ —বছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি বন্দীমুক্তি, ভারত রক্ষা আইন প্রত্যাহার ও খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

	১৭ জুলাই	: পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ডাকে নিত্য জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মহিলাদের এক বিরাট সমাবেশ ও মিছিল হয়। রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর সঙ্গে দেখা করে একটি ৭-দফা দাবিপত্রও তাঁরা পেশ করেন।
১৯৬৬	২৪ জানুয়ারি	: নেহরু তনয়া ইন্দিরা গান্ধীর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ।
		: খাদ্য সংকটের পাশাপাশি শুরু হল কেরোসিন সংকট। খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে শুরু হল আন্দোলন।
	১৬ ফেব্রুয়ারি	: বসিরহাটে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি।
	১৭ ফেব্রুয়ারি	: স্বরূপ নগরে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় নুরুল ইসলামের।
	মার্চ	: কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাটে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ১৭ বছরের ছাত্র আনন্দ হাইত, হরি বিশ্বাসের।
	২২ ফেব্রুয়ারি	: রাজ্যব্যাপী শহীদ দিবস পালিত হয়।
	২৫ মার্চ	: কলকাতায় রাস্তায় দেখা গেল এক প্রতিবাদী মৌন মিছিল।
	৬ এপ্রিল	: ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্মঘট পালিত হল।
১৯৬৬	ফেব্রুয়ারি	: চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে গঠিত হল বামপন্থী দলগুলির যুক্তফ্রন্ট সরকার।
		: যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর খাদ্য আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পেলেন।
		: নতুন যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৮-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। এর ১১-দফায় মেয়েদের বিশেষ সমস্যা সমাধানের কথা ছিল।
	২৫ মে	: উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়িতে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৭ জন নারী ও ২ জন শিশুসহ ১০ জন কৃষক নিহত হয়।
	২১ নভেম্বর	: বরখাস্ত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। তখন থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ছিল নির্দল প্রার্থী প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার।

	৩০ নভেম্বর	: শুরু হয় যুক্তফ্রন্টের সত্যাগ্রহ।
		: বিধানসভার অধিবেশনে স্পিকার বিনয় ব্যানার্জী নতুন মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা করেন।
১৯৬৮	২১ ফেব্রুয়ারি	: পি. ডি. এফ সরকারের পতন এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।
	৯ ফেব্রুয়ারি	: মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিরাট জনসমর্থন নিয়ে ফিরে এল যুক্তফ্রন্ট সরকার।
		: ধাপায় বেনামী জমি দখলের আন্দোলনে কৃষক মহিলাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।
		: ভূমি-সংস্কার আইন সংশোধিত হল।
		: ১৪১ বছরের পুরনো ১৫৮ ফিট উঁচু অকটারলনি মনুমেন্টের নতুন নাম হল শহীদ মিনার। অ্যানডারসন হাউস হল ভবানী ভবন।
		: মোরারজি দেশাইকে সরিয়ে দিয়ে অর্থ দপ্তর নিজের হাতে গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৪টি বড় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করেন।
	২২ এপ্রিল	: কলকাতা শহরে এক গোপন মিটিং-এ সি. পি. আই (এম-এল) পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	১ মে	: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অসিত সেনের সভাপতিত্বে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট) গঠিত হল।
১৯৭০	৭-৮ মার্চ	: পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন। এই সম্মেলনেই সমিতি ভেঙে গিয়ে গঠিত হল কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেত্রীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামেই থাকল।
	১৬ মার্চ	: পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর পদত্যাগ। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান।
	১৯ মার্চ	: পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।
	মে	: সি. পি. আই. (এম-এল)-এর প্রথম পার্টি কংগ্রেস (পার্টি তৈরি হবার এক বছরের মাথায়)।

১৯৭১	২৪ ফেব্রুয়ারি		বহরমপুর জেলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিমির সিংহ সহ সাতজনকে পুলিশ বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।
	৪ আগস্ট	:	মধ্যরাত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নকশাল নেতা সরোজ দত্তকে।
	৫ আগস্ট	:	ভোরে ময়দানে সরোজ দত্তকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ।
	৯ আগস্ট	:	স্বাক্ষরিত হয় বিশ বছর মেয়াদি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি।
	১২-১৩ আগস্ট	:	কাশীপুর বরানগর অঞ্চলে ভয়ঙ্কর নকশাল হত্যাকাণ্ড।
	৩ ডিসেম্বর	:	পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে।
	৩ ডিসেম্বর	:	রাষ্ট্রপতি সারাদেশে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা জারি করেন।
	৬ ডিসেম্বর	:	ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়।
		:	সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রচুর ভোটে জয়লাভ। ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে গঠিত হল নতুন মন্ত্রীসভা।
	১৬ ডিসেম্বর	:	পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জেনারেল নিয়াজী ভারতের সেনাবাহিনীর জেনারেল মানেকশার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।
	১৭ ডিসেম্বর	:	ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে ভারত এককভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলে পাক্-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।
		:	মিসার সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হল মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারগুলি। সংবাদপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ হল। মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট বেআইনী ঘোষিত হল।
		:	'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট'-এ গর্ভপাত আইনী স্বীকৃতি পায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়েদের অভিভাবকের সম্মতিতেই গর্ভপাত করা যাবে।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়া এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের স্রোত পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছিল। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭ সালে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের খানিকটা করে অংশ নিয়ে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের সূচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুরা কিছুতেই রাজী ছিল না সুদূর দণ্ডকারণ্যে পাড়ি দিতে। ভারত সরকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল, তাদের বক্তব্য ছিল—'পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের ত্রাণ শিবির আর ক্যাশ ডোলের জন্য দৈনিক একলক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ দণ্ডকারণ্যে কাজের অগ্রগতি সত্ত্বেও গড়ে প্রতি মাসে দু'হাজার পরিবারও সেখানে যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না লোকসভায় বললেন (৩ মার্চ, ১৯৬০) দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার চেয়ে বিনা পরিশ্রমে ত্রাণ শিবিরে বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থাকতে চাওয়া উদ্বাস্তুদের 'মজ্জাগত রোগ'।[১] বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা উদ্বাস্তুদের পক্ষই সমর্থন করলেন। তাঁরা বললেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের দিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, অবহেলিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আসা বাংলার উদ্বাস্তুরা। তারা কোনরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 'ক্যাম্প' এবং রাজ্যের ত্রাণ দফতর বন্ধ করার সময়সীমা বাড়াতে চাইল এবং উদ্বাস্তুদের জন্য আরও কিছু দাবি উপস্থিত করল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে প্রকারান্তরে বিরোধীদেরই সমর্থন করলেন। বললেন যে উদ্বাস্তুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোথাও পাঠানো হবে না। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সহায়তায় গঠিত উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গেই এদের পুনর্বাসন দাবি করল এবং এখানেই ২২ লক্ষ একর জমি পাওয়া সম্ভব সেকথাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানাল। ষাটের দশক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শিপ্রা সরকার বলেছেন, যে সমস্ত অঞ্চলের জমি এরা চাইল সেখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠলে তার সুদূরপ্রসারী ফল যে কি হবে, সে সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দলই চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করল না। এবং উদ্বাস্তুদেরও সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কতখানি সেটাও কেউ চিন্তা করেননি। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী বামপন্থী নেতাদের কথা দিলেন, উদ্বাস্তুদের অনিচ্ছায় কোথায় যেতে হবে না এবং সম্মিলিত বাস্তুহারা কেন্দ্রীয় পরিষদ, ইউ সি আর সি যখন বলল পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে পুনর্বাসনের জন্য ২২ লক্ষ একর জমি পাওয়া সম্ভব, তখন তিনি কেবল জমির পরিমাণ আর অর্থ সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মেছো ভেরি, বনাঞ্চল আর সুন্দরবনের জলাভূমিতে জনবসতির দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল নিয়ে কোন দল ভাবল না।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতির অভাব ছিল, কর্মক্ষমতার ততোধিক। কিন্তু এই রাজ্যের সর্বভারতীয় দলগুলি উদ্বাস্তুদের পক্ষে নতুন জায়গায় নতুন জীবন গড়ে নেওয়ার সদর্থক দিকটার কথা একেবারেই ভাবেনি। এটা কেবল ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি না হতে পারে, কিন্তু সমস্যার গভীরে যাওয়ার কোন চেষ্টাও এখানে ছিল না।"[২] মৈত্রেয়ী দেবীও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা করেছেন একইভাবে। তিনিও বলেছেন যে, তাদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে লড়াই করে

নতুন জীবন গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে না দিয়ে ভিক্ষালব্ধ অন্নে পরিশ্রমবিমুখ অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য জীবনের দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের এই মানসিকতার ফলেই পাকিস্তান থেকে চলে আসার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেদেশে নিজের জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা তারা করেনি। তারা জানত একবার যদি সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করা যায়, তাহলে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। মৈত্রেয়ী দেবী এই রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন।—"আর এদিকে ? প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল উদ্বাস্তুদের হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে আখের গোছাবার চেষ্টা করেছেন এমনকি পুনর্বাসনে বাধা দিয়েছেন। ক্রমাগত উদ্বাস্তুদের দাবী-দাওয়া নিয়ে চেঁচামেচি, সেদিকে হিন্দুদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। তারা ভেবেছেন একবার সীমান্ত পার হলেই শুভাকাঙ্ক্ষীরা সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এই মরীচিকার আহ্বান সতত সামনে থেকে তাদের নিজ বাসভূমিতে স্থিত হতে দেয় নাই। যত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটুক নিজের দেশের অবস্থার প্রতিকারের জন্য সর্বরকমে উদ্যোগী হওয়ার চেষ্টাও তাই দানা বাঁধেনি। এদেশের রাজনীতির খেলোয়াড়েরা এদের বিভ্রান্ত করেছেন কিন্তু কোনো সাহায্য করেননি।"[৩]

১৯৬০-৬১-তে দণ্ডকারণ্য সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে আরও দুটি সমস্যা, বেরুবাড়ি হস্তান্তর এবং 'অসমের বাঙালি তাড়াও' অভিযানের ফলে বাঙালিদের বিপন্নতা। ১৯৬০-র জুন মাসে আসামে শুরু হয় ভয়াবহ অসমিয়া-বাঙালি দাঙ্গা। এর আগে অসমে ইংরেজির পরিবর্তে অসমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি হয়। একদিকে সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবিকার ক্ষেত্রে বাঙালিদের আধিপত্যে অসমিয়াদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জুন মাসে দাঙ্গা শুরু হবার পর জুলাই মাস থেকে দলে দলে অসমের বাঙালিরা উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নিতে শুরু করল। ১৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনৈতিক দলগুলি 'অসমের বাঙালি তাড়াও'র প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী হরতালের ডাক দেয়।' অসমের বাঙালি তাড়াও'-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে 'অসমের সংখ্যালঘু বাঁচাও আন্দোলন।' এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন অপরাজিতা গোপ্পী। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বামদলগুলির নেতৃত্বে আরও দশজন মেয়েকে নিয়ে তিনিও যান এবং গ্রেপ্তার হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সেই প্রথম কারাবরণ।[৪] ক্রমশ অ-বাম দলগুলিও যোগ দেয় এই প্রতিবাদ আন্দোলনে এবং সরাসরি না হলেও কংগ্রেসও প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন জানায়। প্রতিবাদের সূত্রে শোনা গেল নানা রকমের দাবি—মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার পদত্যাগ, অর্থনৈতিক বয়কট, 'কাছাড়-গোয়ালপাড়া ত্রিপুরার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তি' প্রভৃতি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অসমে দাঙ্গার সমালোচনা করে বলেন, "সীমাবদ্ধ জাতিচেতনা আর সাধারণ অনগ্রসরতার ফলে অসমিয়াদের মাতৃভাষা তাদের কাছে জাতিসত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৫] তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ইংরেজিই রাজ্য ভাষা রাখার প্রস্তাব দেন, অসমিয়ার পাশাপাশি হিন্দি ভাষা আসা পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রী চালিহাও সম্ভবত এই প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু "অসম বিধানসভায় অসমিয়া সদস্যদের মনোমত আইন পাশ হল।"[৬]

জলপাইগুড়ি জেলার বেরুবাড়ি পূর্বপাকিস্তানকে দেবার জন্য পার্লামেন্টে আইন করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় ১৯৫৯-এ। শিপ্রা সরকারের কথায়, "জলপাইগুড়ি জেলায় দক্ষিণ বেরুবাড়ির (১২ নং মৌজা) এলাকা ৮.৭৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১২ হাজার। নেহরু ফিরোজ খান নুন চুক্তি অনুসারে এই এলাকা পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে আইন করতে গেলে তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হল।"[৭] কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীম কোর্টের মতামত চাইলে, সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল "বেরুবাড়ি হস্তান্তর ৩ ধারা অনুযায়ী সংবিধান বহির্ভূত (মার্চ, ১৯৬০)। তখন সংবিধানের নবম সংশোধন আইনের খসড়া প্রস্তুত হল।"[৮] পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মতামত দিলেন যে, পাকিস্তান র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ডের মানচিত্র দেখে বেরুবাড়ি চেয়েছে প্রথমে, এরপর তো তারা কোচবিহারের দেবীগঞ্জও দাবী করতে পারে। বেরুবাড়ি চুক্তি হবার আগে রাজ্য সরকারেরও মত নেওয়া হয়নি।

'২০ ডিসেম্বর বামপন্থীদের হরতালে মোটামুটি সরকারি সমর্থন ছিল।' শিপ্রা সরকার, 'অস্থিরতার দিন এল' 'সাত দশক', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৪।

অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, 'রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু তখন আপত্তি করেননি।' বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ১৯৬০-র ২০ ডিসেম্বর বামপন্থী দলগুলির ডাকে যে সাধারণ ধর্মঘট হয়, সেখানে সরকারের সমর্থন ছিল। বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হলো। শেষপর্যন্ত তিনবিঘা হস্তান্তর হলেও বেরুবাড়ি ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে।

ষাটের দশকের শুরুতেই, ১৯৬০-র ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বনারী সঙ্ঘ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব পালন করা হয়। কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় মহিলা ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির উদ্যোগে ইডেন উদ্যানে ৯-১২ এপ্রিল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা হয়। কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"পশ্চিমবাংলায় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন এবং মহিলা সমিতির উদ্যোগে কলকাতার ইডেন উদ্যানে ৯-১২ এপ্রিল এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের জন্য সীতাদেবীকে সভানেত্রী ও গীতা মুখার্জী এবং ভক্তি সেনকে সম্পাদিকা করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত, কলকাতার মেয়র বিজয় ব্যানার্জী ও সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন। উৎসব উপলক্ষে মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত, আল্পনা, সেলাই, তাৎক্ষণিক ভাষণ, ক্রীড়া প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় ও পুরস্কার বিতরণ হয়। তাছাড়া আলোচনা সভা, শিল্প-প্রদর্শনী সংগঠিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মীরা দত্তগুপ্ত সহ চারজন প্রতিনিধি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের বিশ্ব উৎসবে যোগদানের জন্য কোপেনহেগেনে যান। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২১-২৪ এপ্রিল।"[৯] পরের বছর ১৯৬১-র ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি

কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির দশম সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় দিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রকাশ্য সম্মেলনে সভানেত্রী হন মৈত্রেয়ী দেবী। এই সম্মেলনে মেয়েদের শিক্ষা ও জীবিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়। স্থির হয় বিধানসভায় বাজেট

"এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে আগামী ৮ মার্চ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের সময় মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে ৫ দফা দাবিপত্র নিয়ে মহিলাদের একটি কেন্দ্রীয় মিছিল বিধানসভা অভিমুখে যাবে। সেই দাবিগুলি হলো : (১) শিক্ষিত মেয়েদের জন্য জীবিকার ক্ষেত্র বিস্তার, (২) টেকনিকাল নার্সিং, শিক্ষিকা শিক্ষণ ও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ বিস্তার, (৩) গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর নারী সমাজের ব্যাপক অংশের চাহিদা অনুসারে কাঁচা কৃষিপণ্যকে প্রসেসিং করার ব্যাপারে মেয়ে শ্রমিক নিয়োগ করা, (৪) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্ত্রী-শিক্ষা খাতে বিশেষ ব্যয়, (৫) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক স্কুল, (৬) বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি, যেখানে আরো বেশি সংখ্যায় মহিলা কর্মী নিযুক্ত করা যায়, (৭) শহর ও গ্রামাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে কিছু কিছু কুটীরশিল্প কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্যই সংরক্ষিত রাখা।" —কনক মুখোপাধ্যায়, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃঃ ১৬৮।

অধিবেশনের সময় মহিলা ফেডারেশনের নেতৃত্বে মহিলাদের একটি মিছিল বিধানসভায় যাবে, তাদের দাবি জানাতে। তাদের বিভিন্ন দাবিগুলির মধ্যে মূলত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষিত মেয়েদের জীবিকার বা চাকরির ক্ষেত্র বিস্তারের কথা ছিল। জীবিকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে কিভাবে চাকরির সুযোগ বাড়ানো যায়, গ্রামে এবং শহরে মেয়েদের যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে মেয়েদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে শহর ও গ্রামে কুটিরশিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা। মেয়েদের জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা। এবং আরও বেশি সংখ্যক মেয়ে নার্সিং, কারিগরী-শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতির সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। কারণ এই ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবেই কাজের বাজারে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারছিল না। অন্যান্য গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে আসন্ন পৌর নির্বাচন এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনের নির্বাচনে সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি এবং রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে সমিতির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯৬২-তে ভারতের তৃতীয় সাধারণ নিবাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনেও এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকার গঠন করে। পশ্চিমবঙ্গে বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত হল সরকার। এবারে মোট ২৫২টি আসনের মধ্যে ১৫৭টি পেয়েছিল কংগ্রেস এবং ৯৫টি বামপন্থী ও নির্দল প্রার্থীরা পায়। এর কয়েক মাস পর '৬২-র ১ জুলাই বিধান রায়ের মৃত্যুতে প্রফুল্ল সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। শিপ্রা সরকারের লেখায় '৬২-র নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও মতামত লক্ষ্য করা যায়—"১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে একটি ত্রিভুজ এখানে দেখা গেল। কংগ্রেস, অবিভক্ত সি. পি. আই. এবং আরও পাঁচটি বামপন্থী দলের বামফ্রন্ট,

আলাদাভাবে পি. এস. পি., আগের দুটি নির্বাচনের থেকে এর মূল চরিত্র খুব আলাদা ছিল না। বিধানসভায় কংগ্রেস ১৯৫৭ সালের তুলনায় প্রায় সমান সংখ্যক প্রার্থী দিয়ে ১ শতাংশ ভোট ও পাঁচটি আসন বেশি পেয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টি এবারে এই রাজ্যে বিকল্প সরকার গঠনের ধ্বনি দিয়ে গতবারের চেয়ে অনেক বেশি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ৮ শতাংশ বেশি ভোট পেলেও তার আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫০ মাত্র। অন্যান্য বাম দলের ফল প্রায় আগের মত থাকল। পি. এস. পি. আগের অধিকাংশ আসন হারাল। লোকসভা নির্বাচনেও কংগ্রেসের জেতা আসন ছিল ১৯৫২ সালের সমান, সি. পি. আই.-এর ১৯৫৭ সালের চেয়ে একটি কম।"[১০] পশ্চিমবঙ্গের '৬২-র নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করে শিপ্রা সরকার জানিয়েছেন যে, সেবার কংগ্রেস ও সি. পি. আই.-এর ভোটের 'আনুপাতিক হার' বেশ পরিবর্তিত হয়েছিল। কারণ, কংগ্রেস গতবারের তুলনায় ৬টি আসন বেশি পেয়ে কলকাতায় ২৬টির মধ্যে ১৪টি আসন দখল করল। শিল্পাঞ্চলের প্রতিনিধি কমিউনিস্টরা বেশি ভোট পেল বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে। তাঁর মতে, "সমাজের দুর্বল ও ধর্মে সংখ্যালঘু শ্রেণী আর অবাঙালি ভোটদাতারা সাধারণত কংগ্রেসের পক্ষে ছিল। বামপন্থীদের দিকে ছিল উদ্বাস্তু আর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় অংশ।"[১১]

ভারত এবং চীনের পারস্পরিক মতভেদের পরিণতি স্বরূপ ১৯৬২-র ২০ অক্টোবর চীন যুদ্ধ ঘোষণা করল। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর চীনা সৈন্যদের প্রতিরোধ করার মত শক্তি ছিল না। হতে লাগল একের পর এক পরাজয়। ভারতের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় চীনই

'পশ্চিমবঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও সি. পি. আই.-এর ভোটের আনুপাতিক হারে যথেষ্ট বদল দেখা গেল। কাজেই এই ফলাফলকে রাজ্য রাজনীতিতে দুই মেরু বা শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের প্রমাণ বলা যায় কিনা সন্দেহ। কংগ্রেস কলকাতার ২৬টি আসনের মধ্যে ১৪টি পেল। গতবারের চেয়ে ৬টি বেশি। কমিউনিস্টরা এতদিন শিল্পাঞ্চলের প্রতিনিধি দল বলে পরিচিত হলেও এবারে ফল বেশি ভাল করল বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে।"

—শিপ্রা সরকার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৭।

একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল। চীন-ভারত যুদ্ধ নিয়ে নানারকম মতভেদ রয়েছে। বাম রাজনৈতিক দলগুলির একাংশের মতে ভারতই আক্রমণকারী, চীন প্রতি আক্রমণ করেছে। সমাজতান্ত্রিক চীন কখনও আক্রমণকারী হতে পারে না। আর চীন ভারত প্রশ্নে মতবিরোধ শুরু হয়ে গেল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে। তাদের মধ্যে একাংশের মত ছিল চীনই আক্রমণকারী। এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি, তবে এই যুদ্ধ ভারতের 'রাজনৈতিক আবহাওয়ায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাল। "দেশে-বিদেশে একটা মত বরাবর আছে যে, ১৯৬২ সালের যুদ্ধে চীনের আক্রমণ একরকম প্রতি আক্রমণ, কারণ ভারত সরকারের কথা ও কাজে চিনকে ক্রমাগত খোঁচা দেওয়া হচ্ছিল।

আসল প্রশ্ন এখানে রাজনীতির। ভারতের ম্যাকমোহন লাইন আর চিনের 'চিরাচরিত' সীমারেখা যথাক্রমে ব্রিটিশ ও মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার। এ ধরনের 'ঐতিহাসিক'

অধিকার প্রয়োগ করতে চিন কেন যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত ছিল, সমাজবাদের আদর্শ নিয়ে অন্তত তার ব্যাখ্যা হয় না। তাছাড়া চিনের রাষ্ট্রনীতিতে গভীরতার অভাব বোঝা যায় তার তৎপরতার ফলে নেহরু কৃষ্ণমেননের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জায়গায় উগ্র দক্ষিণপন্থার সাময়িক প্রাধান্যে।

সুতরাং কে আগে এগিয়েছিল এবং কতদূর, তার চেয়ে জরুরী সমস্যা ছিল চিনের নেতৃত্বের সঙ্কীর্ণতা আর নিজেদের এলাকা বাড়িয়ে নেওয়ার উনিশ শতকীয় ব্যবস্থা।"[১২] এই সময় স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ, পি. এস. পি. এবং কংগ্রেসের একাংশ নিয়ে গড়ে ওঠা 'লবি'র চাপে নেহরু বাধ্য হলেন প্রতিরক্ষা দপ্তর নিজের হাতে নিতে এবং বিদায় দিলেন কৃষ্ণমেননকে। নেহরুর পদত্যাগের দাবিও শোনা গেল। ভারতীয় সংবিধানের ১৫২ ধারায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ভারত রক্ষা আইন জারী হল। এবং এই আইনে শুরু হল যথেচ্ছ গ্রেপ্তার। কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ চীনের সমর্থনকারীরা দেশ-দ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার

'পার্টি ভাগ হতে যেটুকু বাকি ছিল ভারত সরকার নিজেই তা করে দিল।"

—মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, পৃঃ ২৯৭।

হল। চীনের যুদ্ধ ঘোষণায় কমিউনিস্ট পার্টির দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে বাড়তে থাকা অন্তর্বিরোধ চরমে উঠেছিল এবং পার্টি '৬৪-তে কার্যত ভাগ হবার আগেই বিভেদ নিশ্চিত করে তুলল সরকারের নির্বাচিত গ্রেপ্তার। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এতবড় সুযোগ যে বিরোধী শাসকগোষ্ঠী হাতছাড়া করবে না সে তো জানা কথাই। মনিকুন্তলা সেনের কথায়, "চীন-ভারত প্রশ্নে পার্টি তখন পরিষ্কার দু'ভাগ হয়ে গেল। কোন্ পক্ষ 'ন্যায়

"ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ সংঘর্ষের ফলে সারাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির নামে কেন্দ্রে নেহরু সরকার দেশের মধ্যে জরুরী অবস্থা জারি করে ভারতরক্ষা আইন চালু করে ব্যাপক ধরপাকড়, দমনপীড়ন শুরু করে দিল। কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ সমাজতান্ত্রিক চীনকে আক্রমণকারী বলে চীন বিরোধিতায় নামেননি ... পার্টির সেই সব সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ সহ সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকশত ... নেতা ও কর্মীকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচার বন্দী করে রাখা হলো। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের অনেক মহিলা নেত্রী ও কর্মীরাও ছিলেন।"

—কনক মুখোপাধ্যায়, নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা, পৃঃ ১৭০।

যুদ্ধ' করছে আর কোন্ পক্ষ অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত তার বিচার করতে আমরা নিজেরাই ঘায়েল হলাম।"[১৩] মণিকুন্তলা এবং তাঁর স্বামী জলি কল গ্রেপ্তার হবার অপেক্ষাতেই ছিলেন কিন্তু পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার না করে, বাড়ি তল্লাশি করেই ফিরে যায় সে রাতে। মণিকুন্তলা বুঝতে পারলেন যে, আর তিনি পার্টিতে থাকতে পারবেন না, তাঁকে সরে যেতে হবে। তাঁর স্বামীর নামে মিথ্যে অভিযোগ প্রচার করা হল যে তিনিই পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিয়েছেন অন্যান্য পার্টি সদস্যদের।

চীন-ভারত যুদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির যে দ্বিধাবিভক্তি নিশ্চিত করে দিয়েছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তা সম্পূর্ণ হল ১৯৬৪-তে। কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

অতি বামপন্থীরা কিছুদিন পর তাঁদের নামের সঙ্গে মার্কসবাদী শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "৩১ অক্টোবর ১৯৬৪ কলকাতায় ভারতের

শিপ্রা সরকারের কথায়," নিবর্তনমূলক আটক আইনে সি. পি. আই.-এর প্রতিবাদী গোষ্ঠীর কয়েকশত নেতা ও কর্মী কিছু সময় জেলে ছিলেন। তিন চারটি রাজ্যে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে তাঁদেরই প্রাধান্য। মুক্তি পেয়ে তাঁরা সমান্তরাল ও আধা গোপনভাবে দ্বিতীয় পার্টির কাজ শুরু করলেন। এরপরে তথাকথিত 'ডাঙ্গে চিঠি'র প্রসঙ্গ তুলে ৩২ জন সদস্য জাতীয় পরিষদের সভা ত্যাগ করলেন (এপ্রিল ১৯৬৪)। অন্যপক্ষে খুব নমনীয় ব্যবহার তখন করা হয়নি। কিন্তু ততদিনে ফেরার পথ আর ছিল না। জুলাই মাসে অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালিতে প্রধানত সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে এই 'বাম' কমিউনিস্টদের একটি প্রতিনিধি সম্মেলনের পরে ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে সপ্তম কংগ্রেসে আলাদা হল দুই পার্টি—সি. পি. আই. এবং সি. পি. আই.। নতুন দলটি কিছু পরে নামের শেষে বন্ধনীতে 'মার্কসবাদী' লিখতে শুরু করে।"

শিপ্রা সরকার—পূর্বোক্ত।

কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস শুরু হয়। পার্টি কংগ্রেসের শেষে ৭ নভেম্বর ময়দানে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশে নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই সপ্তম কংগ্রেসে পার্টির নতুন কর্মসূচী (বা পর্টি প্রোগ্রাম) গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা পৃথক হয়ে যান। তাঁরাও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামই রেখে দেন। তাই সপ্তম কংগ্রেসের পর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নাম গ্রহণ করে।"[১৪]

মণিকুন্তলা বুঝতে পারলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির কোন অংশের সঙ্গে তিনি থাকতে পারবেন না, তাঁকে সরে যেতে হবে। কাউকেই তো তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ বলে ভাবতে পারেননি। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে এসেছেন, তাদের কোন এক পক্ষের সঙ্গে থাকবেন এবং অন্যপক্ষকে শত্রু বলে মনে করবেন, এটা তিনি ভাবতে পারেননি। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে কমিউনিস্ট পার্টির ভাগ হয়ে

কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার অবস্থার ছবি পাই অমলেন্দু সেনগুপ্তের 'জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর'-এ —"হারিয়ে গেল অনেক মুখ। পার্টি ভাগের ধাক্কায় বেশ কিছু কমরেড সাময়িকভাবে বসে পড়লেন। আবার ফিরে এসেছেন অনেকে কিন্তু সবাই নন। যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁরাও তেমন স্বস্তি পাননি। কারণ চারদিকে থৈ থৈ করছে নতুন মুখ। দুটো পার্টিরই খোল নলচে যেন বদলে গেছে। চল্লিশের দশকে বা পঞ্চাশের দশকের ধ্যানধারণার মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা কমরেডরা এই বদলে যাওয়া পরিবেশে বেশ কিছুটা অপ্রতিভ এবং অবান্তর।"

—অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর, পৃঃ ৪৬।

যাওয়া, পুরনো সদস্যদের কাছে ছিল অত্যন্ত বড় আঘাত। তাঁদের অনেকেই এই বিভেদ মেনে নিতে পারেননি। সরে গেছেন পার্টি থেকে। অনেকে সাময়িকভাবে সরে গেলেও পরে আবার ফিরে এসেছেন কিন্তু মণিকুন্তলা আর কোনদিন ফিরে আসেননি কমিউনিস্ট পার্টিতে। মার্কসবাদী ভাবনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বরিশালের নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন এবং দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট পার্টি এবং সাম্যবাদী ভাবধারা তাঁর জীবনের

সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই পার্টি এবং পার্টির জীবন হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষেও খুব সহজ ছিল না। সেই জন্যই মণিকুন্তলা কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিলেন দিল্লিতে এবং আর কোনদিন কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে তিনি জড়াননি। স্মৃতিকথা লেখার সময় অর্থাৎ পার্টি ভাগ হবার প্রায় বিশ বছর পর মনে হয়েছিল যে চীন-ভারত সম্পর্ক তো বদলাতে চলেছে, পার্টির দুই গোষ্ঠীও কাছাকাছি আসতে চায়। তবে কি প্রয়োজন ছিল সেই ঘটনার। শুধু তাদের মত মানুষদের জীবনগুলি আমূল বদলে দিল সেদিনের সেই ঘটনা।—'চীন ভারত কাছাকাছি আসতে চায়, ভাঙ্গা পার্টিও এখন কাছে আসার পথ খোঁজে। কেন যে মিথ্যে জল ঘোলা হলো, কেন যে আমরা সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে বসে থাকলাম—এখনও আমি তা ভেবে পাই না।"[১৫]

ভারতরক্ষা আইনে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হল, তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্ত মহিলা নেত্রীরা অনেকেই ছিলেন। মহিলা সমিতির মধ্যেও দক্ষিণপন্থী ও চীনাপন্থী কমিউনিস্টদের মতবিরোধে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ক্রমশ ভাঙার পথে এগিয়ে গেল।

চীন-ভারত যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলেও ভারতরক্ষা আইনে বন্দীরা অনেকেই মুক্তি পেলেন না। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে উঠল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বন্দীমুক্তি এবং 'জরুরী অবস্থা ও ভারত রক্ষা আইন প্রত্যাহারের' জন্য সভা, সমাবেশ ও প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজন করা হয়। রাজবন্দীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধে না দেওয়ায় ১৯৬৪-র ২২ নভেম্বর কমিউনিস্ট বন্দীরা দমদম জেলে অনশন ধর্মঘট করেন। কমিউনিস্ট নেত্রী জ্যোতি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই আন্দোলনের বিস্তৃত ছবি উঠে এসেছে—"বন্দী মুক্তির দাবিতে ২৮ নভেম্বর সর্বত্র মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক জনগণের কণ্ঠে আওয়াজ ওঠে : 'ভারতরক্ষা আইন বাতিল কর, রাজবন্দীদের মুক্ত কর'। বিভিন্ন পার্টি সংগঠনের আহ্বানে ১৯ ডিসেম্বর ১৯৬৪ কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে একটি উল্লেখযোগ্য কনভেনশন হয়। সেই কনভেনশনের অন্যতম আহ্বায়ক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির অন্যতম সম্পাদিকা জ্যোতি চক্রবর্তী।"[১৬]

কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের কালে, ১৯৬৪-র ২৭ মে জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হল। এরপর থেকে এই দশকের শেষের দিকে কমিউনিস্ট পার্টি তিন টুকরো হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসও 'আদি' এবং 'নব' এই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সে যুগটাই ছিল দল ভাঙাভাঙির। এবং স্বাধীনতার পর থেকে যে কংগ্রেস দল সংহতি ও স্থায়িত্ব-দানের দায়িত্ব পালন করে আসছে, চতুর্থ নির্বাচনের পর থেকে তার সেই ভূমিকারও বদল ঘটছে। নেহরুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতিতে পর্বান্তর ঘটল। শেষ হল স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ—চারিদিকেই যেন অস্থিরতার ঢেউ।

পশ্চিমবঙ্গে তখন প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রীত্বে খাদ্য সঙ্কট চরমে উঠল। সরকারের চূড়ান্ত প্রতিবাদ করতে লাগল বাম দলগুলি। শুরু হল খাদ্য আন্দোলন। খাদ্যের দাবিতে ১৬ আগস্ট, ১৯৬৪ কলকাতায় এক বিরাট মিছিল হয়। ২২ আগস্ট, ১৯৬৪ রামমোহন লাইব্রেরী হলে খাদ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে কলকাতার সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় ক্ষুধার্ত মানুষের একের পর এক ভুখা মিছিল প্রশাসনের কাছে প্রতিবাদ জানাতে লাগল। সাধারণ মানুষের জমে থাকা ক্ষোভ ক্রমশ ফেটে পড়ল। বাম রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষ পথে নেমে পড়ল। শিপ্রা সরকার বলেছেন,

অমলেন্দু সেনগুপ্তের লেখায়, "সাধারণ মানুষের আন্দোলনমুখী মেজাজ যে ক্রমশ চড়ার দিকে তার প্রমাণ ২৪ জুলাই গঙ্গারামপুর (পশ্চিম দিনাজপুর) বিডিও-র কাছে ছয় সহস্রাধিক নরনারীর ভুখা মিছিল।

২৯ জুলাই প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও কৃষ্ণনগরে দুই সহস্রাধিক নরনারীর বিক্ষোভ মিছিল। বৃষ্টির মধ্যেই শহর প্রদক্ষিণ করে তারা জেলা শাসকের কাছে দাবি পেশ করতে যায়। ৩১ জুলাই কাটোয়ায় এক হাজার মানুষের গণডেপুটেশন যায় এস. ডি. ও.-র কাছে। ২ আগস্ট বর্ধমানের কালনায় অনুষ্ঠিত হয় বন্দীমুক্তি ও খাদ্যের দাবিতে জনসভা ও কনভেনশন।

—অমলেন্দু সেনগুপ্ত, জোয়ার ভাটায়, ষাট-সত্তর, পৃঃ ৫৮।

"ষাটের দশকে খাদ্য আন্দোলন প্রায় বাৎসরিক অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতি বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 'সত্যাগ্রহ' রাজভবনের সামনে দেখা যেত।"[১৭] সরকারের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সমস্যার কখনই সমাধান হত না। যে বছর ফসল ভাল হত, তখনও সঙ্কট দূর হত না তার কারণ সরকারের দুর্বল খাদ্যনীতি। খাদ্য সংগ্রহ, বণ্টন এবং দর নির্দিষ্ট করাও হয়নি অনেক দিন পর্যন্ত। শিপ্রা সরকারের মতে, "কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকও ত্রুটিহীন নয়, বিশেষত যতদিন এস. কে. পাটিল মন্ত্রী

"চড়াদামের মাছের বাজারে বিশেষ কোন পরিকল্পনা বা নেতৃত্ব ছাড়াই সরাসরি ক্রেতা-প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ল উত্তরপাড়া থেকে কলকাতায় (১৯৬১)। মৎস্য সঙ্কট একেবারে কৃত্রিম, বেশি লাভের জন্য হিমঘরে মাছ রাখার ফল। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে পিকেটিং হতে একটা চুক্তি হল। ক্রেতারা সাধারণ পাড়ার লোক, যতদূর বোঝা যায় অসংগঠিত। এর পরে অবশ্য রাজ্য সরকার, বামপন্থী নেতারা এগিয়ে এলেন। পরের বছর কিন্তু একই রকম সঙ্কট সৃষ্টি হয়।"

—শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

ছিলেন। আমদানির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতায় উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হয়নি, খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ক্ষতিকর মনে করা হত এবং যথার্থ ভূমি সংস্কারও হয়নি। এই অবস্থায় খাদ্য ভাণ্ডারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, খাদ্য-অঞ্চল গঠনের নীতিতে সব রাজ্যের স্বার্থরক্ষা হল না।"[১৮] চূড়ান্ত খাদ্য সঙ্কট, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং মজুতদারের কালোবাজারী সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলল। ফলে কোন রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের তৎপরতা ছাড়াই সাধারণ মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করে। যুগটাই ছিল বিশ্বাস হারানোর। সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্তগুলি পূরণ না হওয়ায় ক্ষমতাসীন শাসক শক্তির উপর ভরসা করতে পারছিল না, আস্থা হারাচ্ছিল তারা। কোন নেতৃত্ব ছাড়াই বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠছিল বিভিন্ন প্রতিবাদ। পায়ের নীচের শক্ত মাটি হারানোর অনুভূতি ক্রমশ জেগে উঠছিল মানুষের মনে। মরিয়া হয়ে এক স্বতস্ফূর্ত প্রাণের তাগিদে তারা নেমে পড়ছিল আন্দোলনের পথে। ষাটের দশকে জীবনের সবক্ষেত্রেই তখন অনিশ্চয়তা। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই উধাও হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ—খোলা বাজারের পরিবর্তে স্থান পাচ্ছে ব্ল্যাক মার্কেটে, কালো বাজারে। চল্লিশের দশকে যে ব্ল্যাক মার্কেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সাধারণ মানুষ, তারই দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সমগ্র সমাজজীবন, হারিয়ে গেল জীবনের সুস্থ স্বাভাবিকতা— বদলে গেল মূল্যবোধও "প্রতিবাদের নতুন রূপ দেখা গেল ষাটের দশকে। কারুর প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর না করে অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনে নিজেরাই পথ খুঁজতে লাগলেন। মাছের অত্যধিক দামের প্রতিবাদে ক্রেতা প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ল ১৯৬১-তে কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে। হিমঘরে মাছ রেখে কৃত্রিম মৎস্য সঙ্কট সৃষ্টির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে সাধারণ মানুষই পিকেটিং করে। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ সচেতন করে তোলে রাজনৈতিক দলগুলিকে। রাজ্য সরকারও এগিয়ে আসেন সমস্যার সমাধানে। দু'বছর পর ১৯৬৩-তে চালের বেশি ফলন হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী 'সে বছর ধানের ফলন হয়েছে ৫৪ লক্ষ টন, অথচ চাল উধাও, দামের কালোবাজার।"[১৯] চালের দাম কমানোর জন্য রেশনে বেশি গম দেওয়া শুরু হলে চালকল মালিকরা কল বন্ধ করে দিল। প্রধান বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারল না, ফলে সাধারণ মানুষ নিজের হাতেই দায়িত্ব তুলে নিল। শিপ্রা সরকারের কথায়, "৫ অক্টোবর বেশি রাতে কাশীপুরে একদল যুবক একজন ব্যবসায়ীর চালের বস্তা পাচার আটকে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে চালের দাম পঞ্চাশ টাকা মণ হল। এবারে জনসাধারণ নিজের হাতে দায়িত্ব নিল। গ্রামাঞ্চলে চালের নৌকা আটক হতে লাগল। দমদমে ১৩ অক্টোবর একজন বিক্রেতাকে ঘেরাও করল পাড়ার ছেলেরা। তার হিসাবপত্র পরীক্ষা করে তার কিছু লাভ রেখে চালের 'ন্যায্য দর' ঠিক করল. পরদিন মাথাপিছু ৫ কিলো করে সেই দামে ২০০ মণ চাল দমদমের আটটি দোকান থেকে বিক্রি হল। শৃঙ্খলা মেনে লাইন দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে লোকে কিনল ৩৫ টাকা মণ দরে। নতুন পদ্ধতিতে আন্দোলন চলল মানিকতলা, নারকেলডাঙ্গা, শোভাবাজারে, তারপর সংক্রামিত হল মাছের বাজারে, সিমলা অঞ্চলে সন্দেশের, কৃষ্ণনগরে তেলের দোকানে।"[২০] তিনি মনে করেন, এই আন্দোলন 'জনতার শাসনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।' শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন কোন সংগঠিত নেতৃত্বের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ হয়ত কোন সার্থক পরিণতিতে পৌঁছাল না কিন্তু তাদের প্রয়াস ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করল। অ-রাজনৈতিক মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশিত হতে লাগল তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালে দেখা গেল অত্যন্ত সচেতনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচনী ফলাফলে তারা পরিবর্তন

আনতে চাইলেন। শুরু হল বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাদের ক্ষোভ, হতাশা এবং প্রতিবাদ বিপ্লব আনল ব্যালট বক্সে।

১৯৬৫-র শুরু থেকেই বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলি বন্দীমুক্তি, ভারত রক্ষা আইন প্রত্যাহার এবং খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতিও এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সমিতির নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হয়। "১৭ জুলাই ১৯৬৫, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ডাকে চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে মহিলাদের একটি বিশাল সমাবেশ হয় ও দীর্ঘ মিছিল কলকাতার রাজপথ পরিক্রমা করে। এই সভা ও শোভাযাত্রায় কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার পঁচিশটি আঞ্চলিক মহিলা সমিতি যোগদান করে। এই মিছিলের শেষে মহিলা সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ তদানীন্তন রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।"[২১] কালোবাজার, মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট কৃত্রিম অভাব মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত করে ফেলায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে গেল। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং ন্যায্য দরে সমস্ত জিনিসের দাবিতে তাঁরা ৭ দফা দাবি সম্বলিত দাবিপত্রটি পেশ করেন—"মহাশয়া, পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমাজের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির দিকে আমরা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গ্রামাঞ্চলে চালের দাম কিলো প্রতি ১.৫০। ১.৬০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। এবং সরকারি প্রতিশ্রুতি মতো মডিফায়েড রেশনিং অধিকাংশ স্থলেই চালু হয় নাই, অথবা হইলেও সরবরাহ নিতান্ত অনিয়মিত। সেই সঙ্গে তরকারী প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে। মাছ তো বাজার হইতে অদর্শন, বা অগ্নিমূল্যে চোরাপথে পাওয়া যায়। সরকারের প্রতিশ্রুত সরিষার তেল সরবরাহের এখন কোন নিশ্চয়তা নাই। গ্রামাঞ্চলে চাষের উচ্চমূল্য এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিতেছে ও অন্যান্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে।....এই পরিস্থিতিতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজের পক্ষ হইতে আপনার নিকট আবেদন করিতেছি যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কমাইবার জন্য সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি দাবি করিতেছি :

"১। গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র নিয়মিত সরবরাহ সহ মডিফায়েড রেশনিং অবিলম্বে চালু করুন।

২। কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে মেহনতী মানুষের জন্য রেশনের পরিমাণ বাড়ানো হউক এবং রেশনের দাম কমানো হউক।

৩। ডাল ও সরিষার তেল ন্যায্য দরে রেশন দোকান হইতে নিয়মিত দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

৪। তরকারির অস্বাভাবিক বাজারদর ন্যায্য মূল্যে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার হইতে সরবরাহ নিশ্চিত করা হউক।

৫। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাছের নিয়মিত ব্যবস্থা করা হউক।

৬। মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও পাইকারদের হাত হইতে বাজারকে মুক্ত করার জন্যে খাদ্যশস্য ও প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হউক।

৭। হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহ যাহাতে কোনমতে ভাঙিয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হউক এবং দুগ্ধের সরবরাহ বাড়ান হউক। সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীরা যাহাতে অগ্রাধিকার পান তাহার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

আমরা আপনার নিকট আবেদন করি যে নারী হিসাবে ও রাজ্যপাল হিসাবে আপনি আমাদের দুশ্চিন্তা বুঝুন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন।" [১৭-৭-১৯৬৫][২২]

রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে '৬০-এর দশকের মেয়েদের ছিল অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা। সমাজ জীবনের সব ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের পথটি খুঁজে নিতে চাইছিলেন। আপোষ নয়, অনুগমন নয়, যোগ্যতার দাবিতে যথার্থ স্থানটি খুঁজে নেওয়া। একের পর এক দশক জোড়া বিভিন্ন আন্দোলনে মানুষের অধিকারের দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে সমস্ত মানুষ। নারী এখানে পুরুষের সক্রিয় সহযোগী মাত্রই নয়, একক সক্রিয় প্রতিবাদীও।

খাদ্য সঙ্কট ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ১৯৬৬-র শুরু থেকেই। গ্রামাঞ্চলে এই সঙ্কট প্রায় দুর্ভিক্ষে পরিণত হল। পাশাপাশি শুরু হল কেরোসিন সঙ্কট। খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হল। বসিরহাটে স্কুলের ছাত্ররা কেরোসিনের দাবিতে মিছিল করে

কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "কয়েকদিনের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে স্বরূপনগরের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলাম, কৃষ্ণনগরের কিশোর ছাত্র আনন্দ হাইত, আলি হাফেজ, কালু মণ্ডল, হরি বিশ্বাস, অর্জুন ঘোষ, সুখেন মুখার্জী, অনিল গুপ্ত, অলোক মজুমদার, রঞ্জন দত্ত, বাবলু দাস, স্বপন চ্যাটার্জী প্রমুখ অর্দ্ধ শতাধিক ছাত্র-যুব শহীদ হলেন। তিন শতাধিক লাঠি, বন্দুক, বুলেটের আঘাতে আহত হলেন।"

—কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পৃঃ ১৭৮।

আদালতের সামনে এলে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ পুলিশ গুলি চালায়। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, শুরু হয় প্রতিবাদ। ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বরূপ নগরে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলামের, নিহত হল হাবড়ায় কালু মণ্ডল। মার্চ মাসের ৪-৫ তারিখে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রাণাঘাটে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় সতের বছরের ছাত্র আনন্দ হাইত, হরি বিশ্বাসের। এই অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রচণ্ড হয়ে উঠলে সেনাবাহিনী নামানো হয়। প্রশাসনের নিষ্ঠুর আচরণে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বসিরহাটে পুলিশের ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এবং মৃত ছাত্রদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী শহীদ দিবস পালন করা হয়। সংযুক্ত বাম দলের নেতৃত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিবসে সমস্ত জেলায় 'প্রশাসনিক দপ্তর এবং খাদ্য দপ্তর অবরোধ করা হয়, বিভিন্ন সভা-সমাবেশও হয়। ৫ মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পুলিশের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে সর্বদলীয় কনভেনশনে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই সময়ের ছবি উঠে এসেছে,—"পুলিশের গুলি চালনার বিরুদ্ধে

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ৫ মার্চ সর্বদলীয় কনভেনশন থেকে ব্যাপক আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে স্বরূপনগরের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলাম, কৃষ্ণনগরের কিশোর ছাত্র আনন্দ হাইত, আলি হাফেজ, কালু মণ্ডল, হরি বিশ্বাস, অর্জুন ঘোষ, সুখেন মুখার্জী, অনিল গুপ্ত, অলোক মজুমদার, রঞ্জন দত্ত, বাবলু দাস, স্বপন চ্যাটার্জী প্রমুখ অর্ধশতাধিক ছাত্র-যুব শহীদ হলেন। তিন শতাধিক বন্দুক বুলেটের আঘাতে আহত হলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে প্রায় ছয় হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হলেন।"[২৩]

খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। শুরু হয় ট্রাম-বাস জ্বালানো। বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদে মার্চ মাসে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অচল হয়ে গেল। মার্চের ২৫ তারিখে কলকাতার রাস্তায় দেখা গেল এক বিরাট মৌন মিছিল। সারা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সচেতন নারী-পুরুষ,

শিপ্রা সরকারের কথায়, "কলকাতায় তখন অনেকদিন পরে ট্রাম, বাস জ্বলছে, ছাত্র-পুলিশের সংঘর্ষ হচ্ছে রাজপথে। মার্চ মাসে বিরোধী পক্ষ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অচল করে দিলেন। এই সময়ে একাধিক 'বাংলা বন্ধ', অভূতপূর্ব বিশাল মৌন মিছিল দেখা যেতে লাগল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ ও খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মন্যম কলকাতা ঘুরে গেলেন। বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট রেশন ও লেভি প্রথার কিছু পরিবর্তন চাইল। রাজ্য সরকারও খাদ্যনীতি কিছুটা শিথিল করলেন। এপ্রিলের গোড়ায় অবস্থা খানিকটা স্বাভাবিক হল।"

—শিপ্রা সরকার, 'অস্থিরতার দিন এল', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৭।

কিশোর, তরুণ এই মিছিলে যোগ দিয়ে পথ হাঁটল—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, কিশোর-তরুণদের মৃত্যুর প্রতিবাদে, পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাদ্য ও আলোর দাবিতে। মৌন মিছিল দৈর্ঘ্যে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু করে দেশবন্ধু পার্ক ছাড়িয়ে গেল। এই ঐতিহাসিক মৌন মিছিল বিশালত্বে ও অভিনবত্বে নাড়া দিল সমস্ত শহরবাসিকে, নাড়া খেল প্রশাসনও। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী কলকাতায় এলেন। খাদ্য আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া কিছু কিছু বন্দী ছাড়া পেল, তুলে দেওয়া হল ১৪৪ ধারা। মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী পক্ষের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। শিপ্রা সরকার মনে করেন যে সরকার খাদ্যনীতি কিছু শিথিল করার ফলে, এপ্রিলের প্রথম দিকে অবস্থা অনেক স্বাভাবিক হয়ে যায় কিন্তু কনক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "জনগণের মূল দাবিগুলি পূরণ হলো না। রেশনে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো হলো না, বড় বড় জমির মালিকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের ব্যবস্থা হলো না, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলো না। পুলিশী অত্যাচারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থাও হলো না।"[২৪] ফলে ৬ এপ্রিল ১৯৬৬, ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী ধর্মঘট পালিত হল। বাম রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য গণসংগঠনের নেতৃত্বে আন্দোলনও চলতে থাকল।

রাজ্যব্যাপী আন্দোলন, প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ সমস্ত কিছুতেই মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রাম-শহরের নানা বয়সের মেয়েরা আন্দোলনে অংশ

নিয়েছে, আইন অমান্য করেছে, পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। সহকর্মী পুরুষের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, অত্যাচারিত হয়েছে কিন্তু থেমে থাকেনি। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ফেডারেশনের ডাকে মেয়েরা আলাদাভাবেও গড়ে তুলেছে আন্দোলন, করেছে অন্যায়ের প্রতিবাদ। খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে, বিনা বিচারে আটকে রাখা রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য এবং পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানোর প্রতিবাদে ২৮ মার্চ কলকাতার মেয়েরা এক বিরাট মিছিল করে ময়দানে যায় এবং মনুমেন্টের নীচে তাদের এক বিরাট সমাবেশ হয়। সভানেত্রী ছিলেন অনিলা দেবী। বক্তাদের মধ্যে জ্যোতি চক্রবর্তী, পঙ্কজ আচার্য, নিরুপমা চ্যাটার্জী, সুধা রায়, গীতা মুখার্জী, ইলা মিত্র প্রমুখ। সমাবেশের পর রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়—"পশ্চিমবাংলার মানুষ অনাহারে মরতে প্রস্তুত নয়। অনাহারে মরবার আগে তারা বিদ্রোহ করবেই।......কোন রাজনৈতিক দল যদি মনে করে থাকেন, দেশের নামে জনসাধারণকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে বললে তাঁরা সেই দলের জয়ধ্বনি দিয়ে স্বেচ্ছায় অনাহারকে বরণ করে নেবেন, তবে সেই দলের নেতারা স্বপ্নের দেশে বাস করছেন বলতে হবে। কারণ জনতা আজ মোহমুক্ত।"[২৫]

খাদ্য আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তারের ফলে একটি বেসরকারি তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পর এই কমিশন সরকারের খাদ্য নীতিকেই দায়ী করে। তাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা মূলত বন্টন সমস্যাভিত্তিক, এর জন্য প্রয়োজন 'জাতীয় ভিত্তিতে খাদ্যের সংগ্রহ ও বণ্টন' কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই কমিশনের বিবরণ রয়েছে—"১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি-মার্চ-এপ্রিলের খাদ্য আন্দোলনের মাত্র ৫০টি দিনের ঘটনার উপর বেসরকারি তদন্ত কমিশন ১৬৬ পৃষ্ঠার এক ঐতিহাসিক রায় দেন। এই তদন্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন আসাম ও রাজস্থান হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সরযূপ্রসাদ, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ. এন. মুল্লা ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ. সি. চ্যাটার্জী। কমিশন তাঁদের অনুসন্ধান কাজে শতাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন, আরো দুই শতাধিক ব্যক্তির বিবৃতি পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা কলকাতা, বারাসাত, আসানসোল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় কোর্ট বসিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। বিস্তারিত তদন্তের পর কমিশন রায় দিয়েছেন যে সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের জন্য রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতিই দায়ী। জাতীয় ভিত্তিতে খাদ্যের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থার দরকার। পশ্চিমবাংলার খাদ্য সমস্যা মূলত বণ্টন সমস্যা। চোরাকারবারীদের হাতে খাদ্য মজুত থাকার জন্যই প্রধানত খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়।"[২৬]

পঞ্চাশের দশক থেকেই শুরু হয়েছিল ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন। জাতির সঙ্কটের মুহূর্তে, সমস্তরকম সমস্যা ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল সমাজের অগ্রণী অংশ, ছাত্রসমাজ। ১৯৬৬-তে খাদ্য ও কেরোসিনের সঙ্কটকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পুলিশের দমনের প্রচেষ্টা, ছাত্র মিছিলে গুলি ছোঁড়ার ফলে বেশ কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যুতে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। শিপ্রা সরকার ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন, "......চারু মজুমদার প্রমুখের বিপ্লব তত্ত্বের প্রভাবে 'মিলিট্যান্ট' সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়ে সচেতনভাবেই ছাত্র আন্দোলন একদিকে

পরিচালনার চেষ্টা করেছিল।'[২৭] জয়া মিত্রও বলেছেন যে, '৬৭-তে থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে তার পরিচয় হয় কল্যাণ সুব্রত রায়ের সঙ্গে। এবং তার সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা জয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি তখনও সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা বলছে না। তাঁর নিজের কথায়, "সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলাম এইজন্য তিনি খুব ভাল করে তখন সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা বলেছিলেন তখনও কিন্তু সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা সেইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি বলছেন না।"[২৮] শিপ্রা সরকারের মনে হয়েছে '৬৬-র আন্দোলন যেন একটু অন্য 'অদ্ভুত চেহারা' নিয়েছিল, যাকে প্রচলিত ধারায় ছাত্র আন্দোলন বা গণআন্দোলনের সঙ্গে মেলানো যায় না বা বলা যায় এই আন্দোলনের প্রবণতাই ছিল প্রচলিত ধারার বাইরে অন্য এক প্রচেষ্টায়। বিশেষ করে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, কাঁচরাপাড়া, চাকদা প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক বিভিন্ন সংস্থা। নষ্ট করা হচ্ছিল রাষ্ট্র সম্পত্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেললাইন উঠিয়ে দেওয়া হল, ডাক-তার টেলিফোন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। পুরভবন, আবগারি-অফিস, ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেওয়া হল প্রয়োজনীয় সরকারি নথিপত্র। শিপ্রা সরকার বলেছেন, "সুতরাং প্রশ্ন থেকে যায়, তখনকার খাদ্যনীতি যাদের স্বার্থহানি করেছিল সেইসব সামাজিক গোষ্ঠীর কিছু ভূমিকা কি ছিল আন্দোলনে?" নদীয়া জেলার সি. পি. এম. জেলা কমিটি, আন্দোলনের এই ধারার সমালোচনা করেছিল। তাদের মতে, 'এই আন্দোলন শুধু স্বতঃস্ফূর্ত অসংগঠিত নয়, অংশগ্রহণকারীরা ছিল মূলত রেলে চাউলের চোরাকারবারীরা।'[২৯] এবং কলকাতার 'সি. পি. আই.' প্রভাবিত ছাত্রদের একাংশের হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমালোচনা করেছিল তারা।

১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারিতে হল চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনী ফলাফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের একাধিপত্য আর থাকল না। পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। সেই সমস্ত রাজ্যগুলিতে গঠিত হল 'কংগ্রেসের বিকল্প কোয়ালিশন সরকার'। এবং অনেক ক্ষেত্রেই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কোন মধ্যপন্থী দলের সঙ্গে মিলেই বামপন্থী দলগুলি সরকার গঠন করল। পশ্চিমবঙ্গে দলগত বিরোধে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়া বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেস বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে মিলে '৬৭-তে গঠন করল যুক্তফ্রন্ট সরকার। শিপ্রা সরকার মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে, "খাদ্য সঙ্কট, ১৯৬৬ সালের তীব্র বেকার ও উদ্বাস্তু সমস্যার আর সাধারণভাবে সমাজীবনে অস্থিরতার সঙ্গে কংগ্রেসে ভাঙন নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করেছিল।"[৩০] এই নির্বাচনে তিনজন মহিলা নেত্রী নির্বাচিত হলেন। সি. পি. আই. (এম)-এর নন্দরানী ডাল, গীতা মুখার্জী এবং সি. পি. আই.-এর ইলা মিত্র। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। সমস্যা জর্জরিত বর্তমান জীবনে প্রশাসনিক শক্তির উপর তারা আস্থা হারাচ্ছিল। নতুন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় এনে তারা দেখতে চাইছিল, যে তাদের ক্ষমতা কতখানি। তারা সত্যিই মানুষের আশা পূরণ করতে পারে কিনা। তাই কংগ্রেসের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকেই তারা ক্ষমতায় বসাল।

বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রীসভা। যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৮ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ শুরু করে দিল। অজয় মুখার্জীর বাংলা কংগ্রেস গড়ে ওঠার সময় থেকেই জনস্বার্থে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বামপন্থীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে রাজি ছিল। প্রথম দিকে তাই কোন সমস্যা তৈরি হয়নি। যদিও তখন কমিউনিস্ট পার্টির দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। তবে '৬৭-র নির্বাচনী ফলাফল এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার মূলত গঠন করেছিল, গঠন করতে বাধ্য করেছিল সাধারণ মানুষ। প্রফুল্ল সেনের সরকারের ভ্রান্ত খাদ্যনীতি, রাজ্য জুড়ে অরাজকতা ও পুলিশী তাণ্ডবে বিরক্ত-ক্ষুব্ধ মানুষ নতুন কিছু চেয়েছিল। তারা বাধ্য করেছিল অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে কংগ্রেসের একটি 'বিকল্প' সরকার গড়তে. '৬৭-র নির্বাচনী ফলাফলের কারণ এবং জনগণের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ শিপ্রা সরকার বলেছেন, "১৯৬৭ সালে প্রধানত দুই কমিউনিস্ট পার্টির তিক্ত সম্পর্ক ও সি. পি. আই. (এম)-এর অনমনীয় মনোভাবের জন্য লড়াই হয় প্রধানত বাংলা কংগ্রেস, সি. পি. আই.-এর প্রগতিবাদী সংযুক্ত বামফ্রন্ট আর সি. পি. আই. (এম)-এর নেতৃত্বে সংযুক্ত বামফ্রন্টের মধ্যে। ভোটদাতারা এই ভেদাভেদ উপেক্ষা করে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিয়ে দুটি ফ্রন্টকে একত্রে সরকার গঠন করতে একরকম বাধ্য করল। এমন সচেতনভাবে ভোট দেওয়া সচরাচর চোখে পড়ে না। অপেক্ষাকৃত সহজে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার রাজ্যে ক্ষমতা নিল।"[৩১]

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসার পর খাদ্য আন্দোলনের বন্দীরা মুক্তি পেল এবং খাদ্য আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্ত মামলা তুলে নেওয়া হল। ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন, জমিদারী প্রথা তুলে দেবার ফলে সরকারের হাতে যে তিন লক্ষ একর জমি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকার সেগুলি চিরস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষকদের মধ্যে ভাগ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৯৬৭-৬৮-র মধ্যেই। জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ আইন করে বন্ধ করা হবে। খাদ্য নীতিতে দুর্নীতি দূর করার জন্য সরকার খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে। ১৮ দফা কর্মসূচীতে প্রথমেই ধান চালের ব্যবসা অধিগ্রহণের কথা ছিল। এছাড়া এই ১৮ দফা কার্যসূচীতে উদ্বাস্তু কলোনী বৈধ করা এবং সাধারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার যথাসম্ভব সমাধানের প্রতিশ্রুতিও তারা দিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় থেকেই অভূতপূর্ব জনসমর্থন লাভ করেছিল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কার্যভার গ্রহণের প্রথম দিনে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড় দেখে স্টেটস্ম্যান পত্রিকা লিখেছিল, "কুড়ি বছর আগের স্বাধীনতা দিবসের কথা মনে করিয়ে দেয় রাইটার্স বিল্ডিং -এর বাইরে জনতার অভিনন্দন।"[৩২] কনক মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের শাখা এবং অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতিগুলির পক্ষ থেকে পঞ্চাশজন মহিলার একটি প্রতিনিধি দল নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে তাঁদের সমর্থন ও অভিনন্দন জানিয়ে আসেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ফেডারেশনের সভানেত্রী অরুণা মুন্সী, শান্তা দেব, সুধা রায়, সুরুচি সেনগুপ্ত, ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার, প্রণতি দে, জ্যোতি চক্রবর্তী প্রমুখ।"[৩৩] মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে লিখিত অভিনন্দন বাণীতে

তাঁরা জানান, নতুন মন্ত্রীসভার কাছে মেয়েদের প্রত্যাশা এই যে, যুক্তফ্রন্টের সময়ে বাস্তবিকই মেয়েদের উপর সমস্ত অন্যায়-অবিচার দূর হয়ে সমাজে তারা যথাযোগ্য সম্মানের জায়গা পাবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ১৮ দফা দাবির মধ্যে ১১ দফায় ছিল, 'নারী জাতির বিশেষ সমস্যাবলী সরকার কর্তৃক উপযুক্তভাবে বিবেচিত হবে।'[৩৪] মেয়েদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। নব-নির্বাচিত সরকারের মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ ভাবনা, তাঁদেরও উৎসাহিত করে—"নতুন মন্ত্রীদের সহজ আচরণে বোঝা গেল তাঁরা জনতার কাছের লোক। নিরাপত্তার ব্যবস্থা বাদ দিলে বিরাট খরচ বাঁচিয়ে চলাফেরা, ট্রাফিকের নিয়ম মেনে ছোট গাড়িতে যাতায়াত, প্রয়োজনে ট্রাম-বাস ট্যাক্সিতে চড়া, অফিসঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র খুলে ফেলা এবং প্রথমেই একটি আচরণবিধি গ্রহণ করায় এই মন্ত্রীসভার নতুনত্ব বোঝা গেল। বাগমারিতে শিখ সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়ে উঠলে কয়েকজন মন্ত্রী ছুটে গেলেন দাঙ্গা থামাতে।"[৩৫]

অকুণ্ঠ জনসমর্থনের পাথেয় নিয়ে যাত্রা শুরু করা যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রথম সমস্যার মুখোমুখি হল খাদ্যনীতি নির্ধারণের প্রশ্নে।—'দুর্বলতা দেখা গেল প্রথমত এই পাঁচমিশেলি মৈত্রী শিবিরের খাদ্যনীতি স্থির করার প্রশ্নে।'[৩৬] সমালোচিত হল বিরোধী কংগ্রেসের কাছে। তারা বলল যে ১০০ মণ ধান চাল নিজের হাতে রাখতে গিয়ে কর্ডন ও লেভি তুলে দিয়ে মূলত তারা বিপুল সংখ্যক জোতদারদেরই উপকার করেছে। ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ হলেও, ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া কৃষক সংগঠন ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের জমি বিতরণও বিরোধের সম্মুখীন হল। কলকারখানা ঘেরাওতে শ্রমমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জীর সমর্থনে শিল্পপতিরা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল সরকারের প্রতি। শিল্পপতিদের বিরূপতায় কেন্দ্রীয় সরকারেরও নজর পড়ল পশ্চিমবঙ্গের উপর। এরই মধ্যে সি. পি. আই. (এম)-এ অতি বাম মনস্কদের অভ্যুত্থানে কোথাও কোথাও জমি দখলে কৃষক জোতদারের সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করল। ১৯৬৭-র মে মাসের ২৫ তারিখে উত্তরবঙ্গের নকশাল বাড়িতে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ৭ জন নারী ও ২ জন শিশুসহ ১০ জন কৃষক নিহত হয়। জোতদার বুদ্ধিমান তির্কি জমির ঠিকা প্রজা বিগন কিসনকে মারধোর করলে সংঘর্ষ বাধে। নকশালবাড়ির ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়িতে মহিলা সমিতির ডাকে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ হয়। শিপ্রা সরকারের মতে, 'আলাদাভাবে দেখলে যত না বড় ঘটনা, তার চেয়ে বেশি জরুরী হয়ে উঠল সি. পি. আই. (এম)-এর সঙ্গে চরমপন্থীদের বিরোধ, নকশালবাড়িতে কয়েকজন কৃষকের গুলিতে মৃত্যুর ফল।'[৩৭]

১৯৬৭-র ২১ নভেম্বর বরখাস্ত হল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। তখন থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ছিল নির্দল প্রার্থী প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার (PDF)। কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্তি করে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন রাজ্যপাল ধরমবীর ২০ নভেম্বর ১৯৬৭ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খারিজ করে। সেই দিন রাত্রিতেই সংবিধানের ১৬৪(১) ধারা বলে বিশ্বাসঘাতক

প্রফুল্ল ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে একটি সংখ্যালঘু সরকারকে বসিয়ে দেয় এবং মাত্র তিনজন সদস্য নিয়ে তড়িঘড়ি এক মন্ত্রীমণ্ডলী তৈরি করে দেয়। এই জোটের মন্ত্রীসভাকে তারা বলে পি. ডি. এফ. (Progressive Democratic Front) মন্ত্রিসভা। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে এই জোটে সি. পি. আই., আর. এস. পি., ফরওয়ার্ড ব্লকও যোগ দেয়।"[৩৮] শিপ্রা সরকারের মতে, এটা ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রচেষ্টা। সাধারণ মানুষ এই সরকারকে মেনে নেয়নি, কেননা 'বামফ্রন্টের সমর্থন তখনও অনেক বেশি।' যুক্তফ্রন্টও প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। ২২ এবং ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম

কনক মুখোপাধ্যায়ের লেখায় পাই একই ছবি "—'৩০ নভেম্বর শুরু হয় সর্বাত্মক আইন অমান্যের অভিযান। ছাত্ররা দলে দলে আইন অমান্য অভিযানে যোগ দেয়। মহিলারাও দলে দলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পুলিশের লাঠি, গুলি, ঘোড়সওয়ারদের আক্রমণ কিছুই তাদের দমন করতে পারে না। অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবাংলায় স্ফুলিঙ্গের মতো গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আবার ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৭ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আইন অমান্য শুরু হয়। ২৩ হাজার নরনারী কারাবরণ করেন। এদিকে ১৭ সদস্যের পি. ডি. এফ. মন্ত্রিসভা অবশেষে পি. ডি. এফ. কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়। গণ-আন্দোলনের উপর নেমে আসে নির্মম স্বৈরাচারী আক্রমণ।"

—কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১।

সমিতির আহ্বানে সাধারণ ধর্মঘট হয় এবং ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হয় যুক্তফ্রন্টের সত্যাগ্রহ, 'সর্বাত্মক আইন অমান্যের অভিযান'। এই আইন অমান্য আন্দোলনে দলে দলে ছাত্ররা যোগ দেয়। যোগ দেন মেয়েরাও। শিপ্রা সরকারের লেখায় এই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়—"প্রথম দিন থেকেই ময়দানে, রাজপথে প্রতিরোধ দেখা দিল। ছাত্র ধর্মঘট, বেআইনি মিছিল, যুক্তফ্রন্টের সত্যাগ্রহ, আর পুলিশের বেপরোয়া আক্রমণে রক্তপাত দু'মাসের উপর চলেছিল। এর মধ্যে ৩০ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হলে স্পিকার বিজয় ব্যানার্জী সেই সভা এবং নতুন মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা করে একটা সঙ্কট সৃষ্টি করলেন। এদিকে জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসও যোগ দেয় মন্ত্রিসভার, গঠিত হয় পি. ডি. এফ. কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার।"[৩৯] পি. ডি. এফ. মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ। শেষ পর্যন্ত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, পি. ডি. এফ সরকারের পতন এবং পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি।

রাষ্ট্রপতি শাসনকালে বন্দীমুক্তি আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মেয়েরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলিতে তারা বন্দী-মুক্তির দাবিতে মিটিং, মিছিল এবং সমাবেশ করে। এই সময় গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনগুলিতে মেয়েরা এসে দাঁড়াচ্ছে প্রতিবাদী শ্রমিকদের পাশে। বনানী বিশ্বাসের কথায়, "১৯৬৭-১৯৬৯ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপকতায় মহিলা সংগঠনের ভূমিকা ছিল সব চাইতে বেশি। কলে-কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের পাশে, ক্ষেত-খামারে কৃষক আন্দোলনের পাশে মহিলারা প্রতিনিয়ত ছিলেন।"[৪০] জীবন বীমা কর্পোরেশন, দুর্গাপুর স্টীল প্রভৃতি সংস্থায় কম্পিউটার বসানোর প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত হয়। মহিলা সমিতির

মেয়েরা এই সংস্থাগুলির শ্রমিক-কর্মচারী পরিবারের মেয়েদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে এক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। 'দুর্গাপুরে শ্রমিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ, শ্রমিকদের কোয়ার্টারে সি. আর. পি.'র অত্যাচার ভয়াবহ রূপ নেয় যখন মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু হয়। তার প্রতিবাদে দুর্গাপুর মহিলা সমিতি আন্দোলন করে।"[৪১] কলকাতায়

"সুলেখা, শিল্পশ্রী, বেঙ্গল ল্যাম্প, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরী, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কারখানা শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগ্রাম আন্দোলনের সঙ্গে মহিলা সমিতির কর্মীরা যোগ দেন।'"
—কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪।

কুকমি গুঁড়ো মশলার কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ১৫০ জন মহিলা কর্মীর কাজ যায়। তখন কর্মচ্যুত নারীশ্রমিকরা আন্দোলন শুরু করে। মহিলা সমিতির কর্মী মেয়েরাও যোগ দেয় তাঁদের সঙ্গে, আন্দোলন সফল হয়। শেষপর্যন্ত কারখানা খুলতে বাধ্য হয় মালিকপক্ষ, ১৫০ জন মেয়ের কর্মসংস্থান হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন ইরা শর্মা,—"চিৎপুরের কুকমীর গুঁড়ো মশলার কারখানায় ১৫০ জন মহিলা কাজ করতেন। তাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব আমরা সমিতি থেকে পালন করতাম। মালিক কারখানা বন্ধ করে দিলে কর্মীরা আন্দোলন করে তাদের কাজ ফিরে পেয়েছিল।'[৪২]

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে ধাপায় বেনামী জমি দখল করে এবং সেই জমির ফসল রক্ষা কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনে সেখানকার কৃষক মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল। জোতদার, সমাজবিরোধী, সি. আর. পি. সকলের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে। তখন ধাপা অঞ্চলে কোন মহিলা সমিতি ছিল না কিন্তু নিজেদের পরিশ্রমের ফসল রক্ষার জন্য কোন সংগঠন ছাড়াই তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছিল। পুলিশ কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছে, তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে,—থানা ঘেরাও করেছে কৃষক মেয়েরা। ধাপা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন দক্ষিণ বেলেঘাটা মহিলা সমিতির কর্মী বনানী বিশ্বাস—"১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ধাপার বেনামী জমি দখল আর দখল রেখে চাষ করার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে ধাপার কৃষক মহিলাদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। মহিলা সমিতি তখন ধাপা অঞ্চলে সংগঠিত হয়নি। ব্যাপক মহিলাদের সংগঠিত করার প্রয়োজনের তাগিদে ভৌগোলিক বা জেলার সীমা অতিক্রম করেই আমরা যুক্ত হয়েছিলাম।......জোতদারের বাহিনী, গুণ্ডা সমাজবিরোধী তাদের সাহায্যে সি. আর. পি. সবকিছুকে মোকাবিলা করেছে ধাপার কৃষক আন্দোলন। এদের মধ্যে বিরাট অংশ ছিল ধাপার মহিলারা। কৃষক-আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা, যখন-তখন কৃষক নেতাদের থানায় নিয়ে এসে আটকে রাখছে, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলারা থানা ঘেরাও করে রাখছে, সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।'[৪৩]

একবছর পর ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিরাট জনসমর্থন নিয়ে ২১৪টি আসনে জিতে আবার ফিরে এল যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭-র চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং '৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে সাধারণ মানুষের সচেতনতা,

গণতান্ত্রিক অধিকারের সঠিক প্রয়োগ প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় ১ মার্চ ১৯৬৯ আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতা কড়চা'য় উদ্ধৃত একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন শিপ্রা সরকার—

"যাদের এ ঘর ভাড়া দিলাম পাঁচ বছরের তরে
গদির লোভে তারা যদি গদা যুদ্ধ করে,
ফের তাড়িয়ে দিতে পারি দিয়ে কালির ছাপ,
জনগণের রায় মেনে আজ রাজ্য চালাও বাপ।"[৪৪]

শিপ্রা সরকার বলেছেন, "এই স্বভাব কবি যুক্তফ্রন্টের খুব বড় সমর্থক মনে হয় না, কিন্তু জনচেতনার একটা দিক ফুটেছে এই ঠাট্টার মধ্যে।"[৪৫] এখানে প্রকাশিত জনৈক পাঠকের মানসিকতা মূলত সে যুগেরই মানসিকতা। যখনই শাসক শক্তি তাদের হতাশ করেছে, তারা আন্দোলন করেছে, প্রতিবাদ করেছে, কখনও কখনও বিরোধী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া ছাড়াই নেমে পড়েছে স্বতস্ফূর্ত প্রতিরোধে। সন্ধান করেছে বিকল্প এক সরকার, যারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে, দিতে পারবে সুস্থ-স্থিতিশীল জীবনের আশ্বাস। এর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে যেতে তারা দ্বিধা করেনি। তখনকার জাতীয় রাজনীতিতে 'সংহতি ও স্থিরতার কেন্দ্রবিন্দু' কংগ্রেস সরকারকে তারা সরিয়ে দিয়েছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। সারা ষাটের দশক জুড়ে চূড়ান্ত খাদ্য-সঙ্কট, বেকারী, উদ্বাস্তু সমস্যা এবং কংগ্রেসের দলীয় বিরোধে বীতশ্রদ্ধই শুধু নয়, মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিকল্প এক শক্তিশালী সরকারের জন্য—গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। বিভিন্ন জনহিতকর কাজের মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট যখন নিজেদের শরিকি সংঘর্ষে জনসমর্থন হারানোর পথেই এগিয়ে যাচ্ছিল, ভেঙে গেল সরকার। মধ্যবর্তী নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কিন্তু আবার তাদেরই ফিরিয়ে আনল। দ্বিতীয়বার ফিরে আসার পর জনমতকে সম্মান জানিয়ে তাদের স্বার্থেই কাজ শুরু করেছিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। শিপ্রা সরকারের কথায়, "বাস্তবিক দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা দেশবাসীর জাগ্রত দৃষ্টির সামনে কাজ আরম্ভ করল। কাজ কিছু হয়নি, বলা যায় না। সরকারি ঘেরাও নীতি বাতিল করে প্রায় তিনশো শ্রম বিরোধের মীমাংসা হল। ট্রাম ভাড়া কমল, আটক আইনে বন্দীদের মুক্তি হল। ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে জমির উর্ধ্বসীমা (৭৫ বিঘা) ব্যক্তির বদলে এক-একটি পরিবারের জন্য বেঁধে দেওয়া এবং তার ভিতরে মেছোঘেরি, ফুল-ফলের বাগান, দেবোত্তর সম্পত্তির জমিও নিয়ে আসার প্রস্তাব হয়েছিল। নতুন পূর্তমন্ত্রী সুবোধ ব্যানার্জী শরৎচন্দ্রের বসতবাটি সংরক্ষণ ও অনুরূপ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময়ে ১৪১ বছরের পুরনো ১৫৮ ফিট উঁচু অক্টারলনি মনুমেন্টের নতুন নাম হল শহিদ মিনার। আর অ্যানডারসন হাউস হল ভবানী ভবন।"[৪৬]

এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও আবার শুরু হল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভিন্ন শরিক দলগুলির পারস্পরিক মতানৈক্য, অন্তর্বিরোধ। ভূমিহীন কিছু কিছু কৃষককে জমি দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু কোথাও কোথাও অতি বামমনস্ক চরমপন্থীদের নেতৃত্বে জোতদার কৃষক সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ ধারণ করল। বাড়তে লাগল, 'ফ্রন্টের ভিতরে পারস্পরিক বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা' এবং

'সবকিছুর চূড়ান্ত ফল হল কার্জন পার্কে কয়েকদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিখ্যাত অনশন সত্যাগ্রহ।'[৪৭] অবশেষে ১৯৭০, ১৬ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করলে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার অবসান হল এবং ১৯ মার্চ (১৯৭০) পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হল।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলন হল ৭-৮ মার্চ ১৯৭০। এই সম্মেলনেই সমিতি ভেঙে গিয়ে গঠিত হল, কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট নেত্রীদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামেই থাকল। কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হবার পর থেকেই অন্তর্বিরোধ শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির নেত্রীদের মধ্যেও। মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা একই সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সংগঠিতভাবে সঠিক লক্ষে এগিয়ে যাবার জন্যই পৃথক ভাবনার মানুষদের আলাদা হয়ে যেতে হল। কনক মুখোপাধ্যায় বলছেন—'অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭-৮ মার্চ সমিতির ত্রয়োদশ রাজ্য সম্মেলনের সময় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি থেকে দক্ষিণপন্থী মহিলাদের নেতৃত্বে সমিতির একাংশ পৃথকভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করলেন। সাংগঠনিকভাবেই সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। কিছুদিন পর্যন্ত উভয় সমিতিই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামে ছিল। তারপর সমিতির মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃহত্তর অংশ 'পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি' নাম গ্রহণ করল। আর দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত অপর অংশ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি নামেই থেকে গেল।'[৪৮] পারস্পরিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও '৬৯-এ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে টিটাগড়, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে আন্দোলন শুরু করেন মহিলা সমিতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য প্রচার আন্দোলন করেন তাঁরা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনেও মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান বা জীবিকার জন্যও আন্দোলন গড়ে ওঠে মহিলা সমিতির নেতৃত্বে।

জাতীয় রাজনীতিতেও এক বিরাট রদবদল হয়েছে। দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৬৬-র ২৪ জানুয়ারি 'নেহরুতনয়া' ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক অসাধারণ রেখাচিত্র পাওয়া যায় শিপ্রা সরকারের লেখায়—'নেহরুর পরে কে? এক সময়ে প্রশ্নটি খুব শোনা যেত। ২৭ মে ১৯৬৪ তারিখে জহরলালের মৃত্যু হল। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা, চিতাভস্ম ভারতের মাটিতে আর গঙ্গার স্রোতে মিলিয়ে যাবার আগেই শূন্য আসন ঘিরে দর কষাকষি শুরু হল। কংগ্রেসের নিয়ামক শক্তি তখন সিন্ডিকেট বলে পরিচিত নেতৃগোষ্ঠী। কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, সঞ্জীব রেড্ডি, এস. কে. পাটিল প্রমুখ। ১৯৬৩ সাল থেকেই কামরাজ প্ল্যানে পার্টি সংগঠন আর প্রশাসনে পদগ্রহণ একই ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ করে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী নিজেদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রেখেছিল। এখন তাদের সমর্থনে মোরারজি দেশাইকে একপাশে সরিয়ে রেখে লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং তাসখন্দে তাঁর মৃত্যুর পরে ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রী হতে পেরেছিলেন।"[৪৯] ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন ভারতের প্রথম

মহিলা প্রধান মন্ত্রী। বুদ্ধিমত্তা, দ্রুততা ও কৌশলের সঙ্গে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন, '৭৭-এর আগে আর পিছন ফিরে তাকালেন না। ষাটের দশকের মধ্যভাগ ছিল এক অস্থিরতার সময়। টালমাটাল অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা, কংগ্রেসী শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ দেশের মানুষরা খুঁজছে তখন এক বিকল্প নেতৃত্ব—কংগ্রেসে এলেন সম্পূর্ণ এক নতুন ব্যক্তিত্ব। প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং সুকৌশলী কূটনীতির প্রয়োগে [illegible] াসনব্যবস্থা চালাতে লাগলেন। ঐতিহাসিক মূল্যায়নে, 'সে সময়কার ভারত এশিয়ায় ছিল এক নতুন আশ্বাস, নতুন বিস্ময়।' কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস দলের মধ্যে ইন্দিরা তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলেন। ১৯৬৯-এ মোরারজি দেশাইকে সরিয়ে অর্থ দপ্তর নিজের হাতে নিয়ে প্রথমেই তিনি '১৪টি বড় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করলেন'। তার কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপনে ভারতবর্ষ তথা ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহানুভূতি ও সমর্থনের ফলে অবনতি ঘটে পাক-ভারত সম্পর্কে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্ডার পার হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেয়। বর্ডারের কাছাকাছি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে বাংলার মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীও তাদের নানাভাবে সাহায করে প্রশিক্ষণে। এইভাবে পাক-ভারত যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, ১৯৭১-র ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয় বিশ বছর মেয়াদি ভারত-সোভিয়েত চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরকারী তদানীন্তন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর মতে, "এ হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির চুক্তি। চুক্তির প্রধান বক্তব্য, তৃতীয় কোনও দেশ যদি ভারত আক্রমণ করে বা আক্রমণের হুমকি দেয় তা হলে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা ও শান্তির উদ্দেশ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে। সহজ কথা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।"[৫১] দেশে ক্রমশ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি গড়ে ওঠে এবং ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। রাষ্ট্রপতি সারাদেশে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা জারী করেন। সোভিয়েত এগিয়ে আসে ভারতের সাহায্যে। ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানায়। ১৬ তারিখে পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজী ভারতের সেনাবাহিনীর জেনারেল মানেকশার কাছে আত্মসমর্পণ করলে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র। পরের দিন "১৭ তারিখে সন্ধ্যায় ভারত এককভাবে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে; পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন।"[৫২] অবসান হয় চৌদ্দ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের। পরের বছর ১৯৭২-এ পর পর দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। '৭২-এর ১৭ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের সময় ২৫ বছরের জন্য ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক 'শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় এবং জুলাই মাসে (৩ জুলাই, ১৯৭২) হল বহু বিতর্কিত সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন ভুট্টো এবং ইন্দিরা গান্ধী। কূটনৈতিক এবং রাজনীতি-অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রেই সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার কারণেই মূলত এই চুক্তি। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ১৯৭১-এর নির্বাচনে ইন্দিরার নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রচুর ভোটে জয়লাভ করে, এবং গঠিত হয় ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান মন্ত্রীত্বে নতুন মন্ত্রিসভা। এর আগেই দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল কংগ্রেস

দল। ক্রমশ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হল ইন্দিরার একনায়কতন্ত্র। '৭১-এর ডিসেম্বরের ঘোষিত 'জরুরী অবস্থা' এবং 'ভারত রক্ষা আইন' বা 'মিসা'র সাহায্যে শুরু হয় প্রশাসনের যথেচ্ছ ক্ষমতার প্রয়োগ। কেড়ে নেওয়া হয় মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং সংবিধানে প্রাপ্ত মৌলিক অধিকারগুলি। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে মিটিং, মিছিল, ধর্মঘট, সমস্ত কিছুই বেআইনী ঘোষিত হয়। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে কেড়ে নেওয়া হয় মানুষের প্রতিবাদের ভাষা।

এর আগেই ষাটের দশকের অস্থিরতায় বাংলার মাটিতে গড়ে উঠেছিল এক নতুন বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী। নকশালবাড়িতে ১৯৬৭-র মে মাসে কৃষক, জোতদার এবং পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত সি. পি. আই. (এম-এল)। এই উগ্রপন্থীদের সি. পি. আই. (এম) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। জয়া মিত্রের স্মৃতিচারণে সি. পি. আই. (এম-এল) গঠনের কথা বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন কিভাবে মত ও পথ নিয়ে মতান্তরের মধ্য দিয়ে সহসা প্রকাশ্যে গড়ে উঠল নতুন পার্টি।—"১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল কলকাতা শহরে অতি সংগোপনে এক ছোট মিটিংয়ে গৃহীত হয়েছে পার্টি ঘোষণার সিদ্ধান্ত। এদিকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে তখনও রাজনৈতিক লাইন নিয়ে মতান্তর চলছে। জনগণতন্ত্র না নয়াগণতন্ত্র—এ প্রশ্নের মীমাংসা চূড়ান্ত হয়নি।

১ মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অসিত সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কানু সান্যাল ঘোষণা করলেন 'কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিজেকে ভেঙে দিয়ে' নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত। পার্টির নাম কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট)। রেডিও এই খবর প্রচার করায় এই নতুন পার্টির গঠন এক আলাদা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেল। সাধারণ মানুষের আস্থাও অনেকখানি বাড়ল।"[৫৩]

১ শিপ্রা সরকার, 'অস্থিরতার দিন এল', 'সাতদশক', 'আনন্দবাজর পত্রিকা' ২১ জুলাই, ১৯৯৩, পৃঃ ৪।
২ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
৩ মৈত্রেয়ী দেবী, 'হাসনাবাদ-বসিরহাট', 'চলার পথে', শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭০, পৃঃ ৮৫।
৪ অপরাজিতা গোপ্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৮.৪.১৯৯৮ তারিখে।
৫ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪।
৬ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
৭ পূর্বোক্ত।
৮ পূর্বোক্ত।
৯ কনক মুখোপাধ্যায়, "নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা", পৃঃ ১৬৬।
১০ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
১১ পূর্বোক্ত।
১২ পূর্বোক্ত।
১৩ মণিকুন্তলা সেন, "সেদিনের কথা", পৃঃ ২৯৭।
১৪ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।
১৫ মণিকুন্তলা সেন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০০।
১৬ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২।

১৭ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
১৮ পূর্বোক্ত।
১৯ শিপ্রা সরকার, পৃঃ ৭।
২০ পূর্বোক্ত।
২১ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।
২২ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪-৭৫।
২৩ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮।
২৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।
২৫ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২-৮৩।
২৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৩।
২৭ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।
২৮ জয়া মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৭.৯.১৯৯৮ তারিখে।
২৯ হরিনারায়ণ অধিকারী, "ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী", পৃঃ ৮২।
৩০ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।
৩১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।
৩২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।
৩৩ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৬।
৩৪ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭।
৩৫ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।
৩৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।
৩৭ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
৩৮ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০-৯১।
৩৯ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
৪০ বনানী বিশ্বাস, 'মাতৃক্রোড় থেকে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল', 'একসাথে' পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, বৈশাখ—১৪০১, পৃঃ ১৭৪।
৪১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৪।
৪২ ইরা শর্মা, 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা', 'একসাথে' পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮।
৪৩ বনানী বিশ্বাস, পূর্বোক্ত।
৪৪ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত।
৪৫ পূর্বোক্ত।
৪৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।
৪৭ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।
৪৮ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৫।
৪৯ শিপ্রা সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮।
৫০ অরবিন্দ পোদ্দার, 'ঘরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ ভিতরে', সাত দশক, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ১।
৫১ অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত।
৫২ পূর্বোক্ত।
৫৩ জয়া মিত্র, "সেই দশক", পৃঃ ১৫৩।

সত্তরের প্রতিবাদী সময়

ষাটের দশকের যুব সমাজের অস্বীকার, অস্বীকৃতির পর্ব যে ছিল সমাজের সর্বস্তরে—সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি তথা জীবন ভাবনার সর্বক্ষেত্রেই। সেই অস্বীকৃতির ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই তো তৈরি হয়েছে আগের দশকের ঋত্বিক ঘটকের, সত্যজিৎ রায়ের নতুন সিনেমা, গ্রুপ থিয়েটারের নতুন নাটকগুলি। সাহিত্যে গড়ে উঠেছে চূড়ান্ত অস্বীকৃতি, নিয়ম ভাঙার এক নতুন প্রজন্ম—'হাংরি জেনারেশন।' শুধু কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে একবার বুঝে নিতে চাইছিল নিজেকে। সময়কে চ্যালেঞ্জ করা স্পর্ধিত যুবসমাজ তাই জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই প্রশ্ন তুলছিল, ভাঙতে চাইছিল গতানুগতিকতার গড্ডালিকা প্রবাহ। সারা বিশ্ব জুড়েই চলছিল এই ভাঙাগড়া। এই ভাঙাগড়ার উথাল পাথাল প্রত্যক্ষ করছিল স্বাধীনতা পরবর্তী দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গ '৫০, '৬০-এর দশকের উত্তাল সময়ের মধ্যে দিয়ে। জীবন ক্রমশ মুখর হয়ে উঠছিল প্রতিবাদে। আশা পূরণ করতে পারছিল না কংগ্রেসী শাসন। শাসক শক্তির বিরুদ্ধে, মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচারের কারণে গড়ে উঠছিল একের পর এক আন্দোলন, বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে। তারই মধ্যে '৬৭-র নির্বাচন ভাঙন ধরালো কংগ্রেসী দুর্গে,

> *"একটা ঘটনা বেশ মনে আছে। এর আগে মিউনিসিপ্যালিটিটা ছিল কংগ্রেসের। মাঝে মাঝে আমাকে যেতে হতো বাড়ির করের ব্যাপারে আবেদন নিয়ে। যাদের কাছে আবেদন করতে হতো, তাদের কথাবার্তা পছন্দ হতো না, রাগ হতো। এরপর সি. পি. এম. মিউনিসিপ্যালিটিতে জিতল। সেবারেও কর কমানোর আবেদন নিয়ে আমাকে যেতে হলো। দেখলাম টেবিলের ওপারের লোকজন শুধু বদলে গেছে। চেনা। আর কিছু বদলায়নি। একই রকম বসার ঢঙ, কথার স্বর, বাক্যের গঠন। এতদিন বাদেও স্পষ্ট মনে আছে।*
>
> *সব মিলিয়ে যে অনুভব হয়েছিল তা হলো, কোনো কিছুই ভাঙা হলো না, যা ছিল তাই থাকল। একদল লোকের বদলে আর একদল বসল।"*
>
> *শুভেন্দু দাশগুপ্ত, নকশালবাড়ী ঃ নিজের কথা নিজেকেই বলা, সেই দশক, সম্পাদনা-পুলকেশ মণ্ডল, জয়া মিত্র, পৃঃ ১৩৫।*

গড়ে উঠল বাম শরিক দলের অ-কংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার। তখন দেখা গেল সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি সবই একটি বিশেষ চরিত্র সম্পন্ন—সে চরিত্র সংসদীয় রাজনৈতিক চরিত্র আর কোন বিশেষত্ব তার থাকে না, থাকতে পারে না। মনে পড়ে যায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লাইন, 'রাজা আসে যায়, লাল জামা গায়, নীল জামা গায়, শুধু মুখোশের রং বদলায়, দিন বদলায় না।'[১] মুখোশের এই দ্রুত পরিবর্তন মানুষের মোহ ভঙ্গ করে কিন্তু যে আগুন, যে ক্ষোভ হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তা তো নিভে যায় না, শুরু হয় প্রতিবাদ—নতুন রূপে, নতুন চেহারায়, নতুন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। দক্ষিণপন্থায় আপোষের প্রশ্নে কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) দুভাগ হয়ে গেল। অতি বাম মনস্করা নিজেদের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে লিখতে লাগল মার্কস্‌বাদী। অপরপক্ষের কাছে এরা পরিচিত হতে লাগল চীন পন্থী নামে। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী)-র মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রামের ধরন

এবং পদ্ধতিতে কৃষকের জমি দখলের লড়াইয়ের পথ নিয়ে মতপার্থক্য শুরু হয়ে গেল। সি. পি. আই. (এম) এর একাংশ সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবকেই সমর্থন করল। তাদের পার্টি যুক্তফ্রন্টে আসার পর সেই ফ্রন্টেরই পুলিশের গুলিতে কৃষক নরনারীর মৃত্যু হলে বিপ্লবী বামপন্থীরা আদর্শ ও ভাবনার সঙ্গে বাস্তবকে আর মেলাতে পারল না। নকশালবাড়ির ঘটনায় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)র ভূমিকা এদের সংশয়ে ফেলল। বিপ্লবের সমর্থনকারী যুবগোষ্ঠীর মতে নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান তেলেঙ্গানা সংগ্রামেরই পুনঃপ্রবাহ। "কিন্তু সেই সংগ্রামী কৃষক বীরদের নেতৃত্বকে সাদরে বরণ করে নেবার বদলে জোতদারের পক্ষ হয়ে কৃষক মহিলা ও শিশুদের ওপর গুলি চালাল সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা যে সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের তীরে নিহত কুখ্যাত পুলিশ অফিসার সোনামী ওয়াংদির মৃতদেহ মালা দিয়ে এলেন 'সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার'।"[২] এতদিন তাঁরা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন 'সংশোধনবাদী আপসপন্থী' বলে পুরনো কমিউনিস্ট পার্টিকে ছেড়ে আসা চীনপন্থী বামমনস্করা কিভাবে নেবেন এই সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানকে, কতটা সম্মানের স্বীকৃতি দেবেন। সাধারণ কর্মীরা কিন্তু সোৎসাহে স্বীকৃতি জানাতে রাজি ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সুবিখ্যাত নেতাদের আচরণ জানিয়ে দিল তাঁরা কি চান। জয়া মিত্রের কথায়, "এবারে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুখে যতই শ্রমিক কৃষকের ক্ষমতা দখলের কথা বলা হোক সংসদীয় পথে একবার দেশ শাসনের গদি দখল করতে পারলে যে কোন মূল্যে তা আঁকড়ে রাখাই বাংলার বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তথাকথিত নেতাদের কাছে শেষ সাফল্য। সি. পি. আই. এম-এর প্লেনাম হচ্ছিল বর্ধমানে। আমরা সেই এলাকার আশেপাশে বড় অক্ষরে পোস্টারিং করলাম—'সাতজন কৃষক মহিলাকে হত্যা করলে পুলিশ মন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, কতজন শ্রমিক-কৃষককে হত্যা করলে উপমুখ্যমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়?"[৩]

কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ কিশোর কর্মীরা মতাদর্শগত বিরোধের কারণে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে লাগল। সংসদে আসার পর পার্টির ভাবনা এবং কর্মপদ্ধতি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারল না। তাদের মনে হল নকশালবাড়ির পথই সঠিক পথ। গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছাত্রফ্রন্ট এবং সহ মতাবলম্বীরা সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। সেদিন একদিকে কংগ্রেস প্রশাসন এবং কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) একই সঙ্গে এদের বিরুদ্ধে ছিল। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার ছবি পাওয়া যায়, মায়া চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়, "ছেষট্টি সালের খাদ্য-আন্দোলনে যে গণ বিক্ষোভের সূচনা তারই পরিণতি যুক্তফ্রন্টের শাসনব্যবস্থায়। কিন্তু দলীয় মতভেদ, অন্তর্কলহ, রাজনৈতিক বিরোধিতার সঙ্গে ছিল আন্তর্জাতিক কূট পরিকল্পনা। ফলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যেতে বাধ্য হয়। তার ঠিক আগে চীন ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেছে। 'হিন্দী চীনি ভাই ভাই'-এর বদলে লাল চীনের বিভীষিকা দেখতে শুরু করেছে সারা দেশ। রাশিয়াপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজতন্ত্রবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। কংগ্রেসেও ভাগ হয়েছে। কংগ্রেসেরও বিভিন্ন নাম। তবে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই ক্রমশ শক্তি সংগ্রহ করে ক্ষমতার পীঠে এসে পৌঁছেছে। অন্য দলগুলি ক্ষীয়মান হয়ে প্রায় বিলুপ্ত। সে

সময়ে দেখা গেছে লাল পতাকা কংগ্রেস পতাকার জোড়-কলম। পতাকাবাহী সব গলাতেই মার্কস্‌বাদ লেনিনবাদ নিপাত যাক নিপাত যাক।"[৪] কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি অংশ যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবছিল জয়া মিত্রের লেখায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়া মিত্র দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠক কমিউনিস্ট পার্টির কল্যাণ রায়ের কথা বলেছেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কথাই বলতেন সে সময়ে। একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন আর. সি. সি. আই—রেভোলিউশনারি কমিউনিস্ট কোর অব ইন্ডিয়া। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে অস্ত্র সংগ্রহ করা, মজুত রাখা এবং গোপন সংগঠন চালাবার জন্য আর. সি. সি. আই-র প্রতিষ্ঠা। তরুণী জয়া মিত্রও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জয়া

"কল্যাণ রায় যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন তার নাম ছিল আর. সি. সি. আই—রেভোলিউশনারি কমিউনিস্ট কোর অব ইন্ডিয়া। এই সংগঠন অস্ত্র কেনা ও মজুত করা এবং সম্পূর্ণ গোপন সংগঠন চালাবার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচুর অর্থ সংগ্রহের কথায় বারে বারে জোর দেন।"

জয়া মিত্র, চলতে চলতে, পৃঃ ১৫০।

মিত্রের উপর দায়িত্ব ছিল আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করার। তাঁর সংগৃহীত একটি বিদেশী বন্দুক পার্ক স্ট্রীটে পোস্ট অফিস ডাকাতির সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। দু'চোখে তাদের তখন নতুন সমাজের স্বপ্ন। পুরনো ঘুনধরা সমাজটাকে খোল নলচে সমেত একেবারে বদলে দিতে হবে। আনতে হবে নতুন সমাজ, নতুন ভবিষ্যৎ। অস্থির-অশান্ত যুবসমাজকে শান্ত করতে পারল না মার্কসবাদ। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিলেন। যুবসমাজের অভ্যুত্থান, সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নেওয়া শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এসেছিল এই

তিমিরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন, "........সাতষট্টি থেকে আটষট্টি সালের সেই সময়টা ছিল প্রখর, উদ্‌বেল, বীজগর্ভ। কেবল আমাদের দেশেই নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই একটা পরিবর্তন মুহূর্ত তখন আসন্ন বলে অনেকের মনে হচ্ছে, যেন নতুন বিপ্লবোদ্যমে জেগে উঠেছে নানা দেশের যুবশক্তি একই সঙ্গে। ভিয়েতনাম মার্কিনি আক্রমণের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে আমেরিকার ছেলেমেয়েরাও, প্যারিসের ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে নেমে আসে ক্লাস ছেড়ে পথে, আর কুড়ি বছরের কংগ্রেস শাসনের পর কলকাতায় যুক্তফ্রন্টের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দেখা দিচ্ছে নকশালবাড়ির আন্দোলন। এক বছর পর ফিরে এলাম যখন কলকাতায়, সে যেন এক নতুন কলকাতা। সে কলকাতায় একদিকে ত্রাসের আবহ, অন্যদিক প্রত্যয়ের। সে কলকাতায় মতের সংঘর্ষ নীতির সংঘর্ষ চিন্তান্তর ছেড়ে পৌঁছে গেছে ব্যবহারস্তরে, সমাজবদল আসন্ন ভেবে দুরূহ কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দলে দলে তরুণ-তরুণীরা।"

শঙ্খ ঘোষ, তিমির, অধুনাজলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৯৭-মার্চ ১৯৯৭, পৃঃ ২-৩।

পরিবর্তন, নতুন উদ্যমে জেগে উঠেছিল দেশের যুবশক্তি। সেই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ—ভিয়েতনাম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিল বিশ্বের ছেলেমেয়েরা।

ষাটের দশকের কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের চেতনায় মিশে গিয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধ, তারই সঙ্গে তারা বড় হয়ে উঠেছে। জয়া মিত্র বলেছেনযে, প্রথম রাজনীতিতে যুক্ত

"আর এক ধরনের অন্য বিদ্রোহ ছিল। পরিবার-সমাজ-ব্যক্তির আন্তরসম্পর্কটাকে একবার ঝালিয়ে নিতে চাইছিল সময়। বাজার তার মূল্য সুদসহ বুঝে নিচ্ছিল ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে। পশ্চিমে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল নানাভাবে। গৃহ সুখ ও বাঁধা ভবিষ্যৎ ছেড়ে দলে দলে তরুণ-তরুণী চলে এসেছিলেন সমাজের একেবারে কিনারায়। ব্যক্তি মূলত এখানে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র বিদ্বেষী। এদেশের জীবনেও সে ছোঁয়া লেগেছে তখন। এছাড়া বামপন্থার মূলস্রোত ছিলই। প্রতিবাদ সমার্থক ছিল বামপন্থার সঙ্গে। কিন্তু ওই স্রোতের মধ্যেও প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার দ্বন্দ্ব ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এবং এই দ্বন্দ্বে সারা পৃথিবীর নতুন প্রজন্ম ফিরে তাকিয়ে ছিল পূর্ব দিগন্তে চীনের দিকেই। ভিয়েতনামের অসামান্য লড়াই প্রায় শেষ পর্যায়ে তখন। ম্যাকনামারা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে রাজ্যপালের প্রাসাদ পর্যন্ত আসতে পারেননি রাস্তা দিয়ে। এত মানুষ ছিল সেদিন পথে পথে, সারারাত ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ। জাঁ পল সার্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধতা করেছেন। মাওবাদীদের সমর্থন করছেন এবং স্বদেশের সরকারের বিরোধিতা করছেন আলজিরিয়াতে ফ্রান্সের ভূমিকার জন্য। কিছুদিন পরে ফ্রান্সের ছাত্ররা বেরিয়ে পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, ব্যারিকেড করে লড়ছেন রাষ্ট্রের সঙ্গে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, আদালত এমনকী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তখন স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে ধরে আছে। পশ্চিমবাংলায় ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন চূড়ান্ত স্তরে, আনন্দ, নুরুল পুলিশের গুলিতে মৃত। কে নতুন পদ্ধতিতে লড়াই চালাচ্ছেন বলিভিয়ার জঙ্গলে, এবং জঙ্গল ও গ্রামাঞ্চল ভিত্তি করেই লড়ছেন কাম্বোডিয়ার বিপ্লবীরা। এইসব নতুন ধরনের যুদ্ধের সংবাদ রেজি দেব্রের বই Revolution in the Revolution *তখন পাওয়া যাচ্ছে কলকাতায়।"*

মিহির চক্রবর্তী, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়,
সেই দশক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭-৮।

হবার পর যে ঘটনাটি সে সময় তাদের সকলকে ঝড়ের মত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটি ভিয়েতনামের যুদ্ধ। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিস্ফোরক অবস্থা, খাদ্য আন্দোলন, রেশনে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, যত না নাড়া দিয়েছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ অনেক বেশি নাড়া দিয়েছিল তাঁকে বা তাঁদের। "সেই বয়সে একটা emotional involvement তৈরি হয়েছিল। মনে হত ওরা যেন আমাদের আত্মীয়স্বজন। ভিয়েতনামে সৈন্যদের হাতে চূড়ান্ত নির্যাতিত মেয়েটি, যাকে বলা হত ভিয়েতনামের জোয়া, সে যেন অতি আপনজন।"[৫] এই সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী মিছিল, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, নাটক, অজেয় ভিয়েতনাম, অমর ভিয়েতনামে যুক্ত হয়ে পড়েন জয়া মিত্র ও তার বন্ধুরা। সবাই মিলে নাটক করেন। এইভাবেই আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে সচেতনতা, প্রতিবাদী চেতনা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল ষাটের দশক। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সংসদে আসা কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের আশা পূরণ করতে পারছে না, অন্যদিকে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছে তাদের। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে নিয়ম ভাঙার নতুন পথে তারা এগিয়ে গেছে দ্বিধাহীন চিত্তে।

উনসত্তর, সত্তরে শুরু হয়ে গেছে সি. পি. আই. (এম.এল)-এর অভ্যুত্থান কিন্তু এই উগ্রপন্থীরা অর্থাৎ নকশালদের কৃষি-বিপ্লব প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত হচ্ছে সি. পি. আই. (এম) নেতাদের দ্বারা। তারা কৃষকদের সচেতন করতে চাইছে, যেন তারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে না যায়। নকশালদের ভাবনা, দর্শন, স্বপ্ন নিশ্চয়ই সত্য ছিল—তাদের বিপ্লব ভাবনা, সমাজ পরিবর্তনের আকাঙক্ষা মুছে ফেলার নয়। তাদের চূড়ান্ত উগ্রপন্থা ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি বামমনস্ক রাজনীতিবিদ্‌রাও সমর্থন করেনি। কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের পথটি মেনে নিতে পারেনি। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ভাষণে একই সঙ্গে আক্রান্ত হচ্ছে কংগ্রেস এবং নকশালপন্থীরা। ১৯৬৯-র ২২ জুন গণশক্তি পত্রিকায় প্রতিবেদন—"গতকাল মধ্য কলকাতার একটি বিশাল জনসমাবেশে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন—চারদিকে ষড়যন্ত্রের হাওয়া। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস যেন-তেন প্রকারে অরাজকতা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত। আর এদেরি সহায়—বিপ্লবের নাম নিয়ে সমাজবিরোধী কাজ যারা করছে, 'সেই নকশালপন্থীরা'। আমরা চাই আমাদের যুবসমাজ সংগঠিত হোক। সর্বত্র তাঁরা গড়ে তুলুন স্বেচ্ছাবাহিনী। তাঁদের নামে চক্রান্তকারীরা শিহরিত হবে, অথচ জনগণ তাঁদের নিজস্ব শক্তি বলে মনে করবেন। তাছাড়া কংগ্রেস, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র সদস্যরা, একযোগে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে হৈ-চৈ করছে তার যথোচিত জবাব দিতে হবে।"[৬]

নকশালপন্থী আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমতায় আসার পর দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার তখন ফসল তোলায়, জমি দখলে কৃষকদের সাহায্য করছে যাতে নকশালবাড়ির ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) সহ সমস্ত বামপন্থী দল এ কাজে নেমে পড়েছে। গরীব ও ভূমিহীন কৃষককে উদ্বৃত্ত জমি দখল করার কাজে আহ্বান জানাচ্ছে তারা। এদিকে শহরের বুকে লাঠি, রামদা, বল্লম হাতে সশস্ত্র কৃষকের মিছিল এক নিত্য ঘটনা। চারু মজুমদার কৃষকদের সশস্ত্র মিছিল দেখে উচ্ছ্বসিত কিন্তু কৃষক জমায়েত তাঁদের পথ ছিল না। তাঁদের পথ ছিল গেরিলা যুদ্ধের পথ, সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। তারা জোতদারের মুণ্ডু কেটে মাটিতে গড়িয়ে দিতেন। কৃষ্ণা রায় তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন[৭], যখন কাগজে দেখলেন যে কানু সান্যাল জোতদারের কাটা মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল খেলেছে মনে হয়েছিল এটাই সঠিক পথ ; এই রাজনীতিই করতে হবে। কারণ তখন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, সংসদে আসা বামপন্থী দল প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত থাকা প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সশস্ত্র আন্দোলনের পথটিই সঠিক বলে মনে হয়েছিল। বিশেষ করে নকশাল বাড়ির ঘটনা, বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদের আচরণ তাদের ক্ষুব্ধ করে। অবশ্য জয়া মিত্র বলেছেন[৮] যে বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট কর্মী যারা বহুদিন ধরে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাদের কাছে এই আঘাত যতটা মর্মান্তিক ছিল, নতুন প্রজন্মের কাছে ততটা নয়। কারণ এদের রাজনৈতিক বোধ মূলত জন্ম নিয়ে ছিল সি. পি. আই (এম. এল) মানস পরিমণ্ডলের মধ্যেই।

খতমের রাজনীতিতে শ্রেণী শত্রু নির্বাচনে অনেক সময়ই তাদের ছোট-ছোট ইউনিটগুলির ভুল হয়ে যেত। কোথাও তারা সত্যি অত্যাচারী জমিদার বা জোতদারকে হত্যা করে গরীব কৃষকের সহানুভূতি পেত। জমিদার মহাজনের জমিজমা সংক্রান্ত ও ঋণ

সংক্রান্ত দলিলপত্র তারা নষ্ট করে ফেলত। ফলে কোথাও কোথাও জোতদার হত্যা কৃষকদের উল্লসিত করত। কৃষকদের সামনে বিপ্লবের যে কর্মসূচী রাখা হয়, তাতে

অসীম চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "২৭শে সেপ্টেম্বর সুরমহিতে বৈকুণ্ঠ ঘোষ জোতদারের বাড়ি অ্যাকশন হয়। ....বৈকুণ্ঠ ঘোষ পালায়, তার সব সম্পত্তি জনগণের মধ্যে বিলোনো হয়।"
অসীম চট্টোপাধ্যায়, সংগ্রামের বিস্তীর্ণ দিগন্ত, জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা পৃঃ ১৭৩।

অনেকগুলোর মধ্যে জোতদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তাবটি ছিল। অনেক সময়ই সামান্য উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি হলেই কৃষকরা জোতদারের বাড়িতে হামলা করে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করত। এবং এইভাবে 'এই গেরিলা ইউনিটের পিছনে দেখতে দেখতে প্রচুর ভূমিহীন কৃষকও জমায়েত হয়।' ক্রমশ দেখা গেল চারু মজুমদারের 'খতমের লাইনই প্রাধান্য পেতে শুরু করল এবং প্রকাশ্য সমাবেশ বা গণসংগঠন যেহেতু তাদের লক্ষ্য ছিল না, 'গেরিলা স্কোয়াড'ই বেশি উপযোগী হয়ে উঠল। চারু মজুমদারের 'গেরিলা অ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধটি, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭০, দেশব্রতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে চারু মজুমদার গেরিলা আক্রমণের মাধ্যমে জোতদার হত্যার উপর জোর দিয়েছেন এবং বলেছেন "কয়েকটি এরকম 'অ্যাকশন' করার পর 'বস্তুত একটা আওয়াজ উঠবে, কে শ্রেণীশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি, সে কমিউনিস্ট নামের উপযুক্তই নয়।' "[৯] এবং এর ফলেই কিন্তু সি. পি. আই. (এম এল) সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। '৭০ এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন প্রবন্ধে চারু মজুমদার বলছেন, "কমরেড, এখন আমাদের ছড়িয়ে প্রচার করে বেড়ানো কাজ নয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন, একটা নির্দিষ্ট স্কোয়াড। সেখানে সফলভাবে খতম অভিযান চালান, তারপর নিন আর একটি স্কোয়াড, আর একটি ইউনিট। এইভাবে আপনার এলাকার এক তৃতীয়াংশ এলাকা কেন্দ্রীভূত করুন। এইভাবে নিজেদের শক্তিকে সংহত করে এলাকার বাকি অংশে সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিন। এই পথই চেয়ারম্যান দেখিয়েছেন, এই পদ্ধতিই সঠিক পদ্ধতি। উদ্দেশ্যহীন রাজনৈতিক প্রচার নয়, খতম অভিযানকে সফল করার জন্য রাজনৈতিক প্রচার।"[১০] তাঁর ''৭০ এর দশককে মুক্তির দশকে পবিণত করুন' শ্লোগান উদ্বুদ্ধ করেছিল ছাত্র যুবকদের। সেই অবক্ষয়িত সময়, সমাজ জীবনের নিদারুণ সঙ্কট, অনিশ্চিৎ ভবিষ্যৎ আর সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন মেধাবী ছাত্রদের এগিয়ে নিয়েছিল বিপ্লবের পথে। তাদের অস্থিরতা, যন্ত্রণা মূলত সেই সময়েরই ক্ষতচিহ্ন। তাদের স্বপ্ন সত্য ছিল, কিন্তু পথটি সঠিক ছিল না। সমকালের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে শিপ্রা সরকার বলেছেন, "মুক্তির দশকের স্বপ্ন নিয়ে যারা ১৯৭০ সালকে অভ্যর্থনা করেছিল সেই চরমপন্থীরা তখনই তলিয়ে যাচ্ছিল ব্যক্তিহত্যা আর সন্ত্রাসের চোরাবালিতে।"[১১]

সত্তরের পশ্চিমবাংলার মুক্তিযুদ্ধ নকশালদের নেতৃত্বে ক্রমশ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে লাগল। মুক্তির দশকের ঘোষণা উদ্বুদ্ধ করেছিল কিশোর তরুণদের কিন্তু সামনে ছিল না সঠিক পথ। প্রথমেই তারা আঘাত হানল রাষ্ট্রশক্তির উপর। প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভাঙতে গিয়ে

তারা আক্রমণ করল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে। পার্টি থেকেও তাদের সেরকম নির্দেশই দেওয়া হল। দেশব্রতীতে অক্টোবর ১৯৭০-এ কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরীর দলিলের জবাবে চারু মজুমদার ছাত্র-যুব আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ছাত্র-যুবকেরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেয়ার-টেবিল ভেঙেছে বা অফিস রেকর্ড নষ্ট করেছে এবং একটি ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরির উপর হামলা করেছে। এতে তিনি খুব বিচলিত বোধ করছেন। আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশ এবং আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়। একথা ছাত্র যুবকদের না বলা একটা গুরুতর অপরাধ বলে মনে করি। কারণ এই বক্তব্য বলার ফলেই ছাত্র-যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয় এবং তবেই তারা চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার মূল কথা 'জনগণের সেবা কর'—এ বোঝার অবস্থায় আসে। সুতরাং বিপ্লব এবং মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারায় দৃঢ় বিশ্বাসী প্রত্যেকটি কর্মী এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা একটি পবিত্র দায়িত্ব বলে মনে করবে। সুতরাং এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তীব্র ঘৃণা করে যদি ছাত্ররা চেয়ার-টেবিল ভাঙে বা রেকর্ড পোড়ায়, তাদের নিরুৎসাহিত করার কোনো অধিকার কোনো বিপ্লবীরই নেই।"[১২] তবে ধ্বংসের রাজনীতিতে ক্রমশ যারা এসে জুটলেন, তারা আর যাইহোক বিপ্লবী নয়। শুরু হল স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর। জয়া মিত্র বলেছেন, "পার্টি থেকে স্কুল পোড়ানোর লাইন আসছে। মেদিনীপুর নদীয়ায় বেছে বেছে শ্রেণী শত্রু খতম হচ্ছে। উচ্চ প্রশংসিত হচ্ছে সে সব হত্যা। গ্রামে চলে যাওয়া সাথীদের কাছে আমরাও শুনছি অবিশ্বাস্য অমানুষিক নিপীড়নের বৃত্তান্ত—ভূমিহীন কিংবা প্রায় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের ওপর জমিদার-মহাজনের অত্যাচার। শহরে ১৫ আগস্টের দিনটিকে বেছে নেওয়া হলো এই স্বাধীনতা সম্পর্কে অনাস্থা ও সমস্ত ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার দিন হিসেবে। কয়েকটি স্কুলে স্কোয়াড গেল সেইসব কিশোরদের সঙ্গে নিয়ে যারা কোনদিন স্কুল বাড়িতে ঢোকবার সুযোগ পায়নি। শ্লোগান দিয়ে নামিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো তেরঙা পতাকা।"[১৩] জয়া মিত্রের উদ্ধৃতিই সাক্ষ্য দেয় শিক্ষিত, মেধাবী সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা তরুণ কিশোরদের সঙ্গে কিভাবে ব্যক্তিহত্যা ও রাষ্ট্র সম্পত্তি ধ্বংসের সূত্র ধরে অশিক্ষিত-সমাজবিরোধীরাও এসে হাজির হচ্ছে দলে। যারা কোন দিন স্কুলে যাবার সুযোগ পায়নি, জানে না স্কুল কি জিনিস, শিক্ষা কি, তারা তো ধ্বংসের পৈশাচিক উল্লাসেই ধ্বংস করবে, সন্ত্রাস চালাবে, মানুষ খুন করবে। এইভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল বিপ্লবের সত্যিকার আদর্শ। একথা রাণী দাশগুপ্তও বলেছেন তাঁর সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন যে রেললাইন অবরোধ করতে রেলওয়ে শ্রমিকের সঙ্গে এমন কাউকে পাঠানো হল, যারা জানে না শ্রমিক কত কষ্ট করে এগুলি তৈরি করে। শ্রমিক তার কষ্টে গড়া জিনিস নষ্ট না করে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবে কিন্তু সুযোগ সন্ধানী সেই রেললাইনের খানিকটা উপড়ে দিয়ে নষ্ট করল যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য। অপরাজিতা গোপ্পীও বলেছেন, কিভাবে উত্তর কলকাতায় নকশালদের সঙ্গে এসে গিয়েছিল এলাকার অসংখ্য সমাজবিরোধীরা। সি. পি. আই. (এম এল)-র প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে তারা সমস্ত অঞ্চলে চালিয়েছিল সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং তার মতে এটা সম্ভব হয়েছিল নকশাল নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবে। জয়া মিত্র বলেছেন, গেরিলা পদ্ধতিতে

তাঁরা একদিন মিছিল করেছিলেন পুরুলিয়াতে। দশ-বারো জন নিয়ে শুরু করা মিছিল একের পর সরু গলি রাস্তা পেরিয়ে ক্রমশ জনপুষ্ট সমর্থকপুষ্ট হয়ে এগোতে লাগল রেড বুক, পোস্টার

জয়া মিত্রের কথায়, "সাথিদের সকলেরই একরকম চাঞ্চল্য—শহরের সাধারণ লোক জানে না আমরা কি করি, স্পষ্ট করে কেউ জানে না আমরা কি বলতে চাই। কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হোক। 'দেশব্রতী'তে খবর আসছে নতুন কায়দায় মিছিল সংগঠিত করার। ঠিক হলো আমরাও মিছিল করব গেরিলা পদ্ধতিতে। সমস্ত দুপুর ধরে আঁকা হলো বড় বড় পোস্টার—লেনিন, মাও-সে তুংয়ের মুখ, নানান শ্লোগান। বড় লাল পতাকা। সন্ধ্যের অল্প পরে ডাক-বাংলোর মাঠ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আট-দশজনের শ্লোগানে শুরু হলো মিছিল। দ্রুত পায়ে অতিক্রম করতে লাগল একের পর এক রাস্তা, বড় রাস্তা নয়, পাড়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া ছোট ছোট রাস্তা, সরু গলি। প্রতি মোড় থেকে এসে যোগ দিচ্ছে ছেলেরা। তুলে ধরছে লাল বই, পোস্টার, পতাকা। হাতে হাতে জ্বলে উঠছে মশাল। লোকেদের অবাক চোখের সামনে বর্ষার জলধারার মতো বাড়তে বাড়তে চলল সজ্জিত মিছিল। পূর্বপরিকল্পনা মতো পথ ধরে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যখন মিছিল শেষ হচ্ছে, উল্টো দিকে বড় রাস্তার প্রান্তে দেখা গেল পুলিশ ভ্যান। জনা দুই অতি উৎসাহী কমরেড পাশে আনন্দমার্গ স্কুলের দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরেছে হাতে বাঁধা বোমা। আচমকা প্রচণ্ড আওয়াজ মিছিলেরই অনেককে হতভম্ব করে ফেলছে এটা মিছিলের কর্মসূচিতে ছিল না।"

জয়া মিত্র, চলতে চলতে, সেই দশক,
সম্পাদনা—পুলকেশ মণ্ডল, জয়া মিত্র, পৃঃ ১৫৭।

পতাকা হাতে। মশালও জ্বলে উঠতে লাগল হাতে হাতে। শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে মিছিল যখন শেষ হচ্ছে, দেখা গেল পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। হঠাতই তারা দেখলেন দু'একজন সমর্থক আনন্দ মার্গী স্কুলের দেওয়ালে হাত বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। জয়া মিত্র বলেছেন, "আচমকা প্রচণ্ড আওয়াজ মিছিলেরই অনেককে হতভম্ব করে ফেলেছে। এটা মিছিলের কর্মসূচিতে ছিল না।"[১৪] শুরু হল মনীষীদের মূর্তি ভাঙা। কোন সুস্থ চেতনাসম্পন্ন মানুষই এটা মেনে নিতে পারেননি। অপরাজিতা গোপ্পী নকশালদের মূর্তি ভাঙা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন[১৫] যে তিনি মূর্তি ভাঙার রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা যে বিখ্যাত মনীষী, জাতীয় নেতাদের মূর্তি ভেঙেছেন—এতো শিকড়কেই অস্বীকার করা। তারা বিপ্লব করেছে কিন্তু কাদের নিয়ে? Cream of the youth-র সঙ্গে তো ছিল কিছু হতাশাগ্রস্ত ছেলেমেয়ে। একদিন নকশালরা যাদের recruit করেছিল, পরে পুলিশই তাদের recruit করেছে নকশাল আন্দোলন বিনষ্ট করে দেবার জন্য। তাদের দলের মধ্যেও এ নিয়ে ছিল মতবিরোধ। কোন কোন সদস্যের মনে হচ্ছিল এটা অন্যায়, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। সুশীতল রায়চৌধুরী মূর্তি ভাঙার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে মানতে পারেননি। ফলে তাঁর সঙ্গে শুরু হয় মতবিরোধ। রমা নন্দী বলেছেন, "হুগলী জেলায় সুশীতল রায়চৌধুরী, চারু মজুমদার বিরোধ শুরু হলো। অমর নন্দী চলে যান সুশীতলদার দিকে। বিরোধ তীব্র হল।"[১৬] চারু মজুমদারও কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরীর দলিলের জবাবে বলেছেন, "মূর্তি ভাঙা সম্পর্কে তিনি গান্ধী বা কংগ্রেসী প্রধানদের মূর্তি ভাঙায় আপত্তি করছেন না। তাঁর

আপত্তি হচ্ছে যখন রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর আপত্তির কারণ হল এই যে, এই সব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা আমাদের দেশে পুরাতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আমলের বুদ্ধিজীবী। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, বাছবিচার করে মূর্তি ভাঙা হোক। স্বভাবতই বিচার্য বিষয় এই যে, এই সব বুদ্ধিজীবীরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বুদ্ধিজীবী কিনা। পরাধীন ভারতবর্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত হচ্ছে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। কমরেড পূর্ণ যাঁদের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বলেছেন তাঁরা কি কখনও ইংরেজকে তাড়ানোর কথা বলেছেন?"[১৭] সরোজ দত্ত কিন্তু মূর্তি ভাঙা সমর্থন করেছেন, তাঁর মতে বিপ্লব নিয়ম মেনে চলে না, মাপ মতো হয় না, বাড়াবাড়ির ভয় করলে বিপ্লব হয় না। তিনি যুব ছাত্রদের অভিনন্দিত করেছেন, তাদের 'বাড়াবাড়ি'র জন্যই। সরোজ দত্ত বলেছেন তারা একজনের মূর্তি ভাঙছে আর

দেশব্রতী পত্রিকায়, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সরোজ দত্ত লিখলেন,—"জনতা ভুল কাজ করে না, বিপ্লব মানেই বাড়াবাড়ি। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন বিপ্লব মানেই বাড়াবাড়ি। আমরা সংশোধনবাদীদের মতো বিপ্লবের প্রস্তুতি করছি না, আমরা বিপ্লব করছি, তাই বাড়াবাড়ির ভয় করলে আমরা বিপ্লবী থাকব না। যুব ছাত্রদের যদি অভিনন্দিত করতে হয়, তবে এই বাড়াবাড়ির জন্যই করব।..........তারা গান্ধীর মূর্তি ভাঙছে মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। কারণ চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন—না ভাঙলে গড়া হয় না।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে ব্রিটিশের জয়গান করে, 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করেনি? তাই তো আজ ছেলেরা ভাঙছে গান্ধী ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য।......তাই আজ মূর্তি ভাঙছে শুধু মূর্তি ভাঙার জন্য নয়, এ কাজ তাদের নেতিবাচক কাজ নয়। মূর্তি ভাঙছে তারা পাল্টা মূর্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদে। গান্ধী মূর্তি ভাঙছে ঝান্সীর রাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। গান্ধী ঘাট ভাঙছে তারা মঙ্গলঘাট তৈরীর জন্য।"

একজনের মূর্তি গড়ার জন্য, তাই কাজটিকে নেতিবাচক বলা যায় না। মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায় সরোজ দত্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, "যুব ছাত্ররা একসেস্ কিছু করলে উনি বলতেন এই রেভোলিউশনারি সিচুয়েশনে এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। মাঝে মাঝে এ কথাও বলতেন—যারা যুবক তারা অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক স্বচ্ছ। মূর্তিভাঙা পার্টির নির্দেশে হয়নি, হয়েছিল যুব ছাত্রদের উৎসাহে। এই নিয়ে পার্টির মধ্যে সবাই একমতও ছিলেন না। সরোজ দত্ত যুব ছাত্রদের মেনে নিয়েছিলেন। মূর্তি ভাঙার সমর্থনে খুব জোরালো লেখা বেরিয়েছিল তাঁর।"[১৮] রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহাত্মাগান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙা বা ক্ষতিগ্রস্ত করার মধ্যে ঐতিহ্য বিমুখতা, শ্রদ্ধাহীনতা বা বলা যায় প্রচলিত ধারাকে অস্বীকার করার প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। জয়া মিত্রও বলেছেন একথা যে তখনকার যুব সমাজের মনীষীদের মূর্তি ভাঙা মূলত ঐতিহ্যকে আঘাত করারই প্রচেষ্টা।[১৯] গতানুগতিকতাকে ভেঙে দেওয়া, প্রচলিত ঠুনকো, মিথ্যে মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে জীবনাচরণে যার কোন অর্থ নেই, মূল্য নেই, তাকে রূঢ় ভাবে আঘাত করা। মিথ্যের স্বর্গটাকে ভেঙে দিয়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে জীবনকে চিনে নিতে চেয়েছিলেন তারা।

কল্পনা সেনের মতে, নকশাল ছেলেমেয়েরা 'বাংলার মনীষীদের মূর্তি ভেঙে তাঁদের পুনর্মূল্যায়ন দাবী করল।'[২৮]

নকশাল আন্দোলন, বিপ্লবের স্বপ্ন, মুক্তির দশকের স্বপ্ন আকৃষ্ট করেছিল সচেতন যুব সমাজকে। দলে দলে কিশোরী তরুণী মেয়েরা যোগ দিয়েছিল এই আন্দোলনে। ছেড়ে

৫ মার্চ ১৯৭০, দেশব্রতী পত্রিকায় প্রকাশিত, 'বিপ্লবী যুব-ছাত্রদের প্রতি কয়েকটা কথা'য় চারু মজুমদার বলেছেন, "এবার ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দাও, বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়'—এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরিব কৃষক শ্রমিক জনগণকে হেয় চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সবকিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তাছাড়া, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারা জীবনের সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী। উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুব-ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাস করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন : যত বেশি পড়াশুনা করবে, তত বেশি মূর্খ হবে।—আমি সবচেয়ে খুশি হব যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাসের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়। চীনের যুব-ছাত্র সমাজও মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুরুতে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দুবছর বাদে—১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।" চারু মজুমদার, বিপ্লবী ছাত্রদের প্রতি কয়েকটি কথা, 'চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, পৃঃ (৯৮-৯৯)।

এসেছিল স্কুল-কলেজ। কিংবদন্তী নেতা চারু মজুমদারের মতে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা তখন সম্পূর্ণ মূল্যহীন। তাদের দুচোখে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন, নতুন ভবিষ্যতের ভাবনা। কৃষ্ণা রায় তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে,[২১] একসময়ে পার্টি থেকে বলা হয় যে, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে যেতে হবে। তখন তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পড়ছেন, কিন্তু পার্টির ডাকে দু'বছর সম্পূর্ণ করেও এম. এ. পরীক্ষা দেননি এবং শেষ পর্যন্ত, বর্ধমানের এক গ্রামের স্কুলে চাকরি নেন, গ্রামে গিয়ে কাজ করার জন্য। নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কল্পনা সেন বলেছেন, "ছাত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে যুবতীরা যুবকদের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করল, আলোচনা করল, বিতর্ক করল। আজকে এই সমস্ত বিষয়কে সঠিক অথবা বেঠিক যে কোনো ভাবেই মূল্যায়ন করা হোক্ না কেন সেদিনের সেই বিদ্রোহ ছিল যৌবনের উৎসব ।এরপর পার্টির নেতা চারু মজুমদার ডাক দিলেন, 'এবার স্কুল-কলেজ ছেড়ে দাও, বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।' ডাক দিলেন সর্বক্ষণের কর্মী হওয়ার জন্য। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিতে লাগলেন। সমস্ত কেরিয়ার, সমস্ত ভবিষ্যতের মুখে আক্ষরিক অর্থে লাথি মেরে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বি. এ. এম. এ., ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার সব রকম সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলার প্রতিযোগিতা চলল।"[২২] এদিকে সি. পি. আই. (এম-এল) এর নেতৃত্বে তখন গ্রামে গ্রামে জোতদার হত্যা শুরু হয়ে গেছে। শহরের শিক্ষিত মেয়েরাই শুধু নয়, আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন গ্রামের অশিক্ষিত

মেয়েরাও। পুলিশের হাতে তাড়া খেয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা ছেলেমেয়েগুলো—স্নেহের বন্ধন, নিশ্চিত আশ্রয় ও পারিবারিক নিরাপত্তাকে পেছনে ফেলে রেখে। তখন গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত দরিদ্র নারী-পুরুষ পরম স্নেহে-যত্নে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করেছে, নিজেরা অভুক্ত

"গ্রামে-গঞ্জে সাধারণ অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে পুরুষের দল সন্তানস্নেহে নিজেদের অভুক্ত রেখে তাদের খাইয়েছে, রাতের পর রাত জেগে তাদের পাহারা দিয়েছে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও স্নেহে শ্রদ্ধায় তাদের জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে।"

মায়া চট্টোপাধ্যায়, সেই দশকের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, সেই দশক— সম্পাদনা ঃ পুলকেশ মণ্ডল জয়া মিত্র, পৃঃ ৯২।

থেকে এদেরকে খাইয়েছে। পুরুলিয়ার বিড়ি শ্রমিকদের বস্তিতে আত্মগোপন করে থাকার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন জয়া মিত্র। তারা কিভাবে রক্ষা করেছিল সেকথাও জানিয়েছেন তিনি।—"পরে যখন অনেকবার পুলিশ রেইড হয়েছে বিভিন্ন বস্তিতে, দাপটের সঙ্গে পুলিশকে ধমকেছে প্রধানত মেয়েরা আর বুড়োরা। ধাক্কা দিয়ে ভাঙা দরজা দেখিয়ে গালাগাল পর্যন্ত করেছে। পুলিশ চলে যাবার পর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি হয়েছে সে সব কথা নিয়ে। 'এ বিটি উঠ উঠ, পুলিশ আল' অনেক দূর থেকে কাঁকুড়ে মাটির বুটের ক্রাঁচ, ক্রাঁচ শুনে মাধীর পাশে গোয়ালে ঘুমিয়ে থাকা কমরেডটিকে ঠেলে তুলে দেয় মাধীর বাবা। আর পনের মিনিটের মধ্যে খেতে ধান গাছের গোড়ায় শুয়ে থাকা কর্মীটি শুনতে পায় পুলিশের ভারি গলার গর্জনের বিরুদ্ধে মাধীর চিকন উঁচু গলার তর্জন, "নক্‌সালিস নখপালিস কীইযে বুলছ, আমরা কি বাবু ঘরের বটি যে ঘরে নখপালিস রইবে? কিন্তুক ঘরে যদি চোরাইমাল না পাও ভাঙা দরজাটোর দাম আমি দিয়া করাব, হুঁ।"[২৩] এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন জয়া মিত্র—"একজন দূর জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসী গ্রামে ছিলেন। ভূমিজ ও সাঁওতালদের গ্রাম। তখন বাহাত্তর সাল। ব্যাপক পুলিশী সন্ত্রাস চলছে জিপ যেতে পারে এরকম সব গ্রামে। তারই মধ্যে ভূমিজদের গরীব কৃষক খেতমজুরদের মধ্যে গোপনে তৈরি হয়েছে পার্টি কমিটি। উল্লিখিত সাথিটি ঘরের বাইরে যেতে পারেন কেবল একবার, অনেক রাতে কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রস্রাব করবার মাটির হাঁড়িটিও সেই কটি পরিবারের কেউ দিয়ে বা নিয়ে যান। কিন্তু এই গোপনীয়তা রক্ষা ছিল সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের সচেতনভাবে করা। কোনো ভয় প্রসূত নয়। বরাবাজার অঞ্চলের এইসব গ্রামে শহর থেকে আসা সাথিদের ক্ষেত্রে কঠোর গোপনীয়তা কখনও কখনও পালন করা হয়েছে কিন্তু তাতে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রচারের কাজ ব্যাহত হয়নি। কৃষক ও খেতমজুরদের পার্টি কমিটিই নিরন্তর সে কাজ চালিয়েছেন। গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া শহরের অন্তত পঁচিশ-তিরিশ জন সাথিকে সক্রিয় আশ্রয় দিয়েছেন, অন্যান্য গ্রামের নতুন যোগাযোগ দিয়েছেন।"[২৪] বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছেলেমেয়েরা, গ্রামে গিয়ে কৃষক সংগঠনের কাজে লেগেছিল, কৃষকের জমি দখলের লড়াইয়ের বাড়াবাড়িতে কোথাও কোথাও হত্যা করেছিল জমিদার জোতদারদের।

অত্যাচারী জোতদারের মাথা কেটে ফুটবল খেলেছিলেন কানু সান্যাল, পুলিশ প্রশাসনও নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর। পুলিশের চূড়ান্ত নির্মমতা কিভাবে নেমে এসেছিল এই তাজা প্রাণগুলির উপর, সে সম্পর্কে বলেছেন মায়া চট্টোপাধ্যায়—"গুলি

অসীম চ্যাটার্জী বলেছেন, "সুরমহিতে বৈকুণ্ঠ জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করে সম্পত্তি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেবার পর 'বীভৎস সন্ত্রাস নেমে আসে। কমরেডদের বাড়িঘর ভেঙে দেয়। তাদের নিয়ে আমাদের বাহিনী গড়ে উঠেছিলো। তবে সন্ত্রাস ছিলো ভয়াবহ। বোধহয় ৫ থেকে ৫০ পর্যন্ত কোনো মহিলা ছিলো না হু ওয়াজ নট রেপড।"—পূর্বোক্ত

লাঠি নয়—ইলেকট্রিক শকে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া দেহ হাসপাতালের মর্গে শুয়ে আছে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক, প্রতিবেশী-মৃত্যুপথযাত্রীর মাথার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কারুর দাঁড়াবার সাহস নেই। শোককাতর মা-বাবার মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভাগ করে নেবার সাহস পর্যন্ত কারুর নেই। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। মানবিকতার কি ভয়ানক অপমৃত্যু।"[২৫] অমিয় চট্টোপাধ্যায়কে ২৬ নভেম্বর ১৯৭১ জেলের মধ্যেই হত্যা করে পুলিশ। তাঁর স্ত্রী মীনা চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কাগজে দেখে জানতে পারেন। তিনি তখন ছিলেন ভবানীপুরের এক গোপন আস্তানায়। মৃতদেহ যখন সৎকারের জন্য নিয়ে আসা হয়, তখনও তিনি সেখানে যেতে পারেননি, প্রকাশ্যে এলেই গ্রেপ্তার করা হতো তাঁকে। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের দাদা-বৌদির হাতেই পুলিশ তার মৃতদেহ তুলে দিয়েছিল। তাঁদের কথায় "আমাদের লাশ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন শঙ্খ ঘোষ—"নকশালপন্থী উত্তেজনার সময় চলছে সেটা। যে-কোনো সময়ে যে-কোনো ঘটনা এসে আছড়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, বিভাগেও কখনো বা। সেইরকম একদিনে কলেজের গেটের কাছে লাঠি হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ছেলের দল, দক্ষিণমুখী প্রতিটি বাস থামিয়ে খুঁজছে তাদের সন্দেহভাজন এক ছেলেকে, এক সময়ে পেয়েও গেছে তাকে। পরের বাস থেকেই নামছেন দেবীবাবু। লাঠি হাতে মারমুখী ছেলের দল ঘিরে ধরেছে একলা হয়ে যাওয়া ছেলেটিকে, আর দেবীবাবু সেই জটলার মধ্যে ঢুকে পড়ে জাপটে নিচ্ছেন তাকে বুকের মধ্যে, এ-দৃশ্য চোখে পড়ল আমাদের কারো কারো। মারমুখীরা অনেকেই আর্টস কলেজের ছাত্র নয়, তাই দেবীবাবুরও আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা ভেবে সাহায্যার্থে এগোতে হলো আরো কয়েকজনকে। ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে উনি তখন বলে বলেছেন ঃ আমাকে না মেরে এর গায়ে তোমরা হাত দিতে পারবে না।'"

সেদিনকার মতো বেঁচে গিয়েছিল ছেলেটি।"—শঙ্খ ঘোষ, ছেড়ে যাবার আগে,

"এখন সব অলীক", পৃঃ ৬২।

দিয়েছিল। কেওড়াতলায় পরের দিন সামনে পিছনে পুলিশ কর্ডন করে লাশ আনা হয়।......প্রচুর আঘাত। চেনাই যাচ্ছিল না। একটা কান ছিল না, মুখ দিয়ে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঠোঁট দুটো কাটা, সারা গালে চেন দিয়ে মারার দাগ, হাতের আঙুলগুলো সব থেঁতলে গিয়েছিল। বীভৎস। চেয়ে থাকা যায় না।"[২৬]

আত্মগোপন করে, জীবন বিপন্ন করে যারা বিপ্লবের পথে এগিয়ে গিয়েছিল, তাদের উপর পুলিশী নির্যাতনের নির্মম ছবি উঠে এসেছে বিভিন্ন মেয়েদের স্মৃতিচারণে। ১৯৭১-র ১৪ আগস্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় কাশীপুর বরানগরের কথা। কাশীপুর এবং বরানগর থানা এলাকায় কিছু অঞ্চলে খুন, জখম ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটলে সেখানে সেনাবাহিনী নামানো হয়। দশ ঘণ্টা কার্ফু জারি করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশের কথা অনুযায়ী খুন হয়েছে ষোলজন এবং পরে হাসপাতালে আরও একজন মারা যায়, কিন্তু স্থানীয় মানুষের থেকে জানা যায়, খুন হয়েছে কম করেও ৪০-৪৫ জন। বহু রাস্তা রক্তে মাখামাখি হয়েছিল, মুখে আলকাতরা মাখানো মৃতদেহও পড়ে থাকতে দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায়। ঠেলা এবং রিক্সা করেও নাকি মৃতদেহ অন্য জায়গায় ফেলে দিয়ে আসা হয়েছে বলে তারা জানায়। কালান্তর পত্রিকায়, ১৪.৮.৭১-এ মায়া ভট্টাচার্যের লেখা প্রতিবেদনে ১২ ও ১৩ আগস্ট বরানগরে নকশাল হত্যার ভয়ঙ্কর ছবি উঠে এসেছে।—"........১২ আগস্ট '৭১। নর্থ সুবার্বান হাসপাতালে নাইট ডিউটিতে কম্পাউণ্ডার পাঁচু দত্ত করছিলেন ইমার্জেন্সি ডিউটি। তিনি গিয়েছিলেন বাথরুমে। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কেউ তার দুটি পা জড়িয়ে ধরায় ভয় পেয়ে তিনি চিৎকার করে উঠতেই, শোনা গেল কাতর কান্না—'আমাকে বাঁচান, ওরা আমাকে দেখলে মেরে ফেলবে। আমি কিছু করিনি।' দেশলাই জ্বেলে তিনি দেখেন একটি তেরো-চোদ্দো বছরের বাচ্চা ছেলে। বিব্রত পাঁচুবাবু জানতে চান ; ব্যাপারটা কী? ছেলেটি জানায় হাসপাতালেই কংগ্রেসী গুণ্ডা পঞ্চম তার বাহিনী নিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খুন করবে বলে। ও নাকি নকশাল ইনফর্মার। পাঁচুবাবুর ধারণা ছিল হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীকে কেউ কিছু করতে পারে না। ওয়ার্ডে রুগী সম্পূর্ণ নিরাপদে। সেই ধারণা থেকেই তিনি সেদিন ছেলেটিকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না পেয়ে 'বেড'-এ ভর্তি করে নিলেন রুগী হিসেবে।

১৪.৮.৭১-এর 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি খবর বেরোয়—"কলকাতা ১৩ই আগস্ট—সমগ্র কাশীপুর থানা এলাকায় গতকাল রাত থেকে যে ব্যাপক হত্যালীলা চলেছে, রাজ্যের খুনোখুনির রাজনীতিতে তা পূর্বের সমস্ত ঘটনাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এই নরমেধ যজ্ঞে নিহত সতেরজন, গুরুতর আহত সাত। বেসরকারী সূত্রে এবং পুলিশের একাংশের মতে নিহত ও আহতের সংখ্যা ৩০-এর উপর। অনেককে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ মহল থেকেই বলা হয়েছে।......

পরের দিন ১৫.৮.৭১-এর 'যুগান্তর' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে বলা হয়েছে 'বরানগর-কাশীপুর এলাকা বেশ কিছুকাল ধরেই উপদ্রুত। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার হঠাৎ সেখানে কোন কাণ্ড ঘটেনি। তাহলে বীভৎস তাণ্ডবের কৈফিয়ৎ কি? পুলিশ কি করছিল? আগের দিন রাত্রে যখন খুনের বদলা নেওয়ার জন্য হাজারখানেক মানুষ পথে নেমেছিল তখনই তো যা ঘটতে চলেছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তবু শুক্রবার সারাদিন এই হত্যালীলা চললো কি করে?..........."

সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত ঘাতকবাহিনী এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে। তাঁর বুকে ছুরি ঠেকিয়ে প্রশ্ন করে, 'ছেলেটিকে ভর্তি করা হল কেন?' তার অর্থ নকশালদের সঙ্গে পাঁচুবাবুর

যোগাযোগ আছে।...............সেই হতভাগ্য ছেলেটি বিশ্বাস করেছিল যে এবারের মত বেঁচে গেল সে। কারণ, সে হাসপাতালের বেডে ভর্তি হয়ে গিয়েছে—অতএব নিরাপদ। তার পরের অবস্থাটা সে ভাবতে পারেনি। গুণ্ডার দল সশস্ত্র অবস্থায় Male Medical Ward-এ হানা দিয়ে প্রতিটি 'বেড'-এ ছেলেটিকে খুঁজতে তাকে। ভয়ে বোবা হয়ে যায় 'ওয়ার্ড সিস্টার' ও সমস্ত পেশেন্টরা। প্রতিটি পেশেন্ট-এর মুখের উপর টর্চ ফেলে দেখতে থাকে তারা। সেই ছেলেটি যার নাম আজ আর মনে নেই ভয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বেড থেকে তুলে নেয়। ওয়ার্ড সিস্টার তাঁর রুগীকে বাঁচানোর জন্য কাতরভাবে কাঁদতে থাকে কিন্তু কোন লাভ হয় না। তারা 'পেশেন্ট'কে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। সেই রাতেই দশআনির জমিদার বাড়ির পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করা হয় গুণ্ডা পঞ্চম-এর নেতৃত্বে।............তারপরে সারারাত ধরে চলতে থাকে বাড়িতে বাড়িতে, আনাচে কানাচে, গলি খুপচিতে গুণ্ডাদের তল্লাসি নকসাল খুঁজে বের করার। কাশীপুর রোডের উপরে শুধু পুলিসের কালোগাড়ির মিছিল আর গুণ্ডাদের বিকট উল্লাস। ১২ তারিখ সারারাত আর ১৩ তারিখ দিনরাত ধরে চলে এই তল্লাসি আর খুনের মহোৎসব। দলে দলে চলেছে গুণ্ডা বাহিনী আর তাদের সঙ্গে রয়েছে সাধারণ নিরীহ ভাল ছেলেরাও। ম্লান মুখে তারা গুণ্ডাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিছক প্রাণের মায়ায়।............

......এর মধ্যেই দেখা গেছে অল্পবয়সী কয়েকজন নকশাল ছেলে প্রাণের ভয়ে হাসপাতালের 'ডেথ হাউস'-এ মড়ার মত পড়ে থেকেছে। কংগ্রেসী হওয়া সত্ত্বেও ডোমেরা তাদের ধরিয়ে দেননি। দেখা গেছে 'আই আউটডোর'-এর ডার্করুমে গাদাগাদি করে নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে নিঃশব্দে থেকেছে কয়েকজন। 'আউটডোর'-এর কর্মচারীরা নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে—বাইরে থেকে আউটডোরে ও ডার্করুমের তালা বন্ধ করে রেখে। জানি না শেষ পর্যন্ত বাঁচান সম্ভব হয়েছিল কিনা।

তিনদিন ধরে জ্বলেছে রতনবাবু রোডের বিশ্বাসবাড়ি। দুপুরবেলা মাংস পোড়া গন্ধে পুরো অঞ্চলের বাতাস বিষাক্ত হয়েছে। শোনা গেছে নকশাল ছেলে বাবলা বিশ্বাসকে না পেয়ে তার বাবাকে কেটে টুকরো টুকরো করে পেট্রল ঢেলে পোড়ান হয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক। গুণ্ডারা পুলিশকে বলছে, 'আপনারা চুপচাপ থাকুন। সব পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আমরা ফেলে যাচ্ছি, আপনারা শুধু তুলে নিয়ে যান।' পুলিশ তাদের কথামতো রাইফেল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর গুণ্ডাদের ফেলে যাওয়া দেহগুলি হাসপাতালে বয়ে নিয়ে এসেছে। হাসপাতালের কয়েকজন সিস্টার আর কর্মচারী মিলে কাদা আর রক্তমাখা দেহগুলি পরিষ্কার করে, যারা কখনও বেঁচে আছে তাদেব হাতের কাছে যা পেয়েছে ছেঁড়া কাপড় সায়া ইত্যাদি পরিয়ে দিয়েছে। সেদিন একজন মাত্র ডাক্তার ছিলেন হাসপাতালে। তিনি নিজে আর.জি.কর-এর একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ঐ 'বডি'গুলোর মধ্যে যারা তখনও বেঁচে (সব ১৬—২৬-এর মধ্যে বয়স)—তাদের তিন-চারজন করে একসঙ্গে নিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়ে এসেছেন বারে বারে সারাদিন-সারারাত। এই হাসপাতালে ভর্তি করার ঝুঁকি তিনি আর নেননি। এভাবে দুরাত অন্তত কয়েকশ ছেলের মৃত অথবা অর্ধমৃত শরীর চোখের সামনে দেখতে হয়েছে।"[২৭]

সত্তর দশকের 'মুক্তির যুদ্ধ ঘরে এবং বাইরে'। পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. আই. (এম-এল)-এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে মুক্তির দশকের আন্দোলন, অন্যদিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্বপাকিস্তানে শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াহিয়ার লীগ শাহীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা। '৭১-এর সেই মুক্তিযুদ্ধে তারা পাশে পেয়েছিল ভারতবর্ষের মানুষকে। ভারতবাসী, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পূর্ণ সমর্থন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে লিখছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সচেতন বুদ্ধিজীবী বিদগ্ধ মানুষ—কবি, সাহিত্যিক সকলেই। তাঁরাই কিন্তু আশ্চর্য রকমের নীরব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুক্তির দশকের আন্দোলন সম্পর্কে। এদেশে দু'চোখ ভরা বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে যে তরুণ কিশোর যুবকরা নৃশংসভাবে খুন হচ্ছিল তাদের দিকে তাকাবার দৃষ্টি তখন কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ছিল না। স্মরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার মা মায়া চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "পূর্বপাকিস্তানের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মিটিং মিছিল করেছেন, রাস্তায় নেমেছেন। কিন্তু হাজার হাজার নিরপরাধ কিশোর তরুণ-যুবকের রক্তে ভেজা পশ্চিমবাংলার মাটি তাঁদের হৃদয়ে কোনো দাগ কাটতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ করার সাহস সেই দুর্বল, ভীরু, উচ্চাভিলাষী, স্বপ্নবিলাসী সমাজের ছিল না।"[২৮] আনন্দবাজার পত্রিকায় ১ পৌষ ১৩৭৮, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের উপর পাকিস্তান সরকারের অত্যাচার প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'ক্ষমা? ক্ষমা নেই।' তারই প্রত্যুত্তরে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সুভাষ যা দেখেছেন' কবিতাটি এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

স্মরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে লেখা অন্য একটি প্রবন্ধ 'বিদ্রোহ চারিদিকে ঃ স্মরণ চট্টোপাধ্যায়'তে মায়া চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে—'বুদ্ধিজীবী সমাজের একটা বিরাট অংশ সে সময় একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, মিটিং মিছিল করেছিলেন, সেরকম সামান্যতম মনোযোগও পশ্চিমবাংলায় সংগ্রামী বিপ্লবীদের দিকে দেননি। এক অদ্ভুত ঔদাসীন্য ও অনীহা নিয়ে সতর্কভাবে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলেছিলেন। তা কি কেবল শাসকের রক্তচক্ষুর ভয়ে না প্রাণের আশঙ্কায় কে জানে? সাবধানী সতর্ক মধ্যবিত্ত সমাজে এক অংশ চোখের সামনে নির্মম হত্যা ঘটলেও প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ এই বিপ্লবের উপর গোপন সহানুভূতিও ছিল। এক বিচিত্র কাপুরুষ মনোভাব একদিকে সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অন্যদিকে অনমনীয় দৃপ্ত যৌবন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, শাসন পীড়নকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছিল। সত্তরের দশকের এই বিপরীত মানসিকতার পাশাপাশি অবস্থান এক গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল।'"

মায়া চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্রোহ চারিদিকে ঃ স্মরণ চট্টোপাধ্যায়', এবং জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা (৩য়), পৃঃ (১৩৭-৩৮)।

'সুভাষ যা দেখেছেন
সুভাষ! যা দেখেছেন যশোহরে, মনিরামপুরে ;
যে পিশাচ

জল্লাদ মেহের আলি—তার কীর্তি, পাশবিক ধর্ষণ ও নরহত্যা
চোখে কি পড়েনি, অন্য এক অবাক বাংলায়, যা আপনার স্বদেশ সেখানে
ঐ কালো ছায়া—ঐ ভয়ংকর মুখ! মানুষের মাংসপিণ্ড লোলুপ নরখাদক
আমাদের আকরমের মায়েদের থালায় লাথি মেরে
নিয়ে যায় আকরমকে থানায় ; বেয়নেট খুঁচানো
ইসমাইল পড়ে থাকে নির্জন খালের ধারে—
'ক্ষমা? ক্ষমা নেই'—আপামর পবিত্র স্পর্ধা মানুষের সপক্ষে সুভাষ ;
এই তো প্রত্যাশা ছিল ; আমাদের দৈনিকপত্রিকাগুলি প্রতিবেশী
পশুদের পাপ কিংবা পুণ্যশ্লোক কবিদের দেশপ্রেম ছাড়া
সংবাদ ছাপে না.................. ....
আপনার প্রচণ্ড ক্রোধ—দেশান্তরে—তাই আমাদের কেমন তরল বলে মনে হয়।"[২৯]

সত্তরের দশকের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া, দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, "সত্তরের দশকেই একদল নকশাল আন্দোলন কেমনভাবে হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে লিখতে নামেন। এই বিরোধী লেখা বিভিন্ন চেহারায় দেখা দেয়। (ক) এ বিষয়ে, অর্থাৎ ঘরের চৌকাঠে অবিরত রক্তপাত বিষয়ে না লিখে সুখী, পলায়নী যৌনতা সর্বস্ব লেখা (খ) এ বিষয়ে নীরব থেকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই যত আত্মদান ও আদর্শবাদিতা দেখে লেখা। এ কাজ যাঁরা করেছেন তাঁদের বিষয়ে যেন আমরা বাকি জীবন সতর্ক ও অতন্দ্র থাকি। নিজের ছেলে ভাই-বন্ধুর মৃত্যুতে অবিচল থেকে পড়শীর ছেলে ভাই-বন্ধুর জন্য যারা অত্যন্ত হেদোয়, তারা ঘর বা পর কারো বন্ধু হবার পক্ষেই সন্দেহজনক।................এসব লেখালেখি একটা কথাই প্রমাণ করে যে সত্তরের দশক এমন কোনো গোড়ায় ঘা মেরেছিল যে তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নামবার দরকার হয়েছিল। এই আন্দোলনে শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যবিত্তের জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিতে প্রতিপক্ষ খুবই ভয় পায়। অতএব সংস্কৃতি সাহিত্য ক্ষেত্রে শুরু হয় প্রচণ্ড সুকৌশলী চক্রান্ত।"[৩০]

তখন এক একটি অঞ্চল জুড়ে পুলিশ 'কম্বিং' করত, চিরুনি তল্লাশি। হয়ত কেউ বহুদিন পর দু'এক ঘন্টার জন্য বাড়ি এসেছে, খবর পৌঁছে গেছে পুলিশের কাছে। দলের মধ্যেই যে ছিল পুলিশের চর। এরকম এক বন্ধুকে বিশ্বাস করে খুন হয়েছিল স্মরণ চট্টোপাধ্যায়। সে বিশ্বাস করত যে, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। তার মা মায়া চট্টোপাধ্যায় তাই বলেছেন, "মানুষের মধ্যেও ক্রূর সাপ থাকে—একথা স্বপ্ন দেখা পাগলগুলো বিশ্বাস করতে পারেনি। সে মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। বড় কঠিন মূল্য।"[৩১]

সুবিধাবাদ, আদর্শহীনতার যুগে তাদের মধ্যে ছিল বিপ্লবী নিষ্ঠা ও আদর্শ। সাময়িকভাবে হলেও এই তাজা প্রাণগুলি অস্থির করে তুলেছিল শাসকশক্তিকে। রাষ্ট্রশক্তিও নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে। জয়া মিত্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, "১৯৭০-র ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে শুধু পশ্চিমবাংলার জেল গুলিতে বেয়নেটে নিরস্ত্র বন্দী কিশোর তরুণদের হত্যা ঘটনা পনেরটি। নিহতের সংখ্যা সরকারী

হিসেবেই ৬৫। আহত ৩১০।”[৩২] শত শত যুবক-যুবতীকে জেলের ভিতরে ও বাইরে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। বহরমপুর জেলে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খুন হয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র তিমির সিংহ। মোট সাতজনকে সেদিন মারা হয়েছিল বেয়নেটি দিয়ে খুঁচিয়ে—“চব্বিশে ফেব্রুয়ারি জেল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায় সাতজনকে হত্যা করে। গুলির শব্দ পাছে বাইরে জানাজানি হয়, তাই বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাদের। তার মধ্যে সতের বছরের বালক গোরা ছিল। সে খুন হয় তার নিরুপায় দাদার চোখের সামনে।”[৩৩] তিমিরের মা বলেছেন, “বহরমপুর জেলে পুলিশের গুলি চালনার খবর যেদিন কাগজে বেরোলো, প্রথমে ওর নাম বেরোয়নি। কিন্তু আমার মনে হল আমার ছেলে তো কখনোই পেছনে পড়ে থাকেনি, এ ব্যাপারেও হয়ত থাকবে না। গেলাম বহরমপুরে। অনেক চেষ্টায় তিমিরের খোঁজ পাওয়া গেল। বীভৎসভাবে মারা হয়েছিল ওকে। চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছিল। এমনিভাবে মরলে জানবে কি আর সেদিন ওকে যেতে দিতাম।”[৩৪] ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ বহরমপুর জেল হত্যার এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ‘অধুনা জলার্ক-এর ‘সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী’ সংখ্যায়। সেখানে তিমির সিংহ এবং তার ছয় সঙ্গীর হত্যার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এক জনৈক জেল কর্মচারী। সেই রাতে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারই কিছুটা অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—
“.........ঘটনাটি ঘটান হয়েছিল মধ্যরাতে। জেলাশাসক অশোক গাড়ি চেপে এসে জেলের গেট খুলে ভিতরে এসে নির্দেশ দিলেন নকশাল বন্দীদের উপর আক্রমণ চালাতে। আগে থেকেই এর পরিকল্পনা ছিল। আমি ঘটনাস্থল থেকে দূরে ছিলাম। এইসব তরুণদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ছিল ভাল। আদর্শের প্রতি ওদের অবিচল নিষ্ঠা আর নির্ভীকতা বিস্মিত করত আমাকে। মতবাদে আমি ওদের বিরোধী জেনেও খোলাখুলি আলোচনা হত ওদের সঙ্গে। জেলের কর্মচারী হিসেবে আমাকে ওরা কোনদিন ঘৃণার চোখে দেখেনি। এইসব উজ্জ্বল ছেলেদের প্রতি আমার একটা স্নেহের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। হয়তো সেটা তিমিরের মত ছেলেরা বুঝেও ছিল।

আক্রমণ শুরু হল। কুখ্যাত জেল ওয়ার্ডাররা সংগঠিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র নকশালবন্দীদের ওপর। তার আগেই পরিকল্পনা মাফিক অন্য বন্দীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্য সেলে। জেলা শাসক অশোকের উপস্থিতিতে তারই পরিচালনায় চলে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী নারকীয় আক্রমণ আর হত্যালীলা। আমাদের উপর হুকুম হয়েছিল অফিস ঘরে যেতে। তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। সশস্ত্র ওয়ার্ডাররা লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র গুটি কয়েক নকশালপন্থী তরুণদের ওপর। তিমির ও তার বন্ধুরা সেই হিংস্র খুনীদের সাধ্যমত বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ওদের শ্লোগান নকশালবাড়ি লাল সেলাম, কমরেড চারু মজুমদার লাল সেলাম, সঙ্গে ভেসে আসছিল খুনী ওয়ার্ডারদের পৈশাচিক উল্লাস আর অকথ্য অশ্লীল গালি-গালাজ। আমার বুকের মধ্যে সমস্ত রক্ত যেন জমাট বরফের টুকরো। অসহায় ক্লীব হয়ে বসে আছি অফিস ঘরে। দুঘন্টা ধরে হয়েছিল সেই অসম লড়াই। একদিকে সংখ্যায় দশগুন কুখ্যাত ঘাতক ওয়ার্ডাররা অন্যদিকে তিমির আর তার বন্ধুরা (বিপ্লব, মৃদুল, গোরা, আশিস প্রভৃতি এদের

কয়েকজনের নাম মনে আছে।) আবার রাত দুটোর পর নেমে এল স্তব্ধতা। অল্পক্ষণ পরে ডাক এল আমার। ডি. এম. অশোক ডাকছে মৃতদের আইডেন্টিফাই করতে। কেননা আমিই তাদের চিনতাম ভালভাবে।

সেই দুঃস্বপ্নের রাত চিরকাল আমার মনে পোড়া ঘায়ের চিহ্নের মত থেকে গেছে। যে দৃশ্য দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। মোট আটটি দেহ। তিমির তখনও জীবিত ছিল—অস্ফুট স্বরে শুনছিলাম তার শেষ উক্তি—নকশালবাড়ি লাল সেলাম। মানবদেহ বলে কিছু ছিল না। দলা পাকান থেতলানোঁ মাংসপিণ্ডের স্তূপ ছড়ান। জামা কাপড়ের কোন অস্তিত্ব নেই। চারদিকে রক্তস্রোত। এ কোন দৃশ্য আমার সামনে! কোমরে দুহাত রেখে সেই হৃদয়হীন ডি. এম. অর্ডার করল—'এক এক করে আইডেন্টিফাই করুন।'"[৩৫] জেলের মধ্যে একইভাবে হত্যা করেছিল পুলিশ দ্রোনাচার্য ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে।

প্রস্তুতি বেশ কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হলেও নকশালবাড়ি আন্দোলনের চরম পর্যায় ছিল ১৯৬৯-৭১। '৭২-এর মাঝামাঝি থেকে আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। তখন বিনা বিচারে দিনের পর দিন জেলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী। পশ্চিমবাংলায় কোন কোন বুদ্ধিজীবীর হয়ত সমর্থন ছিল এই বিপ্লবে, তবুও কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি দেশের মানুষের পক্ষ থেকে। বিপ্লবের অপরাধে অকালে হারিয়ে গেছে অসংখ্য তাজা প্রাণ। আবার আন্দোলনে জড়িত না থেকেও শুধুমাত্র তারুণ্যের বা কৈশোরের অপরাধে অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয়েছে, শেষ হয়ে গেছে কত ছেলে-মেয়ে। বেয়নেটের খোঁচায় তখন হারিয়ে গিয়েছিল তারুণ্যের স্বপ্ন। এরকমই একটি ছোট্ট নরম নির্দোষ মেয়ে পাপুর কথা বলেছেন জয়া মিত্র। তাকে পুলিশের গুহা থেকে 'থেঁতো হয়ে যাওয়া' মাংসপিন্ডের মত ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জেলারের হাতে। তিনি মৃতদেহ ভেবে প্রথমে তাকে নিতে চাননি। জয়া মিত্রেরই কথায়, "পাপু বলে একজন এসেছিল, সে নিজে জেনে বুঝে আসেনি। হয়ত তার কাছ থেকে কোনো খবর চেয়েছিল পুলিস কিংবা সেই সময়ের যে অন্যতম অপরাধ তারই সে শরিক ছিল—কম বয়সী হওয়া। কসবা থানা থেকে আসা আধমরা পাপুর কথা এজন্য এখানে এল যে, পাপুর কোন কিছুর সঙ্গেই যোগ ছিল না। যে সব খোঁজ ওর কাছে চাওয়া হচ্ছিল তার সঙ্গে না—যে অভিযোগ ওর সম্পর্কে করা হচ্ছিল তার সঙ্গেও নয়—এমনকি তেমন কোনো মতাদর্শের সঙ্গেও নয়।"[৩৬]

সি. পি. আই (এম-এল) তৈরি হবার কিছু দিনের মধ্যেই পার্টি নেতাদের পারস্পরিক মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়। ১৯৭০-র আগস্টেই সুশীতল রায়চৌধুরী মূর্তি ভাঙা, স্কুল পোড়ানোর সমালোচনা করেন। চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জি এবং সুশীতল রায়চৌধুরীর মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। অসীম চ্যাটার্জির কথায়, "মারামারির লোকেরা সামনে এলো, নীতির লোকেরা পেছনে, অর্থাৎ যারা বোমা বানাতে পারে তারাই কমরেড। পার্টি গানকে কমান্ড করতে পারলো না, গানই পার্টিকে কমান্ড করতে লাগল।....................আমি খতম লাইনকে নাকচ করছি না। চিংকাং লাইনের কথাও মনে রাখছি। সশস্ত্র সংগ্রাম দুধরনের লোকেরা করে—টেররিস্টরাও করে, কমিউনিস্টরাও করে। টেররিস্টদের কাছে হাতিয়ার

ধরাটাই সশস্ত্র সংগ্রাম আর কমিউনিস্টদের কাছে সশস্ত্র সংগ্রাম হলো product of the development of class struggle.................গণআন্দোলন না করে প্রশ্ন উঠে গেল তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও কিনা। ক্লাশ স্ট্রাগলের সহজ পন্থা আছে যদি তুমি মৃত্যুকে জয় করতে পারো ; যেন সোস্যাল ডেভলেপমেন্টের কোনো অবজেকটিভ ল নেই, নির্ভর করবে তুমি মৃত্যুকে ভয় পাও কিনা সেই সিদ্ধান্তের উপর। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের জন্য সমাজ বিকাশের এরকম নিয়ম ; আর মৃত্যুভীত ভীরুদের জন্য আর এক রকম নিয়ম। সেইজন্যে এই লাইনকে আমি সোস্যাল টেররিস্ট লাইন বলেছি। পার্টিকে বলেছি সোস্যাল টেররিস্ট পার্টি এবং এও বলেছি যে টেররিস্ট পার্টি শত ভাগে ভাগ হয়, হবে।"[৩৭] সুশীতল রায়চৌধুরীর দলিলের জবাবে চারু মজুমদারের বক্তব্য এবং সমালোচনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পার্টি তৈরি হবার এক বছরের মাথায় প্রথম পার্টি কংগ্রেস হয় (১৯৭০, মে)। তারপরই মতবিরোধের কারণে পার্টি ভাঙতে থাকে। ১৯৭২-র মার্চ মাসে পাঞ্জাবের লোকযুদ্ধ পত্রিকায় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম সম্পর্কে চারু মজুমদার বলছেন, "অল্প কথায় বলা যায়, নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তারা সকলেই পার্টির' 'শ্রেণীশত্রু খতম' ও 'সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন'-এর উপর আক্রমণ করেছে। এইসব সংশোধনবাদীরাই আবার গণআন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত। কেউ কেউ তো এমনও বলতে শুরু করেছে যে, ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পরিস্থিতিই আসেনি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থাৎ বন্দুকের দ্বারা গণসংগ্রামের রাস্তা উন্মুক্ত করবে ও চালিয়ে যাবে। এইভাবেই জনযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠবে।"[৩৮] ১৯৭২-র জুনেই কিন্তু চারু মজুমদারকে স্বীকার করতে

১৪.৭.৭২ তারিখে স্ত্রী লীলা মজুমদারকে লেখা একটি চিঠিতে চারু মজুমদার বলছেন—
লীলা,

...............ভিয়েৎনাম ডে তে একটা মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মিছিলটা হবে শ্রমিক কমরেডদের নিয়ে, ২০শে জুলাই। কাগজে নিশ্চয় বেরোবে। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম বড় কম হচ্ছে। তার কারণ খতমের উপর বড় বেশী জোর পড়ে গিয়েছে এটা বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি আমরা কাটিয়ে উঠছি। পার্টির মধ্যে সমালোচনা বেড়েছে, কাজেই সংশোধিত হবে। আমাদের পার্টি অল্পদিনের, অভিজ্ঞতাও কম ফলে বিচ্যুতি-হওয়া স্বাভাবিক। কমরেডদের নজরে পড়েছে বিচ্যুতি এটা শুভ লক্ষণ.................

চারু মজুমদার

২৪ নভেম্বর ১৯৯৬, আনন্দবাজার 'রবিবাসরীয়'তে রুনু গুহনিয়োগী 'রক্তের দশক-এর উদ্ধৃত।

হল যে তাঁদের লড়াই একটা স্তর পর্যন্ত ওঠার পর থেমে গেছে। তাঁরা ধাক্কা খেয়েছেন অর্থাৎ তাঁদের পথ ঠিক ছিল না। এর আগেই খতমের 'লাইন' চীন পার্টির কাছে সমালোচিত হওয়ায় সংগঠন দুর্বল হতে লাগল। ১৯৭২-র ৯ জুন 'জনগণের স্বার্থই পার্টি স্বার্থ' শিরোনামে একটি লেখায় তিনি বলছেন---"আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম একটা পর্যায়ে ওঠার পর আমরা ধাক্কা খেয়েছি। এই সময়ে আমাদের কাজ হল পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা।

পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্যাপক শ্রমিক কৃষক জনগণের মধ্যে পার্টি গঠন করতে হবে। রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ পার্টি যদি আমরা গঠন করতে পারি, তবেই আমরা পারব ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে, তবেই আমরা পারব সংগ্রামকে পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে। আমি আশা করছি অতি অল্পকালের মধ্যেই আমরা তা পারব।"[৩৯]

১৯৭২-এর জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ইন্টালির মিডল রোডের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে চারু মজুমদারকে। তখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। এবং যদিও পুলিশ ঘোষণা করে যে তারা চারু মজুমদারকে সুস্থ রাখার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিন্তু মাত্র ১২ দিনের মধ্যেই পুলিশী হেফাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বড় মেয়ে অনিতা তখন ডাক্তারী পড়ত ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। পুলিশ এসে তাকে জানায় যে চারু মজুমদার মারা গেছেন। পুলিশ প্রথমে তাকে লালবাজারে নিয়ে যায়, সেখানে জানানো হয় যে অসুস্থতার কারণে চারুবাবুকে এস. এস. কে. এম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চারু মজুমদারের শবদেহ হাসপাতাল থেকে যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর নিকটজনদের মধ্যে একমাত্র বড় মেয়ে অনিতাই ছিল সেখানে। অনিতার মনে হয়েছে তার বাবার মৃত্যু রহস্যজনক। তার নিজের কথায়—"আমার কাছে বাবার মৃত্যু রহস্যজনক যে যে কারণে সেগুলো :

১। মর্গের থেকে যখন ওঁর শবদেহ গাড়ীতে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল ওরা, ঠিক সে মুহূর্তে চারদিকের আলো নিভে গেল। পাঁচ-ছয় মিনিট বাদেই আলো জ্বলতেই দেখি ওঁর শবদেহ গাড়ীতে তোলা হয়ে গেছে।

২। আমাকে যখন ওরা এস. এস. কে. এম হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন একজন পুলিশ অফিসার অন্য একজনকে খুব সাধারণ ভাবেই বলে ফেলেছিলো—"শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও চারুবাবু মাথা নোয়ালেন না।"

৩। আমরা শবদেহ নিয়ে আসতে চাইলে ওরা আমাদের কথায় রাজী হয়নি।

৪। মর্গ থেকে কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত শবদেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপড় বাঁধা ছিলো এবং শ্মশানে আমার ছোট ভাই যখন মুখাগ্নি করলো বা শবদেহ ফার্নেসে ঢোকানো হলো পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাপড় বাঁধা অবস্থাতেই।"[৪০]

চারু মজুমদারের মৃত্যু দলীয় অন্তর্বিরোধ ও পারস্পরিক মতভেদে দুর্বল হয়ে পড়া আন্দোলনকে প্রায় স্তব্ধ করেছিল। এর ঠিক একবছর আগে পুলিশ হত্যা করে সি. পি. আই (এম-এল) বিশিষ্ট নেতা সরোজ দত্তকে। ১৯৭১-র ৪ আগস্ট মাঝরাতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সরোজ দত্তকে। গ্রেপ্তারের পর ৫ আগস্টের ভোর রাতে ময়দানে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বলে পেছন থেকে গুলি করে পুলিশ। মৃত্যুর পর দেহ থেকে মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে সরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে মৃতদেহটি সনাক্ত করা না যায়। এবং অনেক দিন পর পুলিশ সরোজ দত্তকে ফেরার বলে ঘোষণা করে। আজও সরকারিভাবে সরোজ দত্তের মৃত্যুর কথা প্রকাশ করেনি। অভিনেতা উত্তমকুমারের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু তিনি তার জীবদ্দশায় কখনও এই ঘটনার কথা স্বীকার করেননি এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ঘটনার সত্যতা অস্বীকার

করেন। তাঁর মৃত্যুর পর নানাজনের লেখায় এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়। অমৃতবাজার, এবং দৈনিক কালান্তরে সরোজ দত্তের গ্রেপ্তার এবং পুলিশের হাতে নিহত হবার ঘটনা প্রকাশিত হলেও পুলিশ ঘটনাটি তখন সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুলিশ সরোজ দত্তের গ্রেপ্তার এবং হত্যার কথা স্বীকার না করলেও তারা পরিচয় জেনেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল, কাগজেও সে কথা লিখেছিল। তাঁর স্মৃতিচারণে মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কাগজে লিখেছিলো যে পুলিশ জেনেশুনেই সরোজ দত্তকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। অমৃতবাজারে বেরিয়েছিল। স্টেটসম্যানে একটা ছোট্ট নিউজ বেরিয়েছিলো, মোহনবাগান টেন্টের পেছনে আন-আইডেন্টিফায়েড ডেড বডি পাওয়া গেছে। তার প্যান্টের ভেতর থেকে লুঙি বেরিয়ে ছিলো। সরোজ দত্তের নাম ছিলো না।"[৪১] সরোজ দত্তের ভাইয়ের স্ত্রী রিক্তা দত্ত তাঁর বাবু দা'র স্মৃতিচারণে বলেছেন, "আমরা খোঁজ পাই না। একদিন শুনলাম অমৃতবাজারে বেরিয়েছে সে নেই। যখন শুনলাম প্যান্টের ভেতর থেকে লুঙি বেরিয়েছিলো, বুঝলাম সরোজ দত্ত ছাড়া কেউ নয়। একবার আমাদের নড়ালের এক বৃদ্ধ কৃষক কমরেড এসেছিলেন। এসে ধুতি খুলে ফেলছে। আমি বললাম—এ কী করছেন! দেখি তলায় লুঙি আন্ডারউইয়ারের মতো পরে ধুতি পরেছেন। বাবুদাকে গল্প করেছিলাম, বাবুদা তাই অভ্যেস করে।"[৪২]

সরোজ দত্ত এবং এক বছরের মধ্যে চারু মজুমদারের মৃত্যুতে, নকশালবাড়ি আন্দোলন আগের তীব্রতা এবং ব্যাপকতা হারিয়ে ক্রমশ থিতিয়ে পড়তে লাগল। সঠিক নেতৃত্ব ও নির্দিষ্ট পথের অভাবে ফুটন্ত যুবশক্তির স্বপ্ন দেখা মুক্তির আন্দোলন, সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়নি। প্রশাসনের চূড়ান্ত নিপীড়ন, সুকৌশলী চক্রান্ত এবং কিশোর তরুণদের অভিজ্ঞতার অভাবে এই আন্দোলন থেমে গিয়েছিল। সমাজের অবক্ষয়, অন্যায়, ত্রুটি-বিচ্যুতি অশান্ত করে তুলেছিল দেশের যৌবনকে। দ্রোণাচার্য ঘোষ, ১১.৬.৬৮-তে লেখা দিললিপিতে বলছে, ".....এটা স্পষ্ট বুঝেছি এই সমাজকে পাল্টাতে

জামসেদপুর থেকে লেখা আর একটি চিঠিতে মুরারি মুখোপাধ্যায় মাকে লিখছে—"........শুধু একটি কথা মনে রেখো, আমি একা নই। আমার মতো আরও কয়েক হাজার গরীব সাথী নতুন সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমরা জানি নতুন কিছু গড়তে গেলে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়—অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক প্রাণের বিনিময়ে সুখের সমাজকে পাওয়া যায়। এরই জন্য আমরা বুক বেঁধেছি। আমবা তৈরী হচ্ছি।

জানি, আমাদের এই জীবনে হয়তো সেই অত্যাচারহীন সমাজের মুখ আমরা দেখে যেতে পারবো না, তবু বিশ্বাস করো, আমাদের মন আনন্দে উজ্জ্বল, কোন রকম দুঃখ আমাদের স্পর্শ করে না। কেন না, আমরা জানি, আমাদের পর যারা আসছে তাদের আর আমাদের মতন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হবে না। নতুন সমাজে তারা সুখ পাবে, স্বস্তি পাবে। এর চেয়ে বেশি আর তো কিছু চাই না"—মুরারি মুখোপাধ্যায়ের জামসেদপুর জেল থেকে ৩০.৩.৭০. এ মা'কে লেখা চিঠি। জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা ২, পৃঃ ১১০-১১১।

হবে, না পাল্টাতে পারলে আমি বাঁচতে পারি না। আমার কোন স্বাধীনতা নেই।"[৪৩] মুরারি মুখোপাধ্যায় জেল থেকে একটি চিঠিতে মাকে লিখছেন, "মা তোমরা আমায় ক্ষমা করো।

আমার অবাধ্যতাকে মার্জনা করো। এছাড়া কিছু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তো তোমায় আগে লিখেছিলাম, এই অত্যাচার আর দুঃখের শেষ করতে চাই। আগামী দিনের ছেলেমেয়েরা যেন সুখের মুখ দেখতে পারে। আগামী দিনের মায়ের যেন চোখের জল ফেলতে না হয়। আমরা সমাজটাকে নতুন করে গড়তে চাই। এর জন্য যে কোন রকম ত্যাগ স্বীকারে আমরা প্রস্তুত। মা, তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর, আমরা সমস্ত দুঃখকে নিশ্চয়ই জয় করতে পারবো।"[৪৪] নেতৃত্বের ত্রুটি ও ভ্রান্তিতে তাদের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, বিপ্লব সার্থকতার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। বিপ্লবের প্রচেষ্টার অপরাধে এবং শাসক শক্তির চূড়ান্ত প্রতিরোধ ও নিপীড়নে হারিয়ে গেল একটা প্রজন্ম—একটি দশকের প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, সম্ভাবনাময় অসংখ্য জীবন।

শ্রেণীশত্রুর নামে নির্বিচারে হত্যা, স্কুল-কলেজ পোড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরী-লাইব্রেরী নষ্ট করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য সৃষ্টির ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কিছুটা বিরূপতার সৃষ্টি হয়। নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী জয়া মিত্র কিন্তু সাধারণ মানুষের বিরূপতার কথা মেনে নিতে পারেননি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তাঁরা যদি সত্যিই বিরূপ হবেন, তাহলে কেন, কিসের টানে নিজেদের বিপদ উপেক্ষা করেও তাদের রক্ষা করতেন। পুলিশের চোখের সামনেই বালতি-বালতি জল ঢেলে রাস্তা থেকে ধুয়ে দিতেন রক্তের চিহ্ন, যাতে পুলিশ বুঝতে না পারে আহত রক্তাক্ত বিপ্লবী কোন পথে পুলিশের চোখ এড়িয়ে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে তাদের উপর নেমে আসতে পারত প্রশাসনের চূড়ান্ত নিপীড়ন, নির্যাতন, অপমান। আন্দোলনের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নন এমন মহিলারাও দিনের পর দিন খাবার তৈরি করে রাখতেন, ঘর ছাড়া, পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়ানো অভুক্ত ছেলেমেয়েগুলো এসে নিয়ে যাবে বলে। এবং সেই সময়টিকে অতিক্রম করে অনেক পথ পেরিয়ে এসে আজও তিনি বিশ্বাস করেন, যারা মনেপ্রাণে নকশাল বাড়ির পথ গ্রহণ করেছিল, যাদের ভাবনায় কাজে ছিল সততা তারা কোনদিনই সেই পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। সারা জীবন ধরে কোন না কোন ভাবে সমাজে বদলের, গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসার, আপোষ না করার স্বপ্ন তারা দেখবে এবং বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করবে। একই কথায় প্রতিধ্বনি শুনি শুভেন্দু দাশগুপ্তের লেখাতে,— "নকশালবাড়ী আন্দোলনের শিক্ষা এটাই, লড়াই করে যাওয়া শুধু হারার জন্য। জিতলেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে হয়। ক্ষমতার নিয়ম মানতে হয়। জিতলে ক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না। হারার জন্যই লড়াই করে যাওয়া। যারা নকশালবাড়ির আন্দোলনের এই বিষয়টা জীবনে প্রতিফলিত করতে পেরেছে। তারা আজও ভাঙছে। অমান্য করছে। অস্বীকার করছে প্রতিষ্ঠানের ভয়কে, প্রতিষ্ঠানের লোভকে।

কৈশোরের ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি দুটো বোধের জন্ম দিয়েছিল। একটা ভাঙা, অমান্যতা, অস্বীকৃতি, সাহস। আর একটা, সহমর্মিতা, মমত্ব, দুঃখ এইসব। এ দুটো বোধ নিয়ে চলা শুরু হয়েছিল। নকশালবাড়ীর আন্দোলন পথটা দেখিয়েছিল। কৈশোর যৌবন পেরিয়েও, সেই পথেই চলার চেষ্টায় রয়েছি। এখন বুঝি অন্য পথে চলার আর উপায় নেই। এটা অভ্যেস বলে নয়। স্মৃতি প্রতিশ্রুতির আবেগ অনেক গভীরে শিকড় পাঠিয়েছে। কৈশোরের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো আমার সন্তানকে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করি,

পারি না। আমার কৈশোরের চারপাশ থেকে তারটা অনেক আলাদা। এখন আরেকটা নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রতীক্ষায়, আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসে থাকাটাই নকশালবাড়ী আন্দোলনের উত্তর-কর্ম। যাতে আমার সন্তান নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে কেন নকশালবাড়ীর আন্দোলনে থাকা, কেন থেকে যাওয়া। ততদিন পর্যন্ত নিজেকেই নিজে বলে যাওয়া। নিজের কাছে সৎ থেকে যাওয়া। সেটাই নকশালবাড়ী আন্দোলনের উত্তরবোধ।"[৪৫]

ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে সত্তর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত উত্তাল হয়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গের জেলগুলি ভরে উঠেছিল নকশালপন্থী ছেলেমেয়েদের ভিড়ে। প্রশাসনের নির্মম অত্যাচারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল সমগ্র যুবসমাজ। অত্যাচারে অপমানে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ছেলেমেয়েগুলি জেলজীবনকে সহনীয় করে তুলবার জন্য প্রাণ খুলে গান গাইত। গানের মাধ্যমে অন্য ওয়ার্ডের বন্দী কমরেডদের কাছে পৌঁছে দিতে তাদের কথা, জানাত প্রতিবাদ। চার দেয়ালের অন্ধকারে নির্জন সেলের বন্দী জীবনে না ছিল এক টুকরো খোলা আকাশ, না ছিল সবুজের সজীবতা—একঘেয়ে যন্ত্রণাময় জীবনকে তারা ভরিয়ে তুলত সুরে, গানে। তার থেকেই সংগ্রহ করত তাদের প্রাণশক্তি। এইভাবেই তাদের বন্দী জীবনে রচিত হয়েছিল একের পর এক অজস্র গান, যুদ্ধ জয়ের গান। জয়া মিত্র বলেছেন, জেলখানার অন্ধকারে, নিপীড়ন-অত্যাচার-নির্যাতনে তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিল গান। যত বাড়ত পীড়ন, তত বেড়ে উঠত তাদের গান। তৈরি হয়ে উঠত নতুন নতুন গান, ছড়িয়ে পড়ত বন্দী সাথীদের মধ্যে। তাঁর কথায়, "যে সব জেল যত কুখ্যাত ছিল অত্যাচারের জন্য, যেমন দমদম বা আলিপুর সেন্ট্রাল, ততো ঝলমলে ততো নতুন নতুন গান হত সেসব জেলের গান।

এঞ্জিন, সে তো সহজেই গড়া যায়
ঠেলে দাও সেটা চলবে আপন মনে
কিন্তু তোমার গানকে বোমার মত
ছুঁড়ে দাও, দ্যাখো রেলওয়ে ডিপোটি
ভেঙে দেবে গর্জনে—"[৪৬]

গান বা শ্লোগান ছাড়া সেই বন্ধ গরাদের আড়াল থেকে সন্ত্রাস নিপীড়নের মুখে ছুঁড়ে দেবার মত সেই ছেলেমেয়েগুলোর আর তো কিছুই ছিল না। অত্যাচারে জর্জরিত, ক্ষত-বিক্ষত অপমানিত শরীর মনে একমাত্র জীবনীশক্তি ছিল গান। গানগুলির জন্ম হত সেই অন্ধকার সেলের মধ্যে কখনও কয়েকজনের একত্র ভাবনার মাধ্যমে, কখনও বা একাকী নির্জন নিঃসঙ্গতায়। তারপর সেই গান ছড়িয়ে পড়ত সকলের গলায়। কোর্টেই হত গানের আদান প্রদান। এক জেল থেকে ছড়িয়ে পড়ত সে সব গান আরেক জেলে—"বিভিন্ন জেল থেকে আসা সাথীদের ভিন্ন ভিন্ন গান বদলাবদলি হত পাশাপাশি দাঁড়ানো কোর্ট ঘর থেকে—

শব্দের পর শব্দকে জমা করো
এগোও একটি হুইসিল, তাল দিয়ে

সমুদ্রঘন তরঙ্গ দল গর্জন করে যাক
তোমার দৃপ্ত জিহ্বার তল দিয়ে
পিয়ানোগুলিকে রাজপথে টেনে আনো
ড্রামের আওয়াজ বাতাসকে ছিঁড়ে দিক
যা কিছু বাজুক ড্রাম বা পিয়ানো
ঝঞ্ঝা নামুক বজ্রকে হাঁক দিক।"[৪৭]

এইসব গান ছিল তাদের লড়াইয়ের গান, বেঁচে থাকার গান। অধিকাংশ গানই তৈরি হয়ে উঠেছিল সেই স্বপ্ন দেখা কিশোর-কিশোরীর আবেগ থেকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

"অক্ষরে অক্ষরে, শব্দে শব্দে ভাবনা জড়িয়ে তৈরি হয়ে উঠত তারা আর নিজেদের উপস্থিতি দিয়েই ভরে দিত সেলের নির্জনতা, ভুলিয়ে দিত শারীরিক যন্ত্রণা কিংবা সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার স্বাভাবিক আতঙ্কিকে।"

জয়া মিত্র, তোমার গানকে বোমার মত, যুদ্ধ জয়ের গান,
সম্পাদনা—স্বপন দাসাধিকারী, পৃঃ ৫১৬।

শিল্প হিসেবেও সেগুলি হয়ে উঠেছিল সার্থক। গানগুলিকে সুন্দর করে তোলার দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হত—শুধুই যেন আবেগ সর্বস্ব হয়েই সেগুলি হারিয়ে না যায়, গান হিসেবেও সার্থক হয়, একটি বিশেষ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। সেই নকশালপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী তরুণ-তরুণীদের বেঁচে থাকার মন্ত্র বন্দী জীবনে লড়াইয়ের হাতিয়ার ছিল সদ্য জন্ম নেওয়া গানগুলি। জয়ার কথায়, "গান তো হয়ে উঠেছিল যেন অস্ত্র, যেন বিজয়নিশানা, যেন চ্যালেঞ্জ। ইন্টারন্যাশনাল গাওয়া বন্ধ করবার জন্য আমাদের ছেলেদের ওপরে নির্মম লাঠি চলেছে পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলে একাধিকবার। ইন্টারন্যাশনাল, জগতের অনশন বন্দীদের সেই গানের গায়ে আমাদের বহু একান্ত প্রিয়জনের রক্ত লেগে আছে।"[৪৮] একদিনের কথা বলেছেন জয়া, বহরমপুর জেল অফিসে দেখা হয়েছিল তিমির সিংহের সঙ্গে। শুনলেন, তারা একটা নতুন গান শিখেছে। সেখানেই টেবিলে ফাইল সরিয়ে একটু জায়গা করে নিয়ে শিখতে শুরু করলেন গান। তিমির এক এক লাইন করে গাইতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে শিখে ফেলতে লাগলেন জয়া। তাঁদের 'সঙ্গীত শিক্ষার আসরে' ছুটে এসেছে জেলার এবং জেলের অন্যান্য কর্মচারীরা কিন্তু সংগীত শিক্ষার্থীরা কোন দিকেই নজর দেন না, কোন কথাই কানে নেন না। শেষে জানতে চান জেল কোডে গান গাওয়া বারণ কিনা। এইসবের মধ্যে দিয়ে জয়ার মুখস্থ হয়ে যায় গানটা। এর কয়েক মাস পরে ৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায় মৃত্যু হয় তিমিরের। তার শেখানো সেই শহীদ স্মরণের গানটি, "তিমিরের গান টি চিরশাশ্বত হয়ে থাকে জয়ার স্মৃতিতে—শহীদ স্মরণের সেই যে গান, 'জন্মিলে মরিতে হবে রে। জানে তো সবাই। তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই। সব মরণ নয় সমান'—এ গান যে কেউ শব্দ সাজিয়ে লিখেছেন, সুর দিয়েছেন সচেতনে—মনেই হয়নি এসব কথা। মনে হয়েছিল যেন তখনকার তীব্র পীড়নে, জেলের মাটি থেকে, লুটিয়ে পড়া আহত সাথীদের বুকের মধ্যে থেকে, পাঁচিলের গা বেয়ে আপনিই উঠেছিল এই গান।"[৪৯]

১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাবার পর কমিউনিস্ট পার্টির ভাবনা ও কাজের পার্থক্যের কারণে অনেকেই নবগঠিত সি. পি. আই. (এম) থেকে বেরিয়ে আসছিলেন নকশাল আন্দোলনের পথে। শোভা সেন মনে করেন, "যুক্তফ্রন্টের অক্ষমতা, খেয়োখেয়ি থেকেই নকশালরা এতটা জোরদার হতে পেরেছিল।"[৫০] সি. পি. আই. (এম)-এর বহু নেতা ও কর্মী তখন বেরিয়ে এসেছিলেন পার্টি ছেড়ে। উৎপল দত্তও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। শোভা সেন বলেছেন, "একবার পার্টি বলছে, সি. পি. আই. আমাদের বড় শত্রু, কারণ তারা কংগ্রেসের সঙ্গে রফা করে শোধনবাদী হয়ে গেছে, 'দিনবদলের পালা'য় সেটাই সবচেয়ে বড় করে দেখানো হয়েছিল। অথচ তার কয়েকদিন বাদেই মন্ত্রীসভা গঠিত হল, তাতে দেখা গেল সি. পি. আই. (এম.) ও যুক্তফ্রন্টের শরিক। এটা অনেকেই মেনে নিতে পারেনি।"[৫১] সি. পি. আই. (এম) থেকে বেরিয়ে এসে উৎপল দত্ত গড়ে তুলেছিলেন নকশাল আন্দোলনের ফ্রন্ট, 'সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা'। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা হয়েছে 'তীর' নাটক।—"মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপলের নেতৃত্বে গড়ে উঠল নকশাল আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট, সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা। মিনার্ভা থিয়েটারেরও শুরু হল 'তীর' নাটকের প্রস্তুতি, নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায়। প্রসাদ জোতে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গুলি চালিয়ে দুজন ওরাওঁ কৃষক রমণীকে হত্যা করে। সেই ঘটনা অবলম্বন করেই এই নাটক। যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ নাটকের বক্তব্য। উৎপল হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারেরই শত্রু। ওকে যে সরকার আবার বন্দী করবে এটা বোঝাই যাচ্ছিল।"[৫২]

সেই সময় থেকে যাত্রা জগতেও এল একটা পরিবর্তন। 'নিউ আর্য অপেরা'র পক্ষ থেকে উৎপল দত্তকে নাটক রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নেবার অনুরোধ জানানো হলে তিনি লিখলেন 'রাইফেল'। ১৯৩০-র স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা হল নাটকটি। শোভা সেন বলেছেন, "রাইফেল সেদিন যাত্রা জগতের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল, হয়ে উঠেছিল বছরের হিট পালা।"[৫৩] তাঁর মতে 'প্রযোজনার অভিনবত্ব এবং বিষয়বস্তু বলিষ্ঠতাই ছিল' এই যাত্রায় সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

সেই সময় যাত্রা জগতে মেয়েদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একে একে অনেক মেয়েরাই তখন যাত্রায় আসছে। বীণা দাশগুপ্ত বলেছেন, "আমি বোধহয় যাত্রা করব বলেই জন্মেছিলাম। এক সময় বড় অভাবে এ জগতে এসেছিলাম, তারপর যাত্রা আর এই পেশাকে ভালবেসে ফেললাম। আর যাত্রা-যাত্রা খেলতে-খেলতেই একদিন এই যাত্রাই হয়ে গেল জীবনের খেলাঘর। আর ফিরে যেতে পারিনি।"[৫৪] কিশোরী বীণা জীবনধারণের নিতান্ত প্রয়োজনেই যাত্রায় এসে যোগ দিয়েছিলেন। 'এক টুকরো রুটি' এবং 'মুখের পাঁচালি' পালাতে তাঁর অভিনয়ের শুরু। পরে নট কোম্পানীর 'বেগম আশমান তারা' পালায় চিন্ময়ীর চরিত্রের অভিনয় এনে দেয় পরিচিতি। সাফল্য আসে 'নটী বিনোদিনী'র বিনোদিনী চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ে। এই পালাটি টানা পাঁচ বছর একটানা অভিনীত হয়ে যাত্রা জগতে রেকর্ড সৃষ্টি করে। তাঁর মতে " 'নটী বিনোদিনী' আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র। সাফল্যও আসে। আমি টানা পাঁচ বছর এই পালাটিতে অভিনয় করেছিলাম। বোধহয়, এই ইন্ডাস্ট্রির এ ঘটনাটি একটি রেকর্ড।"[৫৫] ১৯৭৩-এ 'নটী বিনোদিনী' পালায় অভিনয়ের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের কাছে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। যাত্রা শিল্পের তিনিই প্রথম মহিলা পরিচালিকা। পরবর্তীকালে নিজস্ব যাত্রাদল 'গীতাঞ্জলি অপেরা' (১৯৮৬) গড়ে তুলেছিলেন অভিনেত্রী, প্রযোজিকা জ্যোৎস্না দত্ত, 'নিজের মত, সুন্দর করে' কিছু করার জন্য। 'যাত্রা সম্রাজ্ঞী' নামে তাঁকে নিয়ে প্রায় এক ঘন্টার (৫৪ মিনিট) একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন অসিত বসু। দেশবিভাগের পর সাত বছরের মেয়েটি কলকাতায় এসে রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখনই এক যাত্রা কোম্পানীতে নাচের দলে যোগ দেন। সে সময় যাত্রা দলে পুরুষরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। "জ্যোৎস্নাই প্রথম সেই প্রথা ভেঙে নারী চরিত্রে নারীর অভিনয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন।"[৫৬] 'বৈজুবাওরা' থেকেই তিনি পুরোপুরি নির্দেশিকার ভূমিকায় আসেন। প্রথম যখন শিশুশিল্পী রূপে তিনি যাত্রায় আসেন, ১০ পয়সা পেতেন। তাঁর নিজের কথায়, "আমরা ১০ পয়সার জন্য লড়াই করেছি। তখন আমরা শিশুশিল্পীরা যাত্রাদলে ১০ পয়সা পেতাম। সেটাকে বাড়িয়ে ১২ পয়সা করা হয় আমাদের দাবি মেনে।"[৫৭] ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের সাত বছরের মেয়েটি অভাবের তাড়নায় এসেছিলেন যাত্রাদলে। মুক্তকেশী অপেরার সেদিনের সেই শিশুশিল্পী ঐকান্তিক অধ্যবসায় এবং প্রতিভার গুণে হয়ে উঠলেন 'যাত্রা সম্রাজ্ঞী'। যখন যাত্রায় আসেন, অভিনয়ের জন্য এক শহর থেকে আরেক শহরে যাওয়ার সময় বাসে তিনি ট্রাঙ্কের ওপর বসলে তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে বাসের মেঝেয় বসতে বলা হয়। জ্যোৎস্না বলেছেন, "সেদিনই আমি ঠিক করেছিলাম যে ট্রাঙ্কে বসে আমি ছাড়ব।"[৫৮] তাঁর মনে হয়েছিল, "নায়ক বা প্রধান অভিনেতারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পান। মেয়েরাই বা পাবে না কেন?"[৫৯] একদিন সত্যম্বর অপেরায় সেদিনের পালার নায়িকা অনুপস্থিত থাকায় জ্যোৎস্নাকে অভিনয় করতে হয়। সেই শুরু, তারপর ১৯৫৮-র 'সোনাই দীঘি' পালা জ্যোৎস্নার জীবনের পথ বদলে দিল। দশ পয়সা মজুরিতে, দু' পয়সা বাড়ানোর সংগ্রাম থেকে জীবন শুরু করে শিশুশিল্পী জ্যোৎস্না দত্ত হয়ে উঠলেন যাত্রা সম্রাজ্ঞী, প্রযোজিকা, পরিচালিকা, যাত্রা জগতের কিংবদন্তী অভিনেত্রী।

> *"........ওই যে শুনি পুণাতে যেমন ইনস্টিটিউট আছে সিনেমার জন্যে, তেমনি যাত্রার জন্য একটা স্কুল গড়ার স্বপ্ন দেখি আমি।"*
>
> *ভদ্রা বসু, খ্যাতির আড়ালে জ্যোৎস্না দত্ত, "সুকন্যা", ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৫।*

পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মত তিনি যাত্রার জন্য একটি স্কুল তৈরির স্বপ্ন দেখেন। তাঁর কথায়, "যাত্রার সঙ্গে যে গাঁটছড়া বেঁধেছি ভাই, সেই কোন্ কালে, সাত বছর বয়সে এসে ঢুকেছিলাম এই সংসারে—আজ ভাল করে মনে পড়ে না। তখন থেকেই জানি, যাত্রা আমার, আমি যাত্রা—আমার ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের কথা আমি ভাবব না তো কে ভাববে?"[৬০]

১ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সংগ্রহ" (১ম)
২ জয়া মিত্র, 'চলতে চলতে', "সেই দশক", সম্পাদনা—পুলকেশ মণ্ডল, জয়া মিত্র, পৃঃ ১৫০।
৩ পূর্বোক্ত।
৪ মায়া চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩।
৫ জয়া মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৭.৯.৯৮ তারিখে।

৬ উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, ২২.৬.১৯৬৯-র গণশক্তিতে।
৭ কৃষ্ণা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
৮ জয়া মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
৯ চারু মজুমদার।
১০ চারু মজুমদার, গেরিলা অ্যাকশন সম্পর্কে কয়েকটি কথা, দেশব্রতী ১৫ জানুয়ারি ১৯৭০।
১১ শিপ্রা সরকার, 'অস্থিরতা দিন এল', 'সাত দশক', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ জুলাই, ১৯৯৩।
১২ চারু মজুমদার, ছাত্র-যুব আন্দোলন সম্পর্কে, দেশব্রতী, অক্টোবর ১৯৭০।
১৩ জয়া মিত্র, 'চলতে চলতে', পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।
১৪ জয়া মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৭।
১৫ অপরাজিতা গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
১৬ রমা নন্দী/ভবেশ পৈত—'আমাদের সময়, অধুনা জলার্ক, জানুয়ারি-১৯৯৭ মার্চ ১৯৯৭, পৃঃ ৩৮২।
১৭ চারু মজুমদার, ছাত্র যুব আন্দোলন সম্পর্কে, পূর্বোক্ত।
১৮ মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'শেষ রাতের ঘটনা ও অনেক ভালবাসার স্মৃতি', 'স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত, সম্পাদনা—স্বপন দাসাধিকারী, পৃঃ ৫।
১৯ জয়া মিত্রের সাক্ষাৎকার।
২০ কল্পনা সেন, 'পশ্চিমবাঙলায় নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা', 'শারদীয়া বিভাব', ১৯৯১, পৃঃ ১০২।
২১ কৃষ্ণা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
২২ কল্পনা সেন, পূর্বোক্ত।
২৩ জয়া মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২-১৬৩।
২৪ জয়া মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।
২৫ মায়া চট্টোপাধ্যায়, 'সেই দশকের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, 'সেই দশক', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।
২৬ 'দাদা বৌদির চোখে অমিয় চট্টোপাধ্যায়,' জলার্ক, সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা ২, পৃঃ ১৫৮।
২৭ মায়া ভট্টাচার্য, 'প্রতিবেদন' কালান্তর পত্রিকা, ১৪.৮.১৯৭১।
২৮ মায়া চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।
২৯ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।
৩০ মহাশ্বেতা দেবী, 'সত্তর দশক ও তারপরে', অনুষ্টুপ বিশেষ প্রবন্ধ সংখ্যা, 'সত্তর দশক', পৃঃ ২।
৩১ মায়া চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।
৩২ জয়া মিত্র, "হনামান", পৃঃ ৮২।
৩৩ জয়া মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৩।
৩৪ 'তিমির মায়ের চোখে', 'অধুনা জলার্ক', সত্তরের শহীদ লেখক শিল্পী সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭ মার্চ ১৯৯৭, পৃঃ ৩২।
৩৫ প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১—বহরমপুরে জেল হত্যা ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪১।

৩৬ জয়া মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪০।
৩৭ অসীম চ্যাটার্জি, 'সংগ্রামের বিস্তীর্ণ দিগন্ত', জলার্ক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৬-১৭৭।
৩৮ চারু মজুমদার, 'আন্তঃপার্টি সংগ্রাম সম্পর্কে' মার্চ ১৯৭২, লোকযুদ্ধ (পাঞ্জাব) থেকে অমিয় ভট্টাচার্য অনূদিত, চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ১৪৬।
৩৯ চারু মজুমদার, 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ', চারু মজুমদার, রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ১৪০।
৪০ অনিতা মজুমদার, 'বাবাকে যেমন করে পেয়েছি', অধুনা জলার্ক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭-৭৮।
৪১ মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।
৪২ রিক্তা দত্ত, 'বাবুদা', 'স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত', পৃঃ ২০১।
৪৩ দ্রোনাচার্য ঘোষ, দ্রোনাচার্য ঘোষের অপ্রকাশিত দিনলিপি, ১১.৬.৬৮, 'এবং জলার্ক', পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫।
৪৪ মুরারি মুখোপাধ্যায়, জেল থেকে মাকে লেখা চিঠি, জলার্ক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৯।
৪৫ শুভেন্দু দাশগুপ্ত, 'নকশালবাড়ী ঃ নিজের কথা নিজেকেই বলা', সেই দশক, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩৭-৩৮।
৪৬ জয়া মিত্র, 'তোমার গানকে বোমার মত', "যুদ্ধজয়ের গান", সম্পাদনা—স্বপন দাসাধিকারী, পৃঃ ৫১৫।
৪৭ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৬।
৪৮ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৮।
৪৯ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৯।
৫০ শোভা সেন, "স্মরণে বিস্মরণে, নবান্ন থেকে লাল দুর্গ", পৃঃ ৮৮।
৫১ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৮-৮৯।
৫২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৯।
৫৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৪।
৫৪ বীণা দাশগুপ্ত, বীণা দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার, ওভারল্যাণ্ড পত্রিকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।
৫৫ পূর্বোক্ত।
৫৬ 'তথ্যচিত্রে জ্যোৎস্না', বিশেষ প্রতিবেদন, "আনন্দলোক", ২৭ ডিসেম্বর ১৯১৭, পৃঃ ৫৭।
৫৭ জ্যোৎস্না দত্ত, 'পথিকৃৎ', কলকাতার কড়চা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯.১২.১৯৯৭।
৫৮ পূর্বোক্ত।
৫৯ পূর্বোক্ত।
৬০ ভদ্রা বসু, 'খ্যাতির আড়ালে জ্যোৎস্না দত্ত', 'সুকন্যা', ১৬ এপ্রিল, ১৯৮০।

ঘরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৯৭১-র ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। শুরু হয়ে গেল সারা শহর জুড়ে হৈ চৈ—প্রতিবাদী মিছিল, সভা-সমাবেশ। ছাত্রনেতা ও ডাকসুর ডাকে ঢাকা পল্টনের ময়দানে বিকেল তিনটেয় মিটিং হল। পাকিস্তানী ফ্ল্যাগ এবং জিন্নার ছবি পোড়ানোও শুরু হল। শেখ মুজিব ২ মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণ জমায়েত ঘোষণা করলেন। জাহানারা ইমাম বলেছেন, "রাত প্রায় দশটার সময় যখন শুতে যাচ্ছেন, 'অনেক দুর থেকে শ্লোগানের শব্দ আসছে। বোঝা যাচ্ছে এত রাতেও অনেক রাস্তায় লোকেরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে। কেবল জয়বাংলা ছাড়া অন্য শ্লোগানের কথা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু তবু ঐ সম্মিলিত শত কণ্ঠের গর্জন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে এসে পড়ছে শ্রুতির

পান্না কায়সারের কথায়, " '৭১-এর পয়লা মার্চ থেকেই তো ঢাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা। ১লা মার্চ দুপুর একটার দিকে বেতারে এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আহুত ১৩ই মার্চের জাতীয় পরিষদ সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলেন।"

পান্না কায়সার, 'মুক্তি যুদ্ধের আগে এবং পরে', পৃঃ ১১৮।

কিনারে। শিরশির করে উঠছে সারা শরীর। গভীর রাতে আধো ঘুমে আধো জাগরণে মনে হল যেন গুলির শব্দও শুনলাম।"[১]

'৪৭ এর স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদ যেন ক্রমশ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। তারপর '৭১-এর

"৭১-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট পেয়ে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিল। জাতীয় পরিষদ সভা বাতিল ঘোষণায় পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ল।"

পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৮।

নির্বাচনে প্রচুর ভোটে জিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যখন শেখ মুজিবকে ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হয় না, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ যেন ক্ষোভে দুঃখে গলিত লাভার মত ফেটে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয়, অফিস,

রাবেয়া খাতুনের স্মৃতিতে' ...."বিপুল ভোটে জিতেও শেখ মুজিব ক্ষমতায় যেতে পারছেন না। নানা বাহানায় একটার পর একটা বাধার ফলক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে সামনে।

শেখ মুজিবের পর যিনি ভোটজয়ী ছিলেন, সেই জুলফিকার আলী ভুট্টো জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাত দিয়ে কৌশলে নানা চাল দিচ্ছেন। পরিষদে যোগ দিলেন না ভুট্টো। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুলতুবি রইল অধিবেশন। বন্ধ হয়ে গেল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকায় হরতাল। পরে সারা বাংলাদেশে।" রাবেয়া খাতুন, একাত্তরের নয় মাস, পৃঃ ৫।

আদালত। হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ট্রেন, প্লেন প্রভৃতি সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে সামরিক ঝাণ্ডার পক্ষ থেকে কার্ফু জারি। গুজব শোনা যেতে

লাগল পাকিস্তান সরকার দলে দলে সৈন্য এনে জমা করছেন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে। কারফিউ ঘোষণার প্রতিবাদেও মুখর হয়ে উঠল সাধারণ মানুষ। কারফিউ অমান্য করে চলতে থাকে মিটিং মিছিলে তীব্র প্রতিবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলি ও মৃত্যু। ৩ মার্চের সংবাদপত্রে প্রকাশ, "ঢাকার প্রায় সব এলাকাতেই কারফিউ ভঙ্গকারী জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়েছে, বহু লোক মারা গেছে, তার চেয়েও অনেক বেশী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।"[২] এবং তার সঙ্গে আরও একটি খবর রয়েছে যে, ১১০ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে সংবাদপত্র তথা প্রেসের স্বাধিকার খর্ব করা হয়েছে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হওয়া সাধারণ মানুষও দেশের এই দুর্দিনে পাকিস্তানি সরকারের অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। স্বতস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ডাকা প্রতিবাদী সভা এবং মিছিলে। জাহানারা ইমামের কুড়ি বছরের ছেলে, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। সে মিটিং-এ যেতে চাইলে জাহানারা বলেন যে সে তো কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়, তবে কি দরকার মিটিং-এ যাবার। সে তখন বলে, "এখন কি আর ব্যাপারটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে নাকি আম্মা? এখন তো এ আগুন ছড়িয়ে গেছে সবখানে।"[৩] তার কথার মধ্য থেকে সাধারণ দেশবাসীর সচেতনতা, নতুন প্রজন্মের ক্ষোভের ছবিই উঠে এসেছে। এরই চূড়ান্ত পরিণতি, দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়া, মুক্তিবাহিনী গঠন—সামান্য ট্রেনিং নিয়ে, বা না নিয়ে, কখনো কখনো সাধারণ একটা অস্ত্র জোগাড় করে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে। শুধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত পাকিস্তান শাসকের সঙ্গে এই অসম যুদ্ধে। দেশের পরিস্থিতি, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ তেইশ-চব্বিশ বছরের লীগশাহীর চূড়ান্ত অত্যাচার ও নিপীড়নে সাধারণ মানুষ ক্রমশ রাগে ক্ষোভে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছিল। তারা দাবি করেছিল সুস্থ-স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। পান্না কায়সার বলেছেন, "বাঙালিকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় ১লা মার্চের বেতার ভাষণে। গত সাতদিন ধরে জনমনে—আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক তথা দেশের গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। সবাই অধীর আগ্রহে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রতীক্ষায় রয়েছেন।"[৪]

পল্টনের ময়দানে, ৩ মার্চ ১৯৭১, সর্বাত্মক অসহযোগের ডাক দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান। স্থির হয়েছে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিলে বাঙালিরা এক পয়সাও ট্যাক্স দেবে না। সরকারকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবার কথা বলে দেশবাসীকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে অসহযোগ আন্দোলন করে যাবার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। স্বাধীন বাংলায় নতুন পতাকা উত্তোলন করা হল। প্রতিদিনই চলতে থাকে কারফিউ লঙ্ঘন করে মিছিল-সমাবেশ এবং পুলিশের গুলি। ছাত্ররা বড় বড় রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড তৈরি করছে। জরুরী কাজকর্ম চালানোর জন্য সরকারী, বেসরকারী সমস্ত অফিস, ব্যাংক আড়াইটে থেকে চারটে পর্যন্ত খুলে রাখার কথা হল মুজিবের নির্দেশে। জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে, "হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ী, সংবাদপত্র ও তাদের গাড়ী, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, দমকল, মেথর ও আবর্জনা ফেলা ট্রাক—এগুলিকে হরতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া শুরু হয়েছে।"[৫]

ইয়াহিয়ার ভাষণের পরদিন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক জনসভা। মুশতারী শফী বলেছেন, এরকম বিরাট জনসমাবেশ 'তৎকালীন' পাকিস্তানের ইতিহাসে নাকি আর কখনো হয়নি। সেই জনসভাতেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠের সেই আহ্বানে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি যেন এক নতুন প্রেরণায়, নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে নিয়ে জেগে উঠল। 'বঙ্গবন্ধু'র আহ্বানে সাড়া দিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। কারাগার ভেঙে বেরিয়ে এল বন্দীরা, পুলিশ তাদের গতিরোধ করার জন্য গুলি চালাল। কয়েকজনের মৃত্যু হল। এই আগুনের হল্‌কা ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে। অফিস,

৭ মার্চের সভার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রয়েছে পান্না কায়সারের লেখায়,—৭ই মার্চে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শোনার জন্য ঢাকা শহর ভেঙে পড়ল। হাজার হাজার ভিড় জমতে থাকল দুপুর থেকে। জনতার হাতে লাঠি, বল্লম, লোহার রড।......এক অপূর্ব দৃশ্য। আজও আমার চোখে ভাসে। উত্তাল জনসমুদ্র। আমরা কাছে ভিড়তে পারলাম না। অনেক দূরে গাড়িতে বসেই ভাষণ শুনলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কণ্ঠ দিয়ে সেদিন আগুন ঝরল। অগ্নিকণ্ঠে দৃপ্ত প্রত্যয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিলেন—রক্ত মাড়িয়ে তিনি জাতীয় পরিষদে যাবেন না, সেনাবাহিনীর চণ্ড নীতির বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ ও নিন্দা জানালেন। সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য তিনি দৃঢ় কণ্ঠে আহ্বান করলেন। পানি খাবার দেওয়া বন্ধ ঘোষণা করলেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে প্রস্তুত থাকার জন্য বললেন। জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার জন্য জোর দাবি জানালেন। অবিরাম করতালির মধ্যে ভেসে আসছে প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। মুক্তিপাগল জনতা লাঠিতে আঘাত করে ঝনঝনিয়ে তাদের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করে যাচ্ছে।

তিনি ঘোষণা দিলেন কর না দেবার জন্য। সরকারি আধা-সরকারি অফিসে, হাইকোর্টে হরতাল চলবে। সকল পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে হবে। দৃঢ় ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ 'এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পান্না কায়সার, 'মুক্তি যুদ্ধ আগে ও পরে', পৃঃ ১২০।

আদালত, স্কুল, কলেজ, সবই বন্ধ হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর ডাকে। চারিদিকে সকলেই যেন ভীষণ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। জাতির হৃদয়ে জন্ম নিল এক 'কঠিন প্রত্যয়'। জাতীয় স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তারা। অনুপ্রাণিত করল শেখ মুজিবের ভাষণ, তার অনুভূতিময় বক্তব্য। স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেমে পড়ল সারা দেশের মানুষ। থেমে নেই মেয়েরা, তারাও এগিয়ে এসেছে। মুশতারী শফী বলেছেন, 'এমনি সময় আমাদের এই বিশাল নারী সমাবেশ স্বভাবতঃই আলোড়ন সৃষ্টি করলো। সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন হান্নান বেগম, সীমা সেন, দিল আফরোজ, তরুণ মণ্ডল, জাহানারা আংগুর, আরতি দত্ত, রাণী রক্ষিত, নুরুন্নাহার জহুর, রমা দত্ত ও সত্তরোর্ধ্ব মহিলা কুন্দপ্রভা সেন বলেছিলেন, 'আমি ব্রিটিশ হটাও আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছি, জেল খেটেছি, কিন্তু আজকের আন্দোলন বাংলাদেশের সমগ্র ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। আজকের এই সমাবেশে দাঁড়িয়ে দু হাত তুলে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, আমি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই,

'আমি দেখে যেতে চাই বাংলার স্বাধীনতা। দেহে রক্ত ফুটছে টগবগ করে, তবু সজল হলো সবার চোখ। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। শুকিয়ে গেল আগুনে সেই চোখের জল। মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে ধ্বনি উঠলো আকাশ বিদীর্ণ করে, 'আমরা প্রীতিলতার উত্তরসূরী। স্বাধীনতা আমরা আনবোই।' আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম, 'প্রিয় মা ও বোনেরা, ভাষা, ধর্ম, দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মহিলাদের আজকের এই সমাবেশ একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। আমরা মনে করি দেশের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে আমাদের মেয়েদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। আমরা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক। নির্বাচনে আমরাও ভোট দিয়েছি। প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছেন আমাদেরই ভোটে। তাই আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদ বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাল বাহানা করে তাঁদেরকে যে অপমান করা হলো, এটা আমাদের অপমান—সমগ্র জনমতের অপমান, আমরা তা কিছুতেই সইবো না। জনমতকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে গোড়াতে আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করে। জনমতের ওপর একজন ব্যক্তিত্ব—তা তিনি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন বা সম্রাট হন, তার ব্যক্তিগত প্রভাব গণতন্ত্রের খেলাপ। পরিষদ বৈঠক স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে আজ যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, এটা কোনো দলের একার আন্দোলন নয়, এটা জনগণের আন্দোলন। সে আন্দোলনে আজ দেশের নারী সমাজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়েছে। আমাদের ছেলেরা, আমাদের ভাইয়েরা স্বৈরশাসক পাকিস্তানীদের কেড়ে নেওয়া অধিকারকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য জীবন উৎসর্গ করছে সেই বাহান্ন সাল থেকে আজ অবধি। তবু সম্পূর্ণ অধিকার আমরা আদায় করতে পারিনি কিন্তু এবার পারবো। সংগ্রামী মা ও বোনেরা, আসুন আজ আমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলি। এবং ঘর ছেড়ে এসে দাঁড়াই যুদ্ধরত আমাদের স্বামী সন্তান ভাইদের পাশে—ইত্যাদি ইত্যাদি।......"[৬] ১১ মার্চ চট্টগ্রাম জে.এন. সেন হল প্রাঙ্গণে মহিলা পরিষদ ও বান্ধবী সংঘের যৌথ উদ্যোগে এক বিরাট সভা হয়। মেয়েরাই সারা শহরে রিক্‌সা নিয়ে মাইক লাগিয়ে সভার ঘোষণা করে। বান্ধবী প্রেসে ছাপা লিফলেট, ফেস্টুন এবং পোস্টার ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। সভানেত্রী ছিলেন উমরাতুল ফজল। প্রধান অতিথি সুফিয়া কামাল। চট্টগ্রাম শহরের কাছাকাছি শহরতলী এবং গ্রাম থেকেও মহিলারা লোকাল ট্রেন আর বাস ভর্তি করে এসেছিল। "রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানসীন মহিলারা—যারা পথে বের হয়নি কোনদিন তারাও সেদিনের সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন।"[৭] হলের সামনের রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুশতারী শফী মনে করেন, ৭ মার্চে ঢাকায় মুজিবের জনসভা এবং স্বাধীনতার আহ্বানই মানুষকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে হাজার মহিলা মিছিল করে এগিয়ে গেলেন সভার পর। মুশতারী শফী, তাঁর স্বামী ডঃ শফীর অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহেই এগিয়ে এসেছিলেন গণসংগঠনের কাছে। '৬৯ সালে ছাত্রনেতা আসাদ যখন পুলিশের গুলিতে মারা যায়, প্রতিবাদে গর্জন করে উঠেছিল সমগ্র চট্টগ্রাম। সারা দেশে তখন মুজিবের ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফার সম্মিলিত দাবীর আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ডাঃ শফী স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'এইবার তোমাদেরও পথে নামতে হবে।'[৮] তাঁর মনে হয়েছিল ছাত্রদের ১১ দফার মধ্যেই ছিল প্রকৃত মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা। দেশের মেয়েদেরও উচিত

সংগঠিত হয়ে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলা। মুশতারী বলেছিলেন, তিনি রাজনীতি কখনো করেননি, রাজনীতিতে তিনি নেই। ডাঃ শফী বলেন, এটা রাজনীতি নয়, দেশের কাজ, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

দুদিন পর, ১৩ মার্চে মহিলা পরিষদ ও মহিলা আওয়ামী লীগের মিলিত প্রয়াসে মুসলিম হলে বিরাট এক মহিলা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এই সভায় এত বেশি জনসমাগম হয় যে, মুসলিম হল ছাড়িয়ে শহীদ মিনার পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। সভার শেষে মেয়েদের এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। বেগম মুশতারী শফী ছিলেন সেই মিছিলের পুরোভাগে—"সহস্র নারী কণ্ঠের শ্লোগানে চট্টলার আকাশমুখর। 'জয় বাংলা, মা বোনেরা অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে স্টেশন রোড ঘুরে এনায়েত বাজারের ওপর দিয়ে মিছিল মুসলিম হলে গিয়ে শেষ হলো।"[৯]

দেশের সর্বস্তরের মানুষই সচেতন হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা। দেশের সেই পরিস্থিতিতে ৬ মার্চ বাংলা একাডেমীতে শিল্পী সাহিত্যিকদের এক জরুরী সভা ডাকা হয়। তারপর ১৪ মার্চ লেখক সংগ্রাম শিবিরের দ্বিতীয় বৈঠকে, ১৬ মার্চ লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেদিন শহীদমিনারে জমায়েত হয়ে বিরাট মিছিল করে তারা গেলেন পুরনো ঢাকা বাহাদুর শাহ পার্কে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও তারাই ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে। পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিরাট ব্যানার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল মিছিল। ব্যানারে একদিকের দণ্ড ছিল লায়লা সামাদের হাতে, অন্য দিকে কাজী রোজী ও রাবেয়া খাতুন। মাঝখানে 'অস্ত্রের ভাষা অস্ত্রে চলবে। এসো সশস্ত্র অস্ত্রের পথ ধরি' লেখা ফেস্টুন হাতে কবি সুফিয়া কামাল, তার পাশে কবি মেহরুন্নেসা, সুফিয়া খাতুন এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পীরা। মিছিল চলতে শুরু করলে পথে বাংলা একাডেমী প্রেস ক্লাব থেকে আরও শিল্পীরা এসে যোগ দিয়ে মিছিলের দৈর্ঘ্য ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। কথাশিল্পী রাবেয়া খাতুনের লেখায় এই সমাবেশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।—"ষোল তারিখ বিকেল থেকে পরিকল্পিত ছকে শহীদ মিনারে এসে জমায়েত হচ্ছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা। দু'তিন সারিতে দাঁড়ালেও দেখা গেল রীতি মতো দীর্ঘ লাইন। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট তিন দশকের সংস্কৃতসেবীদের এক মহা-মিলন প্রবাহ যেন।

মহিলাদের সংখ্যা কম হলেও মিছিলের মুখ তাদের দিয়েই। পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংগ্রাম শিবিরের বিরাট ব্যানারের একদিকের দণ্ড ধরে লায়লা সামাদ। অন্যদিকে কাজী রোজী এবং আমি। মাঝে ফেস্টুন হাতে কবি সুফিয়া কামাল। ফেস্টুনে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—

অস্ত্রের ভাষা অস্ত্রে চলবে
এসো সশস্ত্র অস্ত্রের পথ ধরি.......।

সুফিয়া কামালের দু'পাশে শহীদ কবি মেহেরুন্নেসা, নতুন লেখক সুফিয়া খাতুন, আরও কতিপয় কবি, কথাশিল্পী এবং কয়েকজন সঙ্গীতশিল্পী।

আকাশ কাঁপানো শ্লোগান নানা ধরনের। আমাদের কাছাকাছি এক যুবক। ছোটখাটো, রোগাটে প্রথম ধ্বনি সে-ই তুলেছিলো। অবিশ্বাস্য গমগমে গলার আওয়াজ হুমায়ুন কবীরের—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস কর, এক কর তুলি কলম কাস্তে কোদাল।

বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত মিছিলের সারা শরীর নড়ে উঠে চলতে শুরু করলো। জোকারে চাপা পড়ে গেলো রাজপথের যাবতীয় শব্দ। সকালের রোদে তেজী ঝিলিকের মতো চমকাতে লাগলো শ্লোগানের শাণিত চেহারা—

ভিয়েতনামের পথ ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
ইয়াহিয়ার মুখে লাথি মারো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো..........
দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেবো রক্ত, এবার নেবো রক্ত...........

চলতি পথে বাংলা একাডেমী, প্রেস ক্লাব থেকে আরও শিল্পী যোগ দিলেন। গন্তব্য পুরোন ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক।"[১০]

এই সমাবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাবেয়ার মনে হয়েছে ঢাকার মানুষ উনসত্তরের শেষ থেকে গোটা সত্তর দশক জুড়ে নানা ধরনের মিছিল দেখেছে, তবে শিল্পীদের এই পথসমাবেশ সম্ভবত তারা সেই প্রথম দেখেছিল।

"রাস্তার দুধারে লোক জমে যাচ্ছিলো। উনসত্তরের শেষ, সত্তরের শুরু থেকে, একাত্তরে এসে মশাল, সাইকেল, ট্রাক, রকমারি মিছিলের তপ্তধ্বনির সঙ্গে তারা পরিচিত হচ্ছে। সর্বশ্রেণীর শিল্পীর পথসমাবেশ সম্ভবত সেই তারা প্রথম দেখলো। কেউ কেউ চেঁচিয়ে বলছিলো আমরাও আসবো।" *রাবেয়া খাতুন, একাত্তরের নয় মাস, পৃঃ ৬।*

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানি শাসকের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, সাধারণ মানুষ এবং বুদ্ধিজীবী বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হয়ে উঠেছিল পূর্ববাংলায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। ৭ মার্চ মুজিবের জনসভার ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। দেশবাসী এটাকেই প্রায় প্রকাশ্য স্বাধীনতার ঘোষণা বলে মনে করে। বাবর ও সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে শ্রমিকরা। ক্যান্টনমেন্টে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের ফলে ঢাকায় মিলিটারীর অত্যাচারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দা, ছুরি, লোহার রড প্রভৃতি যে যা পায় নিয়ে পথে বেড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ। লুঠ হল রেলের অস্ত্রাগার। মুশতারী শফীর বাড়ির অল্পবয়সী ছেলেরাও বেরিয়ে গেল যদি দু-একটা বন্দুক পাওয়া যায়। তখন মুশতারীর বাড়িতে ছিলেন চট্টগ্রাম রেডিওর নিজস্ব 'স্ক্রিপ্ট রাইটার' বেলাল চৌধুরী। দেশের পরিস্থিতির কারণে তিনি স্ত্রী পুত্রকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শফী পরিবারে। তিনি হঠাৎ মুশতারী শফীকে প্রশ্ন করেন তাঁরা তো সবাই স্বাধীনতার সপক্ষে তাহলে যারা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে না তারা কি করবে? কিভাবে তাঁরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নেবে? অথচ বেলাল চৌধুরী মনে করেন যে সকলেরই কিছু না কিছু করা উচিত।

তখন তিনি নিজেই বলেন, তাঁরা তো চট্টগ্রাম রেডিওকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নাম দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার চালাতে পারেন, কেননা তখন তো ঢাকা রেডিও বন্ধ। এই কথা শুনে আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন বেলালের 'মুশতারী ভাবী' "চমৎকার আইডিয়া। কিন্তু আমাকেও নিতে হবে।"[১১] ডাঃ শফী এই পরিকল্পনা শুনে উৎসাহিত করলেন বেলাল চৌধুরীকে এবং সেদিনই ২৬ মার্চ ১৯৭১, প্রতিষ্ঠিত হল স্বাধীন বাংলা বেতার। মুশতারী শফী বাড়িতে বসেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা লগ্ন থেকে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ২৭ মার্চের কথায়, "গত রাতে বেলাল ভাইরা কালুরঘাট থেকে ফিরে আসার আগেই আমি আর এহসান আকাশবাণী কলকাতার খবর, বিবিসি-র সংবাদ, এবং সংবাদ পর্যালোচনা, ভয়েস অব আমেরিকা—শুনে শুনে সাদা কাগজে টুকে রেখেছিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর সেই সব খবরের ভিত্তিতে তৈরী করা হলো আগামী দিনের অর্থাৎ আজকের প্রচার মেটেরিয়্যালস্। মোমের আলো জ্বেলে অনেক রাত অবধি স্বাধীন বাংলা বেতারের মেটেরিয়ালস্ লিখে তৈরী করেছিল কাশেম, ফারুক আর এহসান। আজ সকাল ৭টায় সবাই তৈরি কালুরঘাট যাবার জন্যে। আজ আমিও যেতে চাইলাম। বেলাল ভাই বললো, 'না। আপাততঃ নারী কণ্ঠে কিছু প্রচার করা হবে না, তাছাড়া ঘরে বসে যে কাজ তুমি আর এহসান করেছো, এটিও বেতারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা ঘরে এসেই তৈরী সংবাদ পাব। আগামী দিনের জন্য আমাদের ভাবতে হবে না কি সংবাদ প্রচার করবো।"[১২]

পরবর্তীকালে মুশতারী ভারতে চলে আসার পর বেতারকেন্দ্রও কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। তখন কলকাতার জীবনে ঐ বেতার কেন্দ্রই হয়ে উঠেছিল মুশত্বারী বেগমের জীবিকাক্ষেত্র। বেতারে তিনি স্বরচিত কথিকা পাঠ করতেন, নাটকে অংশ নিতেন, আবৃত্তি করতেন। এইভাবেই যা সামান্য উপার্জন হত তাতেই চলত তাঁর সন্তানদের প্রতিপালন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দীর্ঘ ২৫ বছরের বঞ্চনা, ক্ষোভ, শোষণের মূর্ত প্রকাশ মানুষের এই স্বতস্ফূর্ত জাগরণ। সত্তরের পূর্ব পাকিস্তান, বিশ শতকের প্রথম দিকের অবিভক্ত বাংলার উত্তাল তরঙ্গের কথাই যেন মনে পড়িয়ে দেয়। এই বিক্ষোভ-প্রতিরোধ, দেশের মুক্তি আন্দোলন, সেই উত্তাল সময়, বদলে দিয়েছে মানুষের জীবন-ভাবনা, জীবন-দর্শন। বদলে গেছে শিশুদের খেলার ধরন, পথের ধুলোয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তখন মিছিল মিছিল খেলে, 'ঠা ঠা শব্দে গুলি ছোঁড়ে'। মুশতারী শফী বলেছেন, "শিশুদের খেলার সাবজেক্ট পাল্টে গেছে............হাডুডু বা বল নয়, গাছের ছোট ছোট ডাল ভেঙ্গে স্টেনগান, মেশিন গান, বন্দুক বানিয়ে দু'দলে ভাগ হয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। একদল পাকিস্তানী সৈন্য, অন্যদল মুক্তিবাহিনী। মুখে ঠিশ্-শা, ঠিশ্-শা, গুড়ুম গুড়ুম শব্দ করে গুলি ছুঁড়ছে। আমি কৌতূহলী হয়ে ওদের খেলা দেখতে লাগলাম। পাকিস্তান হেরে গেছে, ওদের সৈন্য মরছে আর মুক্তিবাহিনীর দল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে—জয় বাংলা।"[১৩]

এরই মধ্যে মুজিব ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক শুরু হলো মার্চের মাঝামাঝি থেকে। যখন চারিদিকে মিলিটারির অত্যাচারে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের আলোচনায় রাজি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা

দেয়। অনেকেরই মনে হয় যে, মুজিব এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে ঠিক করেননি। কারণ কারুর মতে, এ শুধু পাকিস্তানি শাসকের সময় নেবার কৌশল। এইভাবে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আনিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার সময় নিচ্ছে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা

বেশ কিছুদিন থেকে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে, প্রতিদিন নাকি প্লেনে করে সাদা পোশাকে প্রচুর সৈন্য এসে নামছে বিমান বন্দরে। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা, তবু বুক কেঁপে ওঠে। ওদিকে চট্টগ্রাম থেকে দু-তিনজন বন্ধুর টেলিফোনে জানা গেছে—চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে ভিড়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। সে অস্ত্র চট্টগ্রামের বীর বাঙালিরা খালাস করতে দেবে না বলে মরণপণ করে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। ওদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য আর্মি ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের ওপর।" জাহানারা ইমাম 'একাত্তরের দিনগুলি' পৃঃ ৪৭।

সমাধানের আশ্বাসে। শেখ মুজিব প্রতিদিন আলোচনা করতে প্রেসিডেন্ট ভবনে যাচ্ছেন আর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'আলোচনা এগোচ্ছে'। আবার সাধারণ মানুষকে বলছেন দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। এই দোলাচলতার কারণে সাধারণ মানুষ অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমশ। জাহানারা ইমাম বলেছেন, "রুমীর মুখে দুদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় চুল খামচে ধরে রুমী বলল, আম্মা বুঝতে পারছ না মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটা ওদের সময় নেবার অজুহাত মাত্র। ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না স্বাধীনতা আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রাম করে।........সাদা গাড়ীতে কালো পতাকা উড়িয়ে শেখ রোজ প্রেসিডেন্ট হাউসে যাচ্ছেন আর আসছেন, আলোচনার কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। ওদিকে প্লেনে করে রোজ সাদা পোশাকে হাজার হাজার সৈন্য এসে নামছে, চট্টগ্রামে অস্ত্র ভর্তি জাহাজ ভিড়ছে।"[১৪] সেই পরিস্থিতিতে শহীদুল্লাহ কায়সারের মানসিক প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে পান্না কায়সার বলেছেন, "শহীদুল্লাহ্ একটার পর একটা ফোন করে যাচ্ছে—'স্বাধীনতা ঘোষণা করার এখনই মোক্ষম সময়। আজকের এ পরিস্থিতিতে যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করা না হয় তবে আমরা বিরাট ভুল করব।"[১৫] এটি পয়লা মার্চের কথা। ৩ মার্চের মুজিবের জনসভার পর বাড়িতে এলে পান্না কায়সার যখন জানতে চান যে স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছে কিনা, শহীদুল্লাহ বলেন "না-বুঝি না স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে ওদের এত দোদুল্যমান তা কেন। বিরাট ভুল করছি। দেশ এক সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"[১৬] ২৫ মার্চ রাতে চিন্তিত, বিভ্রান্ত ও রক্তাক্ত শহীদুল্লার মন্তব্য—

"সারা দেশে গণহত্যা শুরু হয়েছে। এটা ঠেকাতে পারল না আমাদের নেতারা। চারদিকে গুলির শব্দ শুনতে পাওনি?........দেশে এবার রক্তের স্রোত বইবে। ইয়াহিয়া কাউকেই বাঁচতে দেবে না। সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম মুজিবের বাড়িতে। প্রচুর লোকের সমাগম ছিল যে বাড়িতে, সে বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেছে। নেতারা টের পেয়েছে কিছু একটা হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর আসছে। শেখ মুজিবর রহমান এখনও কোন নির্দেশ দিচ্ছেন না। অসহযোগ আন্দোলনে এ সমস্যার সমাধান হবে না—আমি আগেই বলেছি। একটা সুনির্দিষ্ট নির্দেশের জন্য দেশের লোক অপেক্ষা করছে, আর আজও নির্দেশ নেই। দেশের লোক আজ মৃত্যুর মুখোমুখি।"[১৭]

সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছিল। এর মধ্যে এই একমাসে মিলিটারী ঢাকা শহরের অগণিত মানুষকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকদের, বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ করে ছাত্রদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের হত্যা করে গণ-কবর দিয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনার ভেঙেছে, ভেঙেছে রমনার কালীবাড়ি। বাঙালির রক্তের স্রোত বয়েছে বাংলাদেশের বুকে। ২৫ শে মার্চের কালো রাতের বর্ণনা রয়েছে বাসন্তী গুহঠাকুরতার লেখায়। সেদিন প্রথমে ছাত্রদের হত্যা করে তারপর

কার্ফিউয়ের অন্ধকার রাতে শহীদমিনার ভাঙার বর্ণনা পাই। বাসন্তী গুহঠাকুরতার স্মৃতিতে — "২৮ শে মার্চ অনেক রাতের দিকে বাসন্তী গুহঠাকুরতা চারিদিকে গোলাগুলির ভীষণ শব্দে চমক উঠলেন, মনে হল হাসপাতাল বিল্ডিংটা যেন কেঁপে উঠল। শব্দটা যেন 'মেডিক্যালের' চারিদিক ঘিরেই হচ্ছিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলেন—'দানবরা শহীদমিনার ভাঙছে। কার্ফিউ দিয়ে এসব নারকীয় কাজ করতে খুব মজা। পেট্রোল পাম্পের কোণা থেকে একটা জীপ মিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর পেছন দিকে ব্যাক্ করছে। একটু পরেই মিনারের চত্বর আলোকিত হয়ে বিকট শব্দ। তারপর আবার ওরা এগিয়ে যায়, পিছিয়ে আসে, তারপর আলোর রোশনাই আর বিকট শব্দ। এমনি খেলা চললো ঘণ্টা দুই। ওরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র না পেয়ে শহীদ মিনার ভেঙেই আক্রোশ মেটাচ্ছে। এক সময় ওরা থামলো। হয় ওদের রসদ ফুরিয়ে গেছে, নয়তো আক্রোশ মিটিছে।"
বাসন্তী গুহঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, পৃঃ ১৭।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কোয়ার্টার্সে তারা এসে হামলা করে। ডাঃ মনিরুজ্জামান এবং জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে হত্যা করে। ২৫ মার্চ রাতে

"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভীষণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসলাম। রুমী জামী ছুটে এল এ ঘরে। কি ব্যাপার? দু'তিন রকমের শব্দ—ভারী বোমার বুমবুম আওয়াজ, মেশিন গানের ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ, টি-ই-ই-ই করে আরেকটা শব্দ। আকাশে কি যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে মাঠ পেরিয়ে ইকবাল হল, মোহসীন হল, আরো কয়েকটা হল, ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্সের কয়েকটা বিল্ডিং। বেশীর ভাগ আওয়াজ সেইদিক থেকে আসছে, সেই সঙ্গে বহু কণ্ঠের আর্তনাদ, চীৎকার।" বেশীক্ষণ ছাদে দাঁড়ানো গেল না।"
জাহানারা ইমাম, একাত্তরের দিনগুলি, পৃঃ ৪৯।

মিলিটারি গুলি করে ফেলে যায় জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে। তারপরও কয়েকদিন তিনি বেঁচেছিলেন। ৩০ মার্চ সকালে ঢাকা জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ স্বামীকে বাইরে বাগান থেকে ঘরে নিয়ে আসার পর যখন বাসন্তী গুহঠাকুরতা জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন—"দূরে অদূরে বৃষ্টির মত গুলি চলছেই। বোধহয় হলের থেকেই গুলি খেয়ে দৌড়ে 'মাগো' বলে একটি ছেলে শার্ট-প্যান্ট পরা দুমড়ে পড়ে গেল, আর উঠলো না। আমি তখন হলের ভেতর দেখার জন্য আরেক জানালায় উঁকি দিলাম। দেখলাম আগুন। মনে হলো শামসুননাহার হলে। নিশ্চিত হতে পারছি না আগুনটা কোথায় জ্বলছে, চোখে ঝাপসা দেখছি। আমার চোখে চশমা, তারপর জালের নেট, তারপর কাচের জানালা বাইরে ধোঁয়ায় কুয়াশা,—এসব মিলে আগুনের অবস্থানটা বুঝতে পারছি নে। তখন দোলার ঘরে

গিয়ে তেমনিভাবে জানালায় চোখ ঠেকিয়ে দেখলাম, থরে থরে আগুনের লাইন। হঠাৎ আমাদের দিকে ও জগন্নাথ হলটা অন্ধকার হয়ে গেল, মানে কামানের গুলিতে জীবন্ত বিজলী তার কেটে গেল। তখন দেখতে পেলাম আগুন আমার ৫০/৬০ হাত দূরেই। ছাত্রদের হল জ্বলছে। হলের কেন্টিন এল প্যাটার্নের। এই হলটি পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম অ্যাসেম্বলীর অফিসের দপ্তর ছিল। গেটে দেখলাম একটা সৈন্য রাইফেল হাতে হেলান দিয়ে আছে অর্জুন গাছের তলায় দেয়াল ঘেঁষে। নড়ে চড়ে না। এখন বুঝলাম বৈদ্যুতিক তার লেগেছে ওর গায়ে। ভোরের আলো ফোটার আগেই একটি কাক মোড়ের মাথায় মৃত ছেলেটির পিঠে বসে রক্ত পান করছিল। ....স্বাধীনতার প্রথম সূর্যের লালচে আগুনি আলোর রশ্মি পড়লো গাছের চূড়ায়, শহীদ মিনারে জগন্নাথ হলের মৃত লাশের উপরে, চৌরাস্তার মোড়ে—সে 'মাগো' বলে উপুড় হয়ে পড়া ছেলেটির পিঠে।"[১৮] জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে সকলেই বলেছিল, সেখান থেকে চলে যেতে কিছুদিনের জন্য অন্তত, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হননি। তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি হলের প্রভোস্ট। ছাত্রদের জন্যই তিনি সেখানে আছেন, সেই ছাত্রদের ফেলে তিনি কি করে যান। ওদের জন্যই তো তাঁর কোয়ার্টার, তাঁর ফোন। সেই ছাত্র প্রীতি ও কর্তব্যবোধের মূল্য তিনি দিলেন জীবন দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা তো চেয়েছিলেন একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার থাকবে। মানুষ মানুষের অধিকার নিয়ে, মানুষের মত বাঁচতে পারবে। তাই প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিলেন তাঁরা। '৭১-এর নয় মাসে পাকিস্তানি সৈন্যরা অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ডাক্তারকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারা চেয়েছিল বাঙালির সমস্ত সম্পদ নষ্ট করে দিতে, ধ্বংস করে দিতে। তাঁরাই করেছিলেন ভাষার জন্যে আন্দোলন, সংগ্রাম, জীবনপণ, আবার '৬০-এর দশকের শেষ থেকে তাঁরাই মানুষের মত বাঁচার অধিকার দাবি করেছিলেন, তাই সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছেন তাঁরাই। ২৫ মার্চের রাতে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল তারা নির্বিচারে। সে রাতে যে সমস্ত ছাত্র ও অধ্যাপককে তারা গুলি করে হত্যা করেছিল, তাদের গণকবর দিয়েছিল। পান্না কায়সারের লেখায় তার ভয়ঙ্কর জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। সমস্ত হত্যাই হয়েছিল কার্ফিউর মধ্যে। ২৭ মার্চ বেলা দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত কার্ফিউ তুলে নিলে

বাসন্তী গুহঠাকুরতাও বলেছেন, গণকবরের কথা,................"শহীদ ডাঃ জি. সি. দেবের বাড়ির কাছে গাড়িটা আসতেই আমি বাঁয়ে ফিরে জগন্নাথ হলের প্রাণী শূন্য মাঠে 'গণকবর'টা দেখে নিলাম। চিনতে কোন অসুবিধে হল না। সেদিন ২৬শে মার্চ, সারাদিনই কবর খোঁড়ার শব্দ আসছিল, এ কোণ থেকেই। ঠিক সে জায়গাটায় সবুজ ঘাস নেই, মাটিটা একটু উঁচু হলেও সমান। ওরা তো বুলডোজার চালিয়ে কবর ঢেকে দিয়েছে। কারোর বাবারও সাধ্য নেই যে আপন জনের লাশ তুলে নেবে।" বাসন্তী গুহঠাকুরতা, একাত্তরের স্মৃতি, পৃঃ ২৫।

শহীদুল্লা কায়সার শহরের অবস্থা ও বন্ধুবান্ধবদের খবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন। পান্না কায়সারও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন বাধ্য হয়ে, একা বিপদের মধ্যে স্বামীকে ছেড়ে দেবেন না বলে। তাঁদের গাড়ীটা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জগন্নাথ হলের একটু দূরে গিয়ে থামল। তাঁর

কথায়,—'আমাদের গাড়ি গিয়ে থামল জগন্নাথ হলের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি একটা চিৎকার দিয়ে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম। হাঁটু দুটো কাঁপছে। গলা দিয়ে কোন স্বর বের হচ্ছিল না। অনেক লাশ পড়ে আছে। ইতিমধ্যে লোকজন এসে মাটি খুঁড়ে কিছু কিছু মাটি চাপা দিয়েছে। মাটি চাপা দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ চাপা না পড়ে অনেকের শরীরের অংশ বা হাত-পা বেরিয়ে আছে। কলকল করে রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছিল রক্তের সরোবর। আমি আর এগুতে পারলাম না।'[১৯]

পাকিস্তানী সৈন্যের চূড়ান্ত পাশবিকতায় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি এত অসহায় হয়ে পড়েছিল যে, বাসন্তী গুহঠাকুরতা স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত দেহটিকে হাসপাতালে ফেলে রেখে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বামীর মৃতদেহের সৎকারের অধিকারও তাঁকে দেওয়া হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সেই মৃতদেহের যে কি পরিণতি হয়েছিল তা'ও তিনি জীবনে কখনো জানতে পারেননি। তখন তাঁকে 'Death Certificate' ও দেওয়া হয়নি। অনেক পরে যে 'certificate' দেওয়া হয়েছিল, তাতেও মৃত্যুর মিথ্যে কারণ লিখে দেওয়া হয়েছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে স্নায়ুমণ্ডলী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের মৃত্যুর উল্লেখ কোথাও ছিল না। মৃত্যুর পর নিজের এবং মেয়ের নিরাপত্তার কারণে বেশীক্ষণ তাঁকে সেখানে অপেক্ষা করতেও দেয়নি ডাক্তাররা এবং অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুজনরা। তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল তাদের অনিশ্চিত অজ্ঞাতবাস। নিরাপত্তার কারণে কোন একটা জায়গায় এক মাসের বেশি তাঁরা থাকতে পারেননি। নিজেদের সাজানো সংসার, সমস্ত জিনিসপত্র এবং সবচেয়ে মূল্যবান ও সখের বহুদিন ধরে কেনা বইগুলোকেও কিভাবে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। কখনো কখনো চেনা মানুষও তাদের চিনতে পারেনি নিজেদের বিপদের ভাবনায়। বেশি দিন কেউ তাঁদেরকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেননি, নিজেদের নিরাপত্তা হারানোর ভাবনায়। এইভাবে পূর্বপাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত চলেছিল তাদের অনিশ্চিত নিরাপত্তাহীন পরবাস। কি কারণে এই মূল্য তাদের দিতে হয়েছিল? 'মানবতাবাদী' 'ছাত্রদরদী' জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ছাত্রদের থেকে দূরে যেতে চাননি, ছাত্রদের বাদ দিয়ে নিজের সুবিধার কথা ভাবেননি বলে। এইভাবেই স্বামীকে হারিয়ে ছিলেন পান্না কায়সার। কোনভাবেই তিনি শহীদুল্লাহ্ কায়সারকে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে পারেননি। যখনই কথা হয়েছে, শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, দেশের মানুষকে ফেলে নিজের জীবন বাঁচাতে কখনও তিনি দেশ ছেড়ে যাবেন না। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাকে কখনও তিনি বেশি মূল্য দিতেন না। নিরাপত্তার কারণে মা বা স্ত্রীর কথায় বাধ্য হয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বা বার বার জায়গা বদল করেছেন তবুও তিনি দেশ ছেড়ে যাননি। নিজের জীবনের ভয় কখনো তিনি পাননি। দেশের ঐ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করেছেন। এমনকি, নিজের সুখ-স্বাচ্ছ দ্য বিসর্জন দিয়ে তিনি অন্যান্যদের রক্ষা করেছেন। পান্না কায়সারের কথায় এই সময়ের ছবি পাওয়া যায়—'দেশের দুর্দিন, নিজের জীবন অনিশ্চিত, মৃত্যু যে-কোন সময় ছোবল মারতে পারে। হাস্যোজ্জ্বল চঞ্চল প্রাণ মানুষটি হাসতে ভুলে গিয়েছিল, সে মানুষটি আমার অগোচরে গ্রামে আমার মা আর বড় বোনের

খবর নিত নিয়মিত। দেশে ওঁদের খাওয়া-পরার কষ্ট হচ্ছে—মা-বোনের জন্য সুযোগ পেলেই দুধ কাপড় ✓ঠিয়ে দিত। এ আমি জানতাম না, শুনেছি স্বাধীনতার পরে তাঁদের কাছে। অথচ এ ন'মাস শমী অমির জন্য ঠিকমত দুধ দিতে চাইত না। আমি রাগ করলে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত—আমাদের সন্তানরা না খেয়ে মরবে না। একবার দু'বার দুধ খাওয়ালেই যথেষ্ট—দেশের কত শিশু ক্যাম্পে না খেয়ে মরছে। তাদের কথা একবার চিন্তা কর। ভাব, ওরাও তোমার সন্তান। এখানে বসেও ওদের জন্য অনেক কিছু করার আছে।'

বাড়িতে ভাল খাবার-দাবার রান্না করতে দিত না। একটা তরকারি আর ডাল ছাড়া কিছু রান্না করা নিষেধ ছিল। বাড়িতে কি রান্না হবে ওকে জিজ্ঞেস না করে করা হতো না। সকালের নাস্তায় শহীদুল্লাহ ছানা খেত। মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সকালের নাস্তা থেকে ছানা বাদ পড়েছে। আমার ছেলে অমিতাভ মার্চ মাসে হয়েছে। দীর্ঘ ন'মাস ওকে একটা নতুন জামা পরতে দেয়নি। প্রয়োজনের বাইরে কোন খরচ করা ওর কড়া নিষেধ ছিল।

২৯শে মার্চ রাতে 'সংবাদ' পুড়িয়ে দিয়েছে। সংবাদের কর্মচারীরা বেকার হয়ে গেল। তাদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কে কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কার কি প্রয়োজন—এসব চিন্তায় ও সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকত।"[২০] দীর্ঘ ন-মাসের সংগ্রামের পর স্বাধীনতার ঠিক আগের রাতে রাজাকাররা শহীদুল্লাহকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়, আর কোন দিন কেউ তাঁর কোন খোঁজ পায়নি।

২৫ মার্চের কালো রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটে আবার স্বাধীনতার ঠিক আগের ১৪ ডিসেম্বরের রাতে। ঢাকা শহরের অবশিষ্ট সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে পাকিস্তানী শাসনকর্তার মদতপুষ্ট রাজাকার বাহিনী। পাকিস্তানী সৈন্য সেদিন বাংলাদেশের সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। সম্ভবত দেশ ছাড়ার মুহূর্তে তারা চেয়েছিল সমৃদ্ধ ভাবনার উৎসমূলে আঘাত করতে, মননের উৎসকে ধ্বংস করে দিতে—সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে একেবারে ভেঙে দিতে, দেশের সমস্ত সম্পদ নষ্ট করতে। হয়ত তাই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। শহীদুল্লাহ কায়সারকে কিভাবে নিয়ে যায় রাজকাররা তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে পান্না কায়সায়ের লেখায়। ১৫ তারিখ সকাল হতেই খবর পেলেন শহীদুল্লাহর মত আরও

হামিদা রহমান বলেছেন,—"....১৪ই ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানের দালাল বাহিনী আলবদর, আল্‌সামসের লোকেরা বাড়ি থেকে সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেন, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মুফাজুল হায়দার চৌধুরী, ডাঃ রব্বী, ডঃ আলীম, সাংবাদিক ও লেখক শহীদুল্লাহ কায়সার, পুরানো পল্টনের জনাব এয়াকুবালী এদের সেই রাতে ধরে নিয়ে গিয়ে মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে রেখে নির্মম অত্যাচারে অত্যাচারিত করে সেই রাতেই কাঁটাসুরের বধ্যভূমিতে নিয়ে তাঁদের গুলী করে হত্যা করে।"

হামিদা রহমান, 'জীবনস্মৃতি', পৃঃ ১৭৬।

অনেককে এইভাবেই নিয়ে গেছে রাজকাররা। পান্না কায়সার বলেছেন, "সকাল হল—১৫ তারিখ এল। মুক্তি এল না। বরং আরো খবর এল ডাঃ রাব্বি, ডাঃ আলিম, মোফাজল হায়দার চৌধুরী, মুনির চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, রাশিদুল হাসান আরো অনেক পরিচিত এবং প্রিয় নাম। এঁরাও শহীদুল্লাহ্‌র মত আলবদরের হাতে শিকার হয়েছে।"[২১] ১৬ ডিসেম্বরের স্বাধীনতার পর প্রিয়জনের মৃতদেহ খুঁজতে বেরিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ রায়ের

বাজারে, কাঁটাসুরের মাঠে। সেখানে স্তূপীকৃত হয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে ক্ষতবিক্ষত চূড়ান্ত নির্মম অত্যাচারের স্বাক্ষর বহনকারী মৃতদেহগুলি। ডঃ রব্বীর মৃতদেহের বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছিল, তারা জানত যে তিনি হৃদবিশেষজ্ঞ। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলীমের চোখ দুটি উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। আর নাক মুখ সকলেরই অস্ত্র দিয়ে

> *"শহীদুল্লাহ ওর নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারগুলো ওর হাতটা ধরে টান দিয়ে বলল—'চলুন আমার সঙ্গে'।*
>
> *শুনেই আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম। দুধের শিশিটা ছিটকে পড়ল মাটিতে—শমী পড়ে গেল কোল থেকে। সেদিন থেকে শমীর দুধ খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাদা দুধ দেখলেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠত।........*
>
> *আমার চিৎকার শুনে বারান্দার ওপাশের ঘর থেকে ননদ সাহানা দৌড়ে এসে বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ওকে ওরা টানতে টানতে সিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আমিও এক হাত ধরে ওকে টেনে ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ঘাতকরা বেয়নেটের নল দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম। বেবী এসেও ওদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে বেবী ওর হাত দিয়ে ওদের একজনের মুখের কালো কাপড়টা ধরে টান দিয়ে খুলে ফেলল আর অমনি আলোতে লোকটার চেহারা দেখে ফেললাম। বেবীকে ওরা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। বেবী পড়ে গেল ঠিকই, কিন্তু এক হাত দিয়ে ওর বড়দাকে তখনও ধরে রেখেছে। ওকে টানতে টানতে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার সময় শহীদুল্লাহ আরো জোরে বোনের হাতটা ধরে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না, হাতটা ছুটে গেল।"*
>
> *পান্না কায়সার, মুক্তিযুদ্ধ ঃ আগে ও পরে, পৃঃ ১৪১-৪২*

ক্ষতবিক্ষত করা। অধিকাংশ দেহই চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিল। পরনে জামা-কাপড় দেখে মানুষ সনাক্ত করেছে তার প্রিয়জনের মৃতদেহ। শিলালিপি পত্রিকার সম্পাদিকা সেলিনা পরভীনের মৃতদেহের ভয়ঙ্কর বর্ণনা রয়েছে হামিদা রহমানের লেখায়—"আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ হাতের যে মাটির ঢিবিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা গামছা দুটো সেখানে পড়ে আছে। পরনে কালো ঢাকাই শাড়ি ছিল। এক পায়ে মোজা ছিল। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। যেন চেনা যায় না। মেয়েটি ফর্সা ও স্বাস্থ্যবতী। স্তনের একটা অংশ কাটা। লাশটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। এ বীভৎস দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা যায় না। তাকে আমি চিনতে পারিনি। অবশ্য সনাক্ত হয়েছে যে, মেয়েটি শিলালিপি পত্রিকার এডিটর সেলিনা পরভীন।......আর একটু দূরে যেতেই দেখতে পেলাম একটি কঙ্কাল, শুধু পা-দুটো আর বুকের পাঁজরটাতে তখনও অল্প মাংস আছে। বোধহয় চিল শকুনে খেয়ে গেছে। কিন্তু মাথার খুলিটিতে লম্বা লম্বা চুল। চুলগুলো ধুলো-কাদায় মিশে নারী দেহের সাক্ষ্য বহন করছে।"[২২]

১৯৭১-র ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে অত্যন্ত নির্মম নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলে মুক্তিকামী পূর্ব পাকিস্তানের বুকে। ১৬ ডিসেম্বরের স্বাধীনতার ঠিক আগে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে তারা ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা চেয়েছিল মুক্তির আগে

দেশটিকে সম্পদহীন নিঃস্ব করে দিতে। তবুও স্বাধীনতা এসেছিল, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল একটি রক্তাক্ত জাতি।

"স্বাধীন বাংলাদেশের সোনার মানুষের লাশের মিছিল। বলা যায় লাশের স্তূপ। হাত বাঁধা, চোখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে আমাদের সকলের প্রিয়জনেরা। কারো চোখ তুলে নিয়েছে, কারো হৃৎপিণ্ড তুলে ফেলেছে। এমন নারকীয় হত্যা যজ্ঞ পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। কোন দেশকে স্বাধীনতার জন্য এভাবে বুকের রক্ত ঝরাতে হয়েছে কিনা জানি না। আর কেউ কোনদিন আপনজনকে খুঁজতে এসে এমন দৃশ্যের মুখোমুখি হবে কিনা জানি না।'

'পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৬।

পরিচিত রাজনৈতিক নেতার অনুরোধে বাড়িতে অস্ত্র রাখার অপরাধে প্রাণ দিয়েছে মুশতারী শফীর স্বামী ডাক্তার শফী। নিজের জীবন রক্ষার জন্য তিনি বাড়ি থেকে যাননি, কারণ বন্ধুর দেওয়া জিনিসের দায়িত্ব ছিল তার উপর। আর সেই বুলেট, অস্ত্র যে স্বাধীনতার যুদ্ধে বড়ই প্রয়োজনীয়। সেই রাজনৈতিক নেতা বন্ধু নিজে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান বর্ডার পার হয়ে ঠিক সময় মত অথচ জীবন দেন ডাঃ শফী। নিজের দেশে এইভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, একথা এঁরা কেউই ভাবেননি। তখন দলে দলে মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছিল, এমনকি সম্ভব হলে দেশ ছেড়ে বর্ডার পার হয়ে ভারতবর্ষে পাড়ি দিচ্ছিল। রাবেয়া খাতুনের কথায়, "সারা রাত জাগা লাল চোখ নিয়ে আমরাও আঁৎকে উঠলাম, চোখের সামনে একি দেখছি, পিঁপড়ের মতো লাইন ধরে ঝাঁক ঝাঁক মানুষ। ছেলে, বুড়ো, বাচ্চা যুবক সব বয়সের। বগলে পুঁটলি, কাঁধে কাঁখে শিশু, হাতে বালতি, কেটলি, হাঁড়ি, দুধের কৌটা। দম দেওয়া পুতুলের মতো চলছে। কারো মুখে কোন ভাষা নেই।

জানা গেল শেষ রাত থেকে শুরু হয়েছে এই পলায়ন পর্ব। মালিবাগ, আরামবাগ, সবুজবাগের অলিগলি দিয়ে মাদারটেক, ত্রিমোহিনীর যাত্রী এরা। কারো গন্তব্য গ্রামের দিকে। মোট কথা ঢাকা শহর আর নয়। প্রাণ-মান বাঁচানোর জন্য চাই গ্রামীণ আশ্রয়। রেডিওতে ইতিমধ্যে জারি হয়েছে কাবফিউ। তখনকার শহরতলী বামাবোর আশি ফুট, ষাট ফুট রাস্তা ভর্তি আতঙ্কিত পলাতক মানুষের ঢেউ—। দিক্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা।"[২৩] রাবেয়া খাতুনের মনে হয়েছে, ছবিতে-চলচ্চিত্রে দেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী বোমার ভয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গম পথ পেরিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে বাংলার দিকে আসা অথবা কলকাতায় মানুষের শহর খালি করে গ্রামের দিকে যাবারই যেন পুনরভিনয় হচ্ছে। সামান্য কিছু মালপত্র হাতে শিশু, বৃদ্ধ, এমনকি রুগ্ন অসুস্থ মানুষও ছুটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে, পেছনে পড়ে রয়েছে তিল তিল করে গড়া ঘর সংসার কখনও কখনও কোন প্রিয়জনও। মুশতারী শফীর স্বামী এবং ভাইকে ধরে নিয়ে যাবার পর মিলিটারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের বাড়ির আশ্রিত আত্মীয়দের সঙ্গে সমস্ত কিছু ফেলে এক কাপড়ে বেরিয়ে যান। পথে মিলিটাবীর তাড়া খেতে খেতে, মিরেশ্বরাই যাবার পথে, যখন সমুদ্রের বাঁধের কাছাকাছি পৌছলেন, একজন সহযাত্রী আঙ্গুল তুলে বাঁধটি তাকে দেখাল—"ঐ তো বাঁধ দেখা যাচ্ছে।' আমরা পশ্চিমে হাঁটছিলাম। সূর্যটা তাই মুখের সামনে। উত্তাপে সারা মুখ বোরখার ভিতর জ্বলছে। লোকটার কথায় কিছুতেই তাকাতে পারছি না। চোখ ঝলসানো রোদে দৃষ্টি

ঝাপসা হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় চশমাটাও ফেলে এসেছি ভুলে। লোকটার কথায় এবার কপালের ওপর হাত রেখে সূর্যকে আড়াল করে তাকালাম। দেখলাম, কালো একটা রেখা, তার ওপর পিঁপড়ের সারির মতো কি যেন চলছে। হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে, ওগুলো কি? 'ঐ তো, আপনার আমার মতই উদ্বাস্তু আর কি।'.........হ্যাঁ আমিও আজ উদ্বাস্তু, ছিন্নমূল বাস্তুহারা। ভাবতে ভাবতে আমরা এসে গেলাম বাঁধের কাছে। এখানে আরেক দৃশ্য। হাজার হাজার মানুষ—নারী, পুরুষ, শিশু, পোটলা, পুটলী, বোঁচকা, বুঁচকী মাথায় নিয়ে চলেছে হেঁটে। কোথা থেকে আসছে আর কোথাই বা যাচ্ছে বোঝা যায় না। মনে হয় ওরা যেন হাঁটছে অনন্তকাল ধরে। আজ মনে হয় সেদিন যদি আমি নিজেই সেই দৃশ্যের অংশ না হতাম, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের পথের সাথী না হতাম, তাহলে বুঝি আজ এই দৃশ্যের কথা, আমার দেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা,.......ঐ জীবনের ব্যথা বেদনার কথা মানুষের ঐ সীমাহীন দুর্দশার কথা আমি আজ কিছুতেই লিখতে পারতাম না।"[২৪]

ঐভাবে পথ চলতে চলতে তিনি দেখলেন যে, যাদের হাঁটার ক্ষমতা নেই, সে সব ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধাদের কাঁধে ঝোলানো বাঁকে করে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুস্থ মানুষেরও হাঁটার ক্ষমতা যেন প্রায় হারিয়ে যেতে লাগল—রৌদ্রে মুখ পুড়ে যাচ্ছে, পিপাসায় কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। তখন সেই পথের ধারে বসে থাকা কিছু মানুষ, আশেপাশের গ্রামের কিশোর যুবকরা মাটির কলসীতে করে জল আর গ্লাস নিয়ে বসেছিল। এই ঘর ছেড়ে আসা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলিকে তারা বিনা পয়সায় তৃষ্ণার জল দিয়েছে। কখনও তরমুজের ফালি, পাকা কলা, মুড়ি, চিঁড়ে কড়াইশুটি ভাজা, ডেকে ডেকে খাইয়েছে। পয়সা দিতে গেলে তাদের সমব্যথী হয়ে সমবেদনা জানিয়েছে, বলেছে তারা যে নিজেদের সমস্ত কিছু ফেলে ঘর ছেড়ে পথে বেরোতে বাধ্য হয়েছে পাঞ্জাবী সৈন্যের অত্যাচারে, তাদের কে কিছু খাওয়াতেও কি এরা পারে না?—'তোমরা এত কষ্ট করছো, আর আমরা তোমাদেরকে একটু কিছু খাওয়াতেও পারবো না?'[২৫]

রাবেয়া খাতুনের লেখায় তিনি দর্শক, নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন ঘরছাড়া প্রাণভয়ে পথে নামা মানুষের মিছিল। আর ঢাকায় প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসকের স্ত্রী, মুশতারী শফী দেশের দুর্দিনে কত মানুষকে নিজের বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে স্বামীকে হারিয়ে ভাইকে হারিয়ে হয়েছিলেন ঐ মিছিলেরই একটা অংশ। নিজের বাড়িঘর সমস্ত কিছু ফেলে প্রতিমুহূর্তে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পাকিস্তানী পুলিশের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন অন্যের বাড়িতে। কত সময় খিদেয় কাতর ছেলেমেয়ের মুখে দুটো ভাতও তুলে দিতে পারেননি। হতাশায় ভেঙে পড়েছেন, আবার সাতটি ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েছেন। মিরেশ্বরাই থেকে অনেক কষ্টে বর্ডার পার হয়ে এসে পৌঁছেছেন ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে, সেখান থেকে কলকাতায়। সেখানে ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কয়েকজন হিতৈষী বন্ধুর সাহায্যে ও সাহচর্যে শুরু হয়েছে বেঁচে থাকার লড়াই। দেশের মধ্যে থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও তিনি ছিলেন এই লড়াইয়ের একজন সৈনিক। সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত জীবনে, অপরিচিত পরিবেশে

তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে! শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত-আট মাসের দুঃখ-কষ্ট ও সংগ্রামের পর স্বাধীন দেশে ফিরে এলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। চট্টগ্রামের মুশতারী লজে গিয়ে যখন দাঁড়ালেন দেখলেন শুধু ঘরের জিনিসপত্র্ নয়, তার সঙ্গে ঘরের দরজা-জানালাগুলোও চুরি হয়ে গেছে—দাঁড়িয়ে আছে শুধু ইঁট, বালি. সিমেন্টের ধ্বংস স্তূপ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে শরিক হয়েছে মেয়েরা। কখনো কখনো ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছে। জাহানারা ইমামের ছেলে রুমী আগরতলার মেলাঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প থেকে ঘুরে এসে জানিয়েছে, কবি সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে রয়েছে সেখানে—তারাও সেখানে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পান্না কায়সায়ের কথায়, "মাঝে মাঝে খালাম্মার (সুফিয়া কামাল) বাসায় বেড়াতে যেতাম। খালাম্মার দু মেয়ে টুলু ও লুলু ওপারে চলে গেছে। দেশের জন্য কাজ করছে ওখানে। খালম্মা-খালু বাসায় একা।"[২৬] এই সমস্ত মেয়েরা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করেছে, কখনো বা নার্সের কাজ করেছে, বর্ডারের অস্থায়ী হাসপাতালে সেবা করেছে আহত মুক্তিযোদ্ধা ভাইদের। কখনো বা যারা ডাক্তার, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছে। মুশতায়ী শফী বর্ডার পার হয়ে আগরতলায় শরণার্থী ক্যাম্পে এসে পরিচিত হন কুমিল্লার ফরিদা বিদ্যায়তনের হেডমিস্ট্রেস সেলিনা বানুর সঙ্গে। তাঁর বড় মেয়ে শিরীন বানু রাজসাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। ২৬ মার্চ যুদ্ধ শুরু হলে শিরীন বানু চুল কেটে ফেলে পুরুষের মত প্যান্ট-সার্ট পরে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মালদহ বর্ডার ক্রস করে চলে আসে এপারে। শিরীন বানুর সাক্ষাৎকার সহ একটি প্রাণস্পর্শী অনুষ্ঠান প্রচার করেছিল আকাশবাণী কলকাতা।[২৭] মিরেশ্বরাইতে সেই অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে মেয়েটির সাহস ও দেশপ্রেমের কথা ভেবে অভিভূত হয়েছেন মুশতারী শফী। পরে যখন শিরীনের মা সেলিনা বানুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, জেনেছেন তাঁর মেয়ের কথা, বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছেন তাঁর মুখের দিকে। মনে হয়েছে "মাতৃভূমির মুক্তির জন্যে অস্ত্র হাতে শুধু ছেলেরাই যুদ্ধ করছে না—করছে মেয়েরাও। আর তেমনি একজন মুক্তিযোদ্ধা মেয়ের গর্বিত মায়ের সামনে আমি দাঁড়িয়ে।"[২৮]

প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছে মেয়েরা। কখনো সাহায্য করেছে গাড়ি করে অস্ত্রোপচারে। গাড়িতে মেয়েরা থাকলে সাধারণত মিলিটারী সে গাড়ি ছেড়ে দিত, বেশি কিছু বলত না। জাহানারা ইমাম প্রতিদিন অনেক অনেক রান্না করে রাখতেন। তাঁর ছেলে রুমীর বন্ধু মুক্তিযোদ্ধারা যদি হঠাৎ করে এসে যায়, তাদের জন্য বিভিন্ন দোকান ঘুরে ঘুরে নানা রকমের ওযুধ সংগ্রহ করে রাখতেন, যেগুলো সেই পরিস্থিতিতে তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। কিনতেন সোয়েটার, মোজা, তারপর সেগুলো ছোট ছোট প্যাকেট করে রেখে দিতেন, যাতে কোন মুক্তিযোদ্ধা ছেলে এলে তার হাতে তিনি পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাঁর ছেলে মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ার পর যন্ত্রণায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। তাকে আর কোনদিনই ফিরে পান না, তবুও যতদিন যুদ্ধ চলে তিনি এইভাবে টাকা পয়সা, জামা কাপড়, ওযুধ সমস্ত কিছু কিনে কিনে জমিয়ে রাখতেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও এই যুদ্ধের শিকার হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত মেয়েরা। বার বার দেখা গেছে, জাতির বিপর্যয়ে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেয়েরা, তাদের শারীরিক কারণে। পুরুষও শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়, কিন্তু মেয়েদের উপর শারীরিক নির্যাতন সবক্ষেত্রেই পরিণত হয় যৌন নিপীড়ন বা ধর্ষণে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত হয়েছে হাজার হাজার মেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে, মিলিটারীদের কাছে। যখন কোন অঞ্চল মিলিটারীর হাত থেকে উদ্ধার করত মুক্তিযোদ্ধারা, সেইখানেই তাদের বাংকারে পাওয়া যেত বেশ কিছু সংখ্যক মেয়েদের। আগরতলা শরণার্থী ক্যাম্পে থাকার সময় একদিন মুশতারী শফী তাঁর ছেলেকে নিয়ে আগরতলা হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে গেলে, সেখানে ইন্ডিয়ান আর্মীর কিছু লোক দুটি মেয়েকে নিয়ে আসে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায়। তাদের পরনে ছিল সায়া আর ছোট ছেঁড়া ব্লাউজ। তাঁরা শুনলেন যে পাকিস্তানী বাংকার থেকে মেয়ে দুটি পালিয়ে এসেছে। তাদের চিকিৎসারত মহিলা ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করে মুশতারী শফী জানতে পারলেন "সাবরুম বর্ডারের ওপারে পাকিস্তানী সেনা ছাউনির বাংকারে ১৫ জন মেয়ে ছিল। এদেরকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধরে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি মেয়ে গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে মারা যাবার পর থেকে ওরা সবাইকে এ রকম উলঙ্গ করে রেখেছে। দু-তিনদিন পর পর এদেরকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীতে নামিয়ে দেওয়া হয় গোসল করার জন্যে। এই দুটি মেয়ে ডুব অবস্থায় ধীরে-ধীরে কোমরের দড়ি খুলে ডুব সাঁতার কেটে কেটে এপারে চলে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লে বি এস এফ-এর লোকেরা এদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসে।"[২৯]

হামিদা রহমান 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, তাঁর স্বামী নোয়াখালির ডেল্টা জুটমিলে কাজ করার সময় মোকামে পাট কিনতে গিয়ে কুমিল্লায় একটি প্রাইমারী স্কুলে 'অনেকগুলো মেয়েকে উলঙ্গ অবস্থায় টাঙানো দেখে এসেছিলেন।'[৩০] পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদের মুক্তিবাহিনীর সাহায্যকারীর অপরাধে অভিযুক্ত করে ধরে নিয়ে এসে ঐভাবে রেখেছিল। রহমান পরে মিলিটারী অফিসারদের বলে ঐ মেয়েদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও যখনই কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তাতে বিশেষ শিকার হয়েছে মেয়েরা। অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের সম্মান নষ্ট এবং ধর্ষণ করাতেই যেন সেই সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশি অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় বলে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডারা মনে করত। স্বাধীনতার আগে পরে বার বারই ঘটেছে এই ঘটনা। মেয়েরা অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে ধর্ষিত, অপমানিত হয়েছে এবং তারপর কখনও কখনও তাদের হত্যা করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে এই ঘটনা খুব বেশী মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের উপর অপমান ও অত্যাচারের কথা সবচেয়ে বেশি শোনা যেত। বিশেষ করে বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলের সামনেই তাদেরকে ধর্ষণ করা হোত। হয়ত কোন স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য, বা সেই বাড়ির কোন মুক্তিযোদ্ধার হদিশ জানার জন্য তারা এই রকম নিষ্ঠুরভাবে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে গিয়ে পরিবারকে অপমানিত করত। এরপর

যদি তারা মেয়েটিকে হত্যা নাও করত, তার আর মৃত্যু ছাড়া, বা আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথ থাকত না। রাবেয়া খাতুন বলেছেন, "পাকিস্তানী আর্মি কারো কথা কানে তুলতো না। বাঙালী হলেই হলো। বাপ না পাওয়া গেলে ছেলেমেয়ে থাকলে ধরে নিয়ে যাও। স্বামীকে পাওয়া না গেলে স্ত্রীকে। কারা যেন খবর দিচ্ছে, অত নম্বরে তরুণী বধূ বা কন্যা রয়েছে। রাস্তার বাতি জ্বলে না। শুক্লপক্ষের শুরুর দিকে চাঁদের আয়ু সামান্য। অন্ধকারে জীপ এসে দাঁড়ায়। বাড়ির ভেতর প্রতিরোধ, গুলী, তারপর সব চুপচাপ শুধু জীপ চলে যাবার শব্দটুকু ছাড়া। আমাদের পেছনের দিকে বিল্ডিং-এ প্রায় সমবয়সী তিন বোন। কলেজের ছাত্রী। রাতে তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হতো। আবার সকালে পৌঁছে দিয়ে যেতো। ছোটটি শুরুতেই আত্মহত্যা করলো। মেজোটি ফিরে এলো না একদিন। যন্ত্রের পুতুলের মতো চালিয়ে রাখা হলো বড় মেয়েটিকে।"[৩১] রাবেয়ার মতে পারিবারিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্যই এগুলো 'প্ল্যান' করে করা হত। অল্পবয়স্ক মেয়েরা ছাড়াও প্রৌঢ়া, বৃদ্ধারাও বাদ যেতেন না। তাঁরা

'গ্রামের প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা নিজেদের বিপদগ্রস্ত ভাবেনি। যে দেশেরই সৈন্য হোক বয়সে পেটের ছেলের মতই তো হবে। সনাতন সে বিশ্বাসে মার খেয়ে তারা হয়েছে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় নির্যাতিতা। সমানে দু'রাত দু'দিন জ্বালাও পোড়াও অভিযানের পর পাশবিক অত্যাচারে মৃত পাওয়া গেছে যে তরুণীদের লাশ তারা গর্ভবতী ছিলো। অসুস্থতার কারণে ছুটতে পারেনি সেই তাদের অপরাধ।' *রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।*

ভাবতেন যে, তাদের ছেলের বয়সী সৈন্যরা আর কি অত্যাচার করবে? কিন্তু তাদের ভাবনা যে কত ভুল ছিল তা তারা জানতেন না। তাঁদেরও নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করাত পাকিস্তানী অবাঙালী সৈন্যরা। গ্রামে সৈন্যরা যখন আক্রমণ করতো শারীরিক অবস্থার জন্য যে গর্ভবতী তরুণীরা ছুটে পালাতো পারতোনা, পরে পাওয়া যেত তাদের ধর্ষিত মৃতদেহ। এরাও রেহাই পেত না সেই নরপশুদের হাত থেকে।

যুদ্ধের শেষের দিকে পাক সৈন্যরা ধর্ষিতা মেয়েদের সবসময় হত্যা করতো না। রাবেয়ার মতে, "খান সৈন্যদের শেষের দিকের প্ল্যান ছিলো ধর্ষিতা রমণী হত্যা নয়, তার ভেতর বিজাতীয় বীজ রোপন। বাঙালীর জন্য নতুন শাস্তির আগাম ব্যবস্থা।"[৩২] এই সমস্ত কুমারী মায়েদের নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে। স্বাধীনতার জন্য এইভাবেই এদের বলি দেওয়া হয়েছিল। এদের ধর্ষণ করে, অপমানিত করে বাঙালি জাতির দৃঢ়তা নষ্ট করতে, ভেঙে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানী সরকার। তবুও বিজয়ের রথ থেমে থাকেনি, এগিয়ে চলেছে তার নিজস্ব পথে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা নতুন মুক্তিসূর্যের আলোয় স্নান করেছে। সেই উজ্জ্বলতার আড়ালে নিজেদের আবৃত করতে চেয়েছিল এই সমস্ত নির্যাতিত মেয়েরা। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি দরকার হল এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এগিয়ে এসেছিল কোন কোন বিদেশী সংস্থা। এরকমই এক সংগঠনের কথা পাই বাসন্তী গুহঠাকুরতার লেখায়। স্বাধীনতার পর ২৮ ডিসেম্বর ময়না হাসানীর ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রণে গিয়ে কয়েকজন বিদেশী সাহেব মেমের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ওরা বাংলাদেশে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার জন্যই এসেছিল।

বাসন্তী গুহঠাকুরতার কথায়,—"ওরা একটা খ্রীষ্টান দল, 'ছোট পরিবার পরিকল্পনা'র থেকে এসেছে। ওরা এখানে আমাদের নির্যাতিতা মেয়েদের চিকিৎসা করবে। প্রয়োজন হলে Abortion করবে। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের দায় থেকে নারীকে মুক্তি দেবে।' কিন্তু গর্ভধারণ সাত মাস অতিক্রম করলে তারা Abortion করবে না—এটা তাদের ধর্মীয় ও মানবিক বিধিনিষেধ। এরকম রমণীরাই পরে 'বীরাঙ্গনা' নামে ভূষিত হয়েছিলেন। মনে হচ্ছে এ দলের সঙ্গে একজন ভারতীয় ডাক্তারও ছিলেন, যিনি ওপারেও আমাদের অত্যাচারিত মেয়েদের উদ্ধার করেছেন। এদের নিয়ে ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা চলতে লাগলো। সংগঠনের নামটা বোধহয় 'CONCERN' আয়ার্ল্যান্ডের।"[৩৩] গিয়েছিলেন মাদার টেরেসা, হয়তো বা বীরাঙ্গনাদের নবজাতকদের আশ্রয় দেবার জন্য! যে মেয়েরা বীরাঙ্গনা 'উপাধি' পেল, সেই উপাধি প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সত্যিই কতটা সম্মানের? সেই যুদ্ধের পরিস্থিতিতে তাদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া গেল না বলেই তারা বীরাঙ্গনার সান্ত্বনা পুরস্কারে ভূষিত হল। কিন্তু এই পুরস্কার পুরুষ শাসিত সমাজে তাদের সম্মানের জায়গাটি ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল কি? তা কি কখনও সম্ভব হয়? আমি জানি না এই মেয়েদের সংখ্যাই বা কত ছিল, তারা এবং পিতৃপরিচয়হীন তাদের সন্তানরা এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কতটা সুস্থভাবে, বেঁচে থাকতে পেরেছে বা পারছে? তা কি আদৌ সম্ভব? পিতৃতন্ত্র, এই স্বাধীনতা কি দেয় একটি ধর্ষিতা মেয়েকে। কোন দেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত, অত্যাচারে পঙ্গু 'পুরুষ' যে বীরত্বের-সম্মানের শিরোপা পায়, ধর্ষিতা কুমারী মার নারীর এই বীরাঙ্গ নার ভূষণ কি সমান সম্মানের যোগ্য? নাকি এ প্রকারান্তরে সে নারীকে চিহ্নিত করে দেওয়া!

১ জাহানারা ইমাম, "একাত্তরের দিনগুলি", পৃঃ ১২।
২ জাহানারা ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।
৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।
৪ পান্না কায়সার, "মুক্তিযুদ্ধ ঃ 'আগে ও পরে", পৃঃ ১১৯।
৫ জাহানারা ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০।
৬ মুশতারী শফী, "স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন", পৃঃ (৭৩-৭৪)।
৭ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত. পৃঃ ৭৪।
৮ পূর্বোক্ত।
৯ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৬।
১০ রাবেয়া খাতুন, "একাত্তরের নয় মাস", পৃঃ (৫-৬)।
১১ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২।
১২ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২।
১৩ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯-২০।
১৪ জাহানারা ইমাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৭।
১৫ পান্না কায়সার, "মুক্তি যুদ্ধ ঃ আগে ও পবে.", পৃঃ (১২২-২৩)।
১৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।
১৭ পূর্বোক্ত।

১৮ বাসন্তী গুহঠাকুরতা, "একাত্তরের স্মৃতি", পৃঃ ১০।
১৯ পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ (১২৪-২৫)।
২০ পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩২।
২১ পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৩।
২২ হামিদা রহমান, "জীবনস্মৃতি", পৃঃ ১৭৯।
২৩ রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।
২৪ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।
২৫ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬।
২৬ পান্না কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৮।
২৭ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৯।
২৮ পূর্বোক্ত।
২৯ মুশতারী শফী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৩।
৩০ হামিদা রহমান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৩।
৩১ রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ (২৫-২৬)।
৩২ রাবেয়া খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০০।
৩৩ বাসন্তী গুহঠাকুরতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৪।

’৭২-’৮০—নির্বাচিত পঞ্চাশ বছরের শেষ অংশ

১৯৭২	১ জানুয়ারি	:	দেশীয় রাজন্যবর্গের পদমর্যাদা এবং রাজন্যভাতা লোপ করা হয়।
	১৭ মার্চ	:	স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফর।
	১৯ মার্চ	:	স্বাক্ষরিত হয় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি। স্বাক্ষর করেন ইন্দিরা গান্ধী এবং মুজিবর রহমান।
	৩ জুলাই	:	স্বাক্ষরিত হয় ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর মধ্যে ভারত-পাকিস্তান চুক্তি (সিমলা চুক্তি)
		:	আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হুমকির জবাবে ভারত নিজে থেকেই পি এল ৪৮৯ চুক্তি বাতিল করে।
	১১ মার্চ	:	পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। কংগ্রেসের জয়লাভ এবং সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে বিধানসভা গঠন।
	২৫ জুন	:	গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা (APDR)।
	১৬ জুলাই	:	চারু মজুমদার গ্রেপ্তার।
	২৮ জুলাই	:	পুলিশী হেফাজতে চারু মজুমদারের মৃত্যু।
		:	দিল্লীতে প্রথম বইমেলা।
১৯৭৩	—	:	‘ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বিল’ ধর্ষণ আইনে কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পরিমার্জন করে।
	জানুয়ারি	:	জানুয়ারিতে জীবনবীমার জাতীয়করণ হয়।
	১২ ফেব্রুয়ারি	:	রাজবন্দীদের মা, স্ত্রী এবং বোনেদের ঐতিহাসিক মিছিল।
	২৮ মার্চ	:	বেকারী বিরোধী দিবস পালন।
	১ অক্টোবর	:	আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে জেল রক্ষীদের গুলিতে চারজন নকশাল বন্দী নিহত।
	১৮ ডিসেম্বর	:	মুজফ্ফর আমেদের মৃত্যু।
১৯৭৪	২০ এপ্রিল	:	কার্জন পার্কে নাট্যকর্মী প্রবীর দত্ত পুলিশের গুলিতে নিহত।
	৮ মে	:	ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট।
	৫ জুলাই	:	জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক।
	১৭ জুলাই	:	নকশালপন্থী আন্দোলনে ভাই সোমেন গুহ যুক্ত থাকায় স্কুল শিক্ষিকা অর্চনা গুহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ২৭ দিন ধরে নির্যাতন করে এবং তারপর জেলে থাকতে থাকতে তাঁর নিম্নাঙ্গ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

১৯৭৫	—	: আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ।
	৩০ এপ্রিল	: ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লাভ।
	মে-জুন	: বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ইন্দিরা বিরোধী গণঅভ্যুত্থান।
	—	: গুজরাটে মূল্যবৃদ্ধি এবং উচ্চপদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।
	১১ জুন	: এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায়ে, নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নেবার কারণে ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভায় সদস্য পদ বাতিল।
	২৫ জুন	: সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং সংবাদ মাধ্যমে সেন্সার জারি করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। মিসায় বহু কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী গ্রেপ্তার।
	—	: ২৬৪৯টি ছোট, বড়, মাঝারি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল।
	জুন-জুলাই	: অনেকগুলি গ্রুপ থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল, চলচ্চিত্রও সেন্সারের কবলে।
	—	: ২৬টি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
	—	: নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হল।
	৯ আগস্ট	কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের সূচনা।
	২৫ অক্টোবর	ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তৈরি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'-এর উৎক্ষেপন।
১৯৭৬	২৯ জানুয়ারি	কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের মৃত্যু।
	২৪ ফেব্রুয়ারি	নকশাল বন্দীদের প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙার ঘটনা; পলাতক-৪৩, নিহত-২।
	—	: চাসনালা কয়লাখনিতে দুর্ঘটনায় ৪০০ শ্রমিকের সলিল সমাধি।
	২৯ আগস্ট	: কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু।
	১৪ মার্চ	: কবি জসীমউদ্দীনের মৃত্যু।
	৯ সেপ্টেম্বর	: মাও-সে-তুং-এর মৃত্যু।
	—	: 'পাবলিশার্স এ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড'-এর উদ্যোগে কলকাতা বইমেলা শুরু।

— : 'ইকুয়াল রেমিউনারেশন অ্যাক্ট' পাশ হলে নারী-পুরুষের সমান কাজে সমান মজুরি স্বীকৃত হয়।

১৯৭৭ ১৬-২০ মার্চ : সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়। মোরারজি দেশাইর প্রধানমন্ত্রীত্বে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত হল জনতা সরকার।

— : জরুরী অবস্থা তুলে দেওয়া হল।

— : আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম মহিলা সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হলেন—তাঁর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য।

— : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সর্বাত্মক জয়।

১৯৭৮ কলকাতায় ভারতের প্রথম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় টেস্টটিউব বেবির জন্ম। (আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি।

সেপ্টেম্বরের (২৭-২৮-২৯)—প্রচণ্ড বৃষ্টিতে 'বানভাসি' কলকাতা।

১৯৭৯ — : বিশ্ব শিশুবর্ষ।

২৮ জুলাই : অন্তর্বিরোধের কারণে ভেঙে গেল কেন্দ্রের জনতা সরকার। চরণ সিং হলেন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী।

— : জয়প্রকাশ নারায়ণের মৃত্যু।

— : জামসেদপুরে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯৮০ মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের প্রত্যাবর্তন। ইন্দিরার একাধিপত্য, সঞ্জয়ের অবাধ কর্তৃত্ব।

কংগ্রেসী সরকার ৯টি অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারকে ভেঙে দেয়।

২৩ জুন—সঞ্জয় গান্ধীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু। রাজীব গান্ধী এলেন কংগ্রেস রাজনীতিতে।

— : 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' (১৯৮০) পার্লামেন্টে পেশ করা হয়, ধর্ষণ আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। 'মথুরা ধর্ষণ মামলা'র পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলির তীব্র প্রতিবাদেরই ফল এই বিল।

ষাটের দশকের ভাঙাগড়া ও আন্দোলনের জোয়ার উত্তাল করে তুলেছিল সমগ্র বাংলাকে—সত্তরের সূচনাতে চূড়ান্ত দমন-পীড়ন ও অত্যাচারে সেই আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ল। '৭২-এর মাঝামাঝি চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু পশ্চিমবাংলায় সত্তরের মুক্তি আন্দোলনকে প্রায় থামিয়ে দিল। প্রশাসনের নিপীড়নে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি প্রজন্ম। বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সেই বিপ্লবী অংশ যারা সমাজ

বদলের স্বপ্ন দেখেছিল তাদের মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙে দেওয়া হল যাতে তারা আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে না পারে। চিরদিনের জন্য স্বপ্ন দেখা, প্রথা-ভাঙ্গা, গড্ডলিকা প্রবাহে গা না-ভাসানো একটি আন্দোলনকে বেয়নেটের খোঁচায়, লাঠির ঘায়ে, বন্দুকের গুলিতে নিশ্চিহ্ন করে দিল পুলিশ ও প্রশাসন। 'সত্তর দশক মুক্তির দশক'-এর পরিণতি একটি প্রজন্মের বিপ্লবের মৃত্যুতে। পশ্চিমবাংলায় নির্মমভাবে পিটিয়ে মারা হল স্বপ্ন দেখা যুব সমাজকে। হারিয়ে গে.া একটা প্রজন্ম। পাশাপাশি একাত্তরের ডিসেম্বরে, ঘরের বাইরে প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির যুদ্ধ সার্থক হল। ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় তৈরি হল নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। '৬৯ থেকে সি. পি. আই. (এম-এল)-র নেতৃত্বে যে নকশালবাড়ি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি, 'খতমের লাইন' আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করেছিল কিন্তু তাদের সমাজ বদলের স্বপ্ন, নিঃস্বার্থ জীবনদান তো মিথ্যে হবার নয়। কমলা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "নকশালদের প্রতি বহু লোকের এমনকি পুরোনো নেতাদেরও সহানুভূতি ছিল- --এরা একটা আদর্শের জন্য—ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লড়ছে না—মরতেও তো প্রস্তুত—"[১]। আন্দোলন দমনের জন্য চলছিল পুলিশের চূড়ান্ত নির্যাতন, তারুণ্যই হয়ে উঠেছিল অপরাধ। নকশালবাড়ি আন্দোলনে কোনভাবে যুক্ত না থেকেও শুধুই বয়সটার জন্য কত ছেলেকে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, এমনকি প্রাণও দিতে হয়েছে। আর যারা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখার অপরাধ করেছিল, তাদের জন্য কোন ক্ষমা ছিল না। নির্মমভাবে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে তাদের দুর্বার গতি, নির্ভীকতা, নিষ্ঠা, সততা এবং স্বপ্ন—এমনকি প্রাণটুকুও। প্রাণ না গেলেও কখনো-কখনো টগবগে, জীবন্ত যে তরুণ-তরুণীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, সে মুক্তি পেয়েছে চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে, সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার হারিয়ে। অর্চনা গুহর ভাই নকশাল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। ভাই-এর অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং চূড়ান্ত অত্যাচারে পঙ্গু হয়ে

"অর্চনা গুহ নিজে সরাসরি নকশাল আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ভাই সৌমেন গুহর খবর জানার জন্য নকশাল দমন শাখার ও. সি. রুনু গুহনিয়োগী ও অন্যান্যরা দমদমের জ'সুর রোডের বাড়ি থেকে অর্চনা গুহ, লতিকা গুহ এবং গৌরী চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন। ১৮ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট একটানা ২৭ দিন লালবাজারে রুনুবাবুরা শারীরিক নির্যাতন চালান বলে অর্চনা দেবীর অভিযোগ। তিনি জানিয়েছেন, এই অত্যাচারের ফলে তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন। পোশাক পরিবর্তন এবং স্নান করার সুযোগটুকুও তাঁকে দেওয়া হয়নি। পরে মিসায় গ্রেপ্তার করে তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ক্রমশই নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হয়ে যায়। দুবার অস্ত্রোপচার এবং হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও কোন লাভ হয় না। ১৯৭৬-এর নভেম্বর মাসে প্যারোলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।"—দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায় 'বিচারের আশায় অর্চনা'— আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫।

কয়েক বছর পর মুক্তি পান তিনি। হারিয়ে ফেলেন সুস্থ জীবন। '৭৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর অর্চনা যখন বিচারক সুকুমার চক্রবর্তীর কাছে মামলা দায়ের করেন, স্ট্রেচারে করে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল আদালতে। তার ফল আজও পাওয়া যায়নি। 'বিচারের আশায় অর্চনা'

প্রতিবেদনে, ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫-র আনন্দবাজার পত্রিকায় দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, " '৭৭ থেকে '৮৭ সাল পর্যন্ত আইনের বিভিন্ন মারপ্যাঁচে মামলাটি বিলম্বিত হয়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত মামলাটি ১০ বছরের পুরনো হয়ে গিয়েছে বলে বাতিল করে দেন। কিন্তু হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি মানসনাথ রায় এবং সুনীল গুঁই অজিত সেনগুপ্তর আদেশ বাতিল করে রায় দেন যে, বিলম্বের অজুহাতে মামলা খারিজ হয়ে গেলে ন্যায় বিচার লাভের সুযোগ থেকে অর্চনাকে বঞ্চিত করা হবে। পরে সুপ্রিম কোর্টও আদেশ দিয়েছেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রতিদিন শুনানি নিয়ে মামলাটি শেষ করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে শুনানি চলার সময় কোনও উচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে না। এতদিন মামলাটিতে অর্চনার আইনজীবী ছিলেন অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। এখন ভাই সৌমেন গুহ নিজেই আইনজীবীর ভূমিকা পালন করছেন।"[২] অভিযুক্ত রুনু গুহনিয়োগী কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ সত্ত্বেও বামফ্রন্ট শাসনকালে পদোন্নতির ফলে ডেপুটি কমিশনার হয়ে অবসর নেয়। অর্চনা গুহ সরাসরি না থাকলেও, মীনাক্ষী সেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। '৭৩ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অন্যায়ভাবে মারতে বাধা দিতে চেয়েছিলেন তিনি কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ অফিসার রুনু গুহনিয়োগীকে। সেই অপরাধে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল হাতের আঙুলগুলো—কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল আর বোধহয় কোনদিন তুলি ধরতে পারবেন না, ছবি আঁকতে পারবেন না, লিখতে পারবেন না। চিরকালের জন্য বুঝি অকেজো হয়ে গেল হাত দুটো। মীনাক্ষী সেনের নিজের কথায়, "চুলের মুঠি ধরে দেওয়ালে ঠোকা শেষ হলে সে লাঠি তুলে নিল টেবিল থেকে। সেই প্রথম একবার, তখনো হাত দুটো খোলা, কোন প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের প্রেরণায় নয়—নেহাতই আত্মরক্ষার মজ্জাগত তাড়নায় আমি ওর লাঠিটা চেপে ধরেছিলাম ঘুরে দাঁড়িয়ে।—আপনি এভাবে মারতে পারেন না আমায়। রুনু যেন উন্মত্ত হয়ে গেল এরপর—শালী, মারতে পারি না আমি? কি পারি দেখবি? শালী নকশাল, আমার লাঠি চেপে ধরিস তুই?

টানতে-টানতে টেবিলের কাছে নিয়ে এসে সে আমার হাত দুটো চেপে ধরল টেবিলের ওপর। তারপর ক্রমাগত প্রাণপণ শক্তিতে লাঠির বাড়ি মারতে থাকল হাতে কব্জিতে পাতার উপর।

নিমেষের মধ্যেই কালো হয়ে গেল নখটখ সমেত হাতের পাতা দুটো। আমি কেঁদে ফেললাম—আমার হাত দুটো কি ও নষ্ট করে দিল? আর কি কখনো কোনো কাজ করতে পারব না হাত দিয়ে? লিখতে পারব না? ছবি আঁকতে পারব না?"[৩] এই সমস্ত ছেলেমেয়েগুলো মুখ বুজে সহ্য করেছিল সমস্ত অত্যাচার। একটি কথাও সহজে বার করতে পারেনি তাদের মুখ থেকে পুলিশ, কিন্তু এই নির্মমতা ভীত করেছিল সাধারণ মানুষকে। তারা ভুলে গিয়েছিল স্বপ্ন দেখতে। একটি প্রজন্মকে শেষ হতে দেখেছিল তারা চোখের ওপরে। তৈরি হল এক বিরাট শূন্যতা—বিপ্লব করতে, প্রতিবাদ করতে, স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেল মানুষ। সদ্য কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়া যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের গায়ে নকশালবাড়ি

আন্দোলনের আঁচ এসে লেগেছিল তারাও যেন সেই নির্মমতার সামনে হয়ে উঠল মূক-বধির-নির্বাক। হারিয়ে গেল প্রতিবাদের ভাষা, ভুলে গেল বিপ্লবের পথটি।

—তারপর আর কিছু মনে নেই। বলে—জ্ঞান ফিরলে দেখলাম....কিন্তু আমার ভাগ্যে কিছুই ঘটল না। আসলে স্বাস্থ্য যে মজবুত। বয়স যে উনিশ।

ভগবান অথবা রুনু কেউই অজ্ঞান করতে পারল না আমায়।

তাই প্রতিটি আঘাত, প্রতিটি আঘাতের যন্ত্রণা, প্রতিটি আঘাতের অপমান, যেন গুনে গুনে ধরে রাখতে হল শরীরে ও মনে। এই আঘাত, এই যন্ত্রণা, এই অপমানের কথা কখনো ভুলতে পারব না, মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে আমার।" মীনাক্ষী সেন, 'নকশালদমনে পুলিশ কী করেছে : একটি দলিল', প্রতিক্ষণ, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৪০।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে ১৯৭২-র ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট মহিলা কনভেনশন হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, মহিলা সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ এবং নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ। এছাড়াও শিল্পী, সাহিত্যিক, আইনজীবী, চিকিৎসক প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মহিলারাই এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন।—"পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের এই কনভেনশন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, অন্যান্য গণসংগঠন ও নরনারী নির্বিশেষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে এই দাবিগুলি আদায়ের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণীর ব্যক্তিহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সমস্ত রকম সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ ও দমননীতির অবসানের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে।"[৪] এর কিছুদিন পর '৭২-এর ১১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হল। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস জয়ী হল এবং সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে গঠিত হল মন্ত্রী সভা।

কনক মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "অবশেষে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হলো। এ রাজ্যে নির্বাচনের দিন স্থির হলো ১১ মার্চ, ১৯৭২।" —কনক মুখোপাধ্যায়, "নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা", পৃঃ ২২৫।

পুলিশের সাহায্যে কঠোর হাতে তিনি দমন করলেন বিপ্লবী আন্দোলন। প্রতিরোধের নামে চিরকালের জন্য শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে পঙ্গু করে দিলেন সত্তরের যুব সমাজকে। স্বপ্ন দেখা প্রতিবাদী বিপ্লবী যুবগোষ্ঠীর জায়গা নিল অশিক্ষিত ক্ষমতালোভী সমাজবিরোধী 'মস্তান'রা। অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের অদৃশ্য সুতোর টানে এরা জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। পশ্চিমবঙ্গে চলতে লাগল প্রায় 'আধা-ফ্যাসিস্ট' রাজত্ব। স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছরের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে গৌতম নিয়োগী বলেছেন, "মার্চ মাসে ১৬টি রাজ্যে নির্বাচন হলো, পশ্চিমবঙ্গেও। কংগ্রেস সরকার গঠন করলো। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় শুরু করলেন আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস।"[৫] কংগ্রেসের প্রবীণতম সদস্য ডঃ ফুলরেনু গুহও তাঁর স্মৃতিকথায় সিদ্ধার্থ রায়ের শাসনকালের সমালোচনা করেছেন—"১৯৭২ সালের মার্চ মাসে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কিছু কিছু কাজ

ভালোই করেছেন তবে গ্রামের দিকে নজর দেননি। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও দূরদর্শন তাঁর আমলেই চালু হয়। তিনি বেকার যুবকদের মিনিবাসের পারমিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। গ্রামের কাজ বলতে সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার অধীনে গ্রামে কয়েকটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। শ্রী রায় গোপন খবর জানার উদ্দেশ্যে একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতেন। তারই ফলে কংগ্রেসে ভাঙ্গন ধরল। ওয়াংচু কমিশন কেন তিনি বসিয়েছিলেন তা আজও আমি বুঝি না। তবে ভুষি কেলেঙ্কারির আজও কোন সমাধান হল না। এইসব কারণে জনমানসে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বিশেষ করে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে। ওর সঙ্গে জরুরী অবস্থার খারাপ দিকটা তো ছিলই। এর ফলে কংগ্রেসের ভিতই যে শুধু নড়ে গিয়েছিল তা নয়, প্রফুল্ল সেন ও বিজয় সিং নাহারের মতো প্রবীণ ও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাও জনতা দলে চলে গেলেন, যদিও সাময়িকভাবে। তাছাড়া '৭৭ সালের নির্বাচনে সিদ্ধার্থ রায় দাঁড়ালেন না। ১৯৭৭ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হয়।"[৬]

নির্বাচনের কয়েকদিন পর, (১৭ মার্চ, ১৯৭২) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা গেলেন। ১৯ মার্চ (১৯৭২) "ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষর করলেন ইন্দিরা গান্ধী এবং শেখ মুজিবর রহমান। 'পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতি বিপন্ন হলে কার্যকর উপায় উদ্ভাবনের জন্য দু'দেশের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা থাকে চুক্তিতে। পরবর্তীকালে আরও একটি বহুমুখী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিনিময়ের।"[৭] জুলাই মাসের ৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হল আরও একটি চুক্তি 'পাক ভারত চুক্তি'। এই চুক্তির মাধ্যমে পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য বলপ্রয়োগ অথবা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়। আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে দু'পক্ষই সৈন্য সরিয়ে নিতে স্বীকৃত হল। ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত আলোচনার পর মতৈক্যে পৌঁছলেন তারা—"অপর দেশের জাতীয় সংহতি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেওয়া হবে।"[৮] '৭২-র সুচনাতেই (১ জানুয়ারি) দেশীয় রাজন্যবর্গের পদমর্যাদা এবং রাজন্যভাতা লোপ করা হয়। ঠিক একবছর পর '৭৩-র জানুয়ারিতে জীবনবীমার জাতীয়করণ করা হয় এবং মে মাস (১৯৭৩) থেকে সমস্ত কয়লাখনি সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করা হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হুমকির জবাবে ভারত নিজে থেকেই পি এল ৪৮০-র যে চুক্তিবলে আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য নিত, তা বাতিল করে দেয়। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার পরিকল্পনায় ঘোষিত হয় প্রধানমন্ত্রীর 'গরীবী হটাও' শ্লোগান। সারা দেশ জুড়ে একটি আপাত প্রগতির আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায় কিন্তু গণতন্ত্রের নামে চলতে থাকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্র। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে চলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের স্বৈরতন্ত্র। সমাজের সমস্ত স্তরের সমস্ত পেশার মানুষের মধ্যেই অসন্তোষ তীব্র হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। বিভিন্ন পেশা ও জীবিকার মানুষরা শুরু করেন ধর্মঘট। পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন দাবিতে প্রায় তিন মাস

ধর্মঘট করেন। মঞ্জুরী গুপ্তের কথায়, "১৯৭৩-এর শেষভাগ থেকেই দিকে দিকে জনগণের বিক্ষোভ ফেটে পড়তে থাকে।.....ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, আইনজীবী—সমাজের কোন অংশই বাদ যায়নি। নিজেদের বিশেষ দাবি ছাড়াও সাধারণ দাবি প্রায় সবারই ছিল জিনিসের দাম কমাতে হবে, সস্তাদরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দিতে হবে, দমননীতি বন্ধ করতে হবে। এই দাবি নিয়ে কেউ বা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন, কেউ বা রাজ্যপালের কাছে গণডেপুটেশন দিয়েছেন, কেউ বা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেছেন।"[৯] সারা ভারত জুড়ে রেল ধর্মঘট শুরু হয় ৮ মে ১৯৭৪। '৭৪-এর শুরুতেই ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ দিনের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক। এদের সমর্থনেও গড়ে উঠতে থাকে গণ-আন্দোলন। মার্চ মাসে (১১-১২ মার্চ, ১৯৭৪) খাদ্যের দাবিতে প্রায় দশ হাজার মহিলা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী গণ-অবস্থান করে কলকাতার রাজভবনের সামনে। মহিলা গণ-অবস্থানের আহ্বায়ক পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি প্রায় নয় দফা এক দাবিপত্র পেশ করে।[১০] বামপন্থী দলের আহ্বানে সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট, 'ভারত বনধ' হয় একদিন। ডাক ও তার কর্মীরাও দুদিনের জন্য ধর্মঘট করে। খাদ্যের দাবিতে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে গণ-আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গড়ে ওঠে গুজরাট, বিহার, আসাম, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যেও। গুজরাটে ১৯৭৪ থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ, বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে শুরু হয় আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে, আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করে। প্রশাসনের অন্যায় শোষণ ও সাধারণ মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের দাবিতে সমাজেব সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "খাদ্যের দাবিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য গণ-আন্দোলন এই সময় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গুজরাট, বিহার, আসাম, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে গণ-আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনগুলিকে সুসংহত করার জন্য কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী দলগুলি—কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), স্যোসালিস্ট পার্টি, এস. ইউ. সি., আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. সি. পি. আই., বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, ওয়ার্কার্স পার্টি এবং সি. পি. আই.— ৪-৫ এপ্রিল, ১৯৭৪ দিল্লিতে মিলিত হয়ে ১৭-দফা দাবিসনদ্ গ্রহণ করে। এই যুক্ত ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ৩ মে, ১৯৭৪ ভারতের রাজ্যে রাজ্যে গণপ্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। পশ্চিমবাংলায় ৯টি বামপন্থী দলের আহ্বানে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস ৩ মে, ১৯৭৪ গণ-আইন অমান্য সংগঠিত করা হয়। কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মানুষ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির উদ্যোগে জেলায় জেলায় মহিলারা আইন অমান্য করেন।"[১১]

১৯৭৪-র ৩ মে বামপন্থী দলের উদ্যোগে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ২৫০ জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ২৪ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় তাদের জেল হাজতে থাকতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলের মেয়েদের

ওয়ার্ড থেকে তাদের এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়। সেখানে ছিল ৭ জন নকশাল বন্দী। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সহজে না পেলেও, শেষপর্যন্ত তারা কথা বলার সুযোগ পান। এবং তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন জিজ্ঞাসাবাদের নামে কি অমানুষিক, শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তাদের উপর করা হচ্ছে। তারা অধিকাংশই ছিলেন বিচারাধীন বন্দী কিন্তু তাদের কখনও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হত না। সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও নিখিল বঙ্গ মহিলা সমিতির চারজন সদস্যা শুক্লা দাঁ, গীতা সেনগুপ্ত, বাণী মজুমদার এবং নুপুর দে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কাছে এক বিবৃতিতে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ দাবী করেন। এ. পি. ডি. আর. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাদের বিবৃতি প্রচার করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেন প্রশাসনের সত্যিকার চেহারাটিকে। 'দলমত নির্বিশেষে' বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অ-রাজনৈতিক পক্ষ থেকে তদন্ত এবং প্রতিকারের দাবী উঠতে থাকে। ২১.৬.১৯৭৪-এর আনন্দবাজার পত্রিকা এবং ২৬.৬.১৯৭৪ ও ৩.৭.১৯৭৪-এর সত্যযুগ পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির কাছে দেওয়া সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এখানে তুলে দেওয়া হল—"৩রা মে ১৯৭৪ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নয়টি বামপন্থী দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আইন অমান্য আন্দোলনে আমরা প্রায় ২৫০ জন মহিলা গ্রেপ্তার হই। গ্রেপ্তারের পর আমাদের প্রেডিসেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সন্ধ্যায় আমরা জেলে যাই, তার পরের দিন রাত দশটায় আমরা মুক্তি পাই। এই সময়টুকুর মধ্যে প্রেসিডেন্সী মহিলা ওয়ার্ড থেকে আমরা এক অত্যন্ত বেদনাময় ও নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরি। অভিজ্ঞতার সূত্র হলো এই জেলে আটক ৭ জন নকশালপন্থী তরুণী ও ষাট বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা। পুলিশ তথা জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যাদেরকে ঘিরে সৃষ্টি করা হয়েছে এক লৌহ কঠিন আবরণ—যাতে এঁদের কথা জনসমক্ষে আসতে না পারে, সমাজের মানুষেরা জানতে না পারেন, যে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে, শুধুমাত্র সমাজ পরিবর্তনের এক বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসের অভিযোগে কি নৃশংসতম উপায়ে এই মহিলারা প্রতিদিন নিপীড়িত হয়ে চলেছেন। এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মহিলা কর্মীরাও আমাদেরকে জেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এদের সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দেয় এই বলে যে—'ওদিকে যাবেন না। ওই মেয়েরা নকশাল, সাংঘাতিক মেয়েছেলে, আপনাদের কামড়ে দেবে' ইত্যাদি। সঙ্গত কারণেই সেজন্য, প্রেসিডেন্সী জেলে আটক, ৩৫০ জন উন্মাদ মহিলাদের সেল-এর পাশাপাশি সেল-এ আটক, বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখা। এই সাত-আটজন বিপ্লবী তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজে যে করা যায়নি তা বলাবাহুল্য। ঐ জেলের স্থান ধারণের ক্ষমতা যেখানে ২২০০ সেখানে বন্দী সংখ্যা ৩১০০ ওঠে। ফলে আমাদের মধ্যে কিছুজনকে উন্মাদ সেল-এ রাখা হয়। এর ফলেই আমরা পাশের সেল-এর ঐ সমস্ত তরুণীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে নিতে পারি। চূড়ান্ত অসুবিধার মধ্যে যে খবরটুকু আমরা জানতে পারি, তা এই চিঠির মাধ্যমে প্রকাশ করছি।

এই তরুণীদের মুখ থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথম গ্রেপ্তার ও পুলিশের রুটিন মাফিক "জিজ্ঞাসাবাদ"-এর (যার মধ্যে শারীরিক অত্যাচারের ঘটনা প্রতিবারই ঘটেছে)

শেষে জেল-এ আসার এক মাসের পর থেকে প্রতি মাসেই একবার করে, এদের প্রায় প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রথমে চলে জিজ্ঞাসাবাদ ('তোদের দলে আর কে আছে? তাদের ঠিকানা বল, নাম বল' ইত্যাদি) এবং পুলিশের বড় কর্তাদের উত্তরে খুশী করতে না পারার সাথে সাথে শুরু হয় শারীরিক বলপ্রয়োগ।

তরুণীদের দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে একটি টেবিলের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে চলে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা—গলা, বুক, পেট এবং শরীরের নরম অংশ কোন জায়গা বাদ পড়ে না—সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ ও অশ্লীল ইঙ্গিত ইত্যাদি এবং এই শেষ নয়। যে তরুণীরা এতেও উত্তরদানে বিরত থাকেন—তাদের মলদ্বারে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তাঁরা। (পরিণতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এই ধারাবাহিকভাবে লোহার শিক ঢোকানোর ফলে মলদ্বার ও যৌনাঙ্গের নালীর মধ্যেকার পর্দাটি ছিঁড়ে নালীগুলি মিলে একাকার হয়ে গেছে বহু ক্ষেত্রে)। এরপর অচৈতন্য তরুণীর দেহ লালবাজারের পুলিশ ভ্যান জেল-এ ফেলে দিয়ে যায়। এই অবস্থায় কুড়ি-বাইশ দিন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী থাকার পর ধীরে ধীরে যখন সুস্থ হয়ে ওঠে তখন আবার লালবাজারে ডাক পড়ে। আবার চলে অত্যাচার।

এইসব তরুণীরা যদিও অধিকাংশ বিচারাধীন বন্দী তবুও কোর্ট ডেটে কখনও এঁদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হয় না। ভ্যানে বসিয়ে রেখেই পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করিয়ে আনে। কোর্ট এজলাসে হাজির করলে পাছে এই ঘটনাগুলি এই তরুণীদের মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়েই পুলিশ কর্তৃক এ পন্থা গ্রহণ। এককথায়, সম্পূর্ণ ধারাবাহিক অত্যাচার চালিয়ে যাবার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে কোন ফাঁক নেই।

এই তরুণীরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আদর্শবাদী ও দৃঢ়চেতা। এঁদের মধ্যে কারো স্বামী পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন, কেউ বা বৈজ্ঞানিক গবেষক, এবং প্রত্যেকেই পুলিশের ভাষায় 'dangerous element' ("বিপজ্জনক ব্যক্তি") যাদের এখনো 'পোষ মানানো যায়নি।' আমরা নিশ্চিত যে 'পোষ মানাবার' এই প্রক্রিয়া যদি আর চলতে থাকে—তবে অল্পদিনের মধ্যেই এই তরুণীরা হয় মারা যাবেন না হয় সারাজীবনের জন্য বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বেন অথবা সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবেন। কিন্তু জাতীয় সরকারের কাছে এই পরিণতি একান্ত কাম্য হলেও, রাজনৈতিক মহিলাদের উপর এই উন্মত্ত আক্রমণ ভারতবর্ষের সমস্ত নারী সমাজের কাছে চূড়ান্ত অবমাননাকর। একদিকে এই পাশবিক অত্যাচারের মুখে অবিচল থেকে এই তরুণীরা শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি দৃঢ়তাকেই নয়, ভারতীয় নারী জাতির আত্মসম্মানকেও সগৌরবে অম্লান রেখেছেন; অন্যদিকে সরকার এক কাপুরুষোচিত উপায়ে গণতান্ত্রিক মুখোশের আড়ালে যে ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে ঘৃণা জানাবার ভাষা আমাদের নেই। যে কোন গণতান্ত্রিক ও আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন মহিলা নিশ্চয়ই এই অবমাননাকে মেনে নেবেন না। সরকারের কাছে এই জঙ্গলের নীতি অবসানের দাবী তুলবেন।

স্বাঃ শুক্লা দাঁ, গীতা সেনগুপ্ত, বাণী মজুমদার, নূপুর দে (নিখিলবঙ্গ মহিলা সমিতি—কলকাতা)।"[১২]

ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্রের কারণে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্রমশ ক্ষোভ জমে উঠেছিল। এর মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে রাজনারায়ণ মামলা করলেন। ১৮ মার্চ ১৯৭৫—ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। ১২ জুন হাইকোর্ট ইন্দিরার লোকসভা নির্বাচন বাতিল করে। ছ'বছর সংসদ বা বিধানসভার কোন আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয় কিন্তু তিনি সুপ্রীম কোর্টে আপিল করেন। বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী জানায়। তিনি পদত্যাগ করতে কোন মতেই রাজি হন না, "বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার বলেন (২৪ জুন, ১৯৭৫) যে যতক্ষণ না বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় আবেদনকারীর প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হিসাবে সংসদের উভয় সভায় বক্তৃতা করা অথবা আলোচনায় যে কোন ভাবে যোগ দেওয়া বা সংসদের যুক্ত অধিবেশনে অংশ নেওয়া (ভোটাধিকার ছাড়া), আইনে উল্লিখিত কাজকর্ম করা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেতন গ্রহণের অধিকার থাকবে।"[১৩]

দেশের এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে, সুপ্রীম কোর্টের রায় ঘোষণায় দু'দিনের মধ্যেই, ২৬ জুন ১৯৭৫, রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন—"আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য ভারতের ঐক্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা"[১৪] করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার কোন বৈঠক না ডেকে তাদের অনুমোদন ছাড়াই রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। শুরু হয়ে যায় দেশজুড়ে গ্রেপ্তার। সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল—গ্রেপ্তার হলেন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরাও, কেড়ে নেওয়া হল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। জয়া মিত্র তখন জেলে, তিনি বলছেন—"কাগজে বলছে এমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে। দেশ নাকি হু-হু করে উন্নতির বাতাসে পাল তুলে এগোচ্ছে। শুধু ভেতরের বাতাস নড়ে চড়ে না—অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন।......সারা দেশে নাকি কড়া র‍্যাশনিং চালু হয়েছে। জেলে খাবারের পরিমাণ কমতে কমতে ঠিক এক হাতা ভাতে এসে ঠেকেছে। মায়েদের সঙ্গে যে বাচ্চারা আসে তাদের ভাত দেওয়া হচ্ছে না। যা খাবার দেওয়া হচ্ছে, তাতে সাধারণ বন্দী মেয়েদের পেটের একপাশও ভরে না। সারাদিন পেটের মধ্যে ঘ্যানঘ্যানে খিদে। সবাই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।"[১৫] জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক সপ্তাহ পরেই ঘোষিত হয় প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী—"পর্যায়ক্রমে গ্রামবাসীদের ঋণ বিলোপ করা হবে ; শহর অঞ্চলে জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হবে ; ছয় হাজারের জায়গায় আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়কর ছেড়ে দেওয়া হবে ; মুচলেকা শ্রমিক (বন্ডেড লেবার) প্রথা রদ, ও গ্রামের ভূমিহীন শ্রমিকরা কিছুদিন যাবৎ যে বাস্তু জমিতে বসবাস করছেন তার মালিকানা দান করা হবে। স্বনামেই থাক আর বেনামিতেই থাক চোরাচালানিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ; আমদানি-রপ্তানি বিধি লঙ্ঘন করলে অথবা লাইসেন্সের অপব্যবহার করলে দ্রুত বিচার হবে, শাস্তিও পেতে হবে। কর ফাঁকির জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে।' দেশ জুড়ে চলতে লাগল অরাজকতা। জরুরী

অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একাধিপত্য ও একনায়কতন্ত্র বজায় রাখার জন্য সংবিধান সংশোধিত হতে লাগল বারবার। জরুরী অবস্থা জারির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্ডিন্যান্স জারি ও সংশোধনের মাধ্যমে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। ১৯৭৫-র ১৯ জুলাই বলা হল, 'মিসায় আটক কোনও ব্যক্তি বিদেশি নাগরিক হলেও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি জানাতে পারবে না। স্বাভাবিক ও সাধারণ আইনের সাহায্য প্রার্থনা করে সে আদালতেও যেতে পারবে না। ৭ আগস্ট বাদল অধিবেশন মুলতুবি হবার পূর্বাহ্নে লোকসভায় একটি সংবিধান সংশোধন বিল পাশ হয় ৩৩৬-০ ভোটে। তাতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষ, এই চারজনের নির্বাচন নিয়ে কোন সংশয় বা বিরোধ দেখা দিলে সে সম্পর্কে তদন্ত করবেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন সংসদ কর্তৃক গঠিত আইনানুগ এক কর্তৃপক্ষ।"[১৬] সুপ্রীম কোর্ট ইন্দিরার নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করলেন না। মিসা চতুর্থবার সংশোধিত হল—বলা হল, কোনও ব্যক্তির বন্দী আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও আবার নতুন করে আদেশ দেওয়া যাবে। তিন সপ্তাহ পর জারি হল আরও দুটি অর্ডিন্যান্স। প্রথমটিতে প্রেসের কণ্ঠরোধ করা হয়—'আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ এবং প্রেস কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স।' দ্বিতীয়টিতে ঘোষণা করা হয় (৮ জানুয়ারি, ১৯৭৬) সংবিধানের ১৯ পরিচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের দাবিতে কেউ আদালতে যেতে পারবে না। হাজার হাজার মানুষকে সামান্য প্রতিবাদের জন্য বা সন্দেহে বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। সরকারিভাবে বিভিন্ন উপায়ে জরুরী অবস্থার সুফল, দেশের উন্নতি, অগ্রগতির কথা সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করা হয়। ফুলরেনু গুহ কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। তিনি জরুরী অবস্থার বিভিন্ন ভাল দিকের কথা বলেছেন, আবার সমালোচনাও করেছেন। নির্দ্বিধায় জরুরী অবস্থায় সময়কালীন প্রশাসনের স্বৈরাচার তিনি মেনে নিতে পারেননি।—"আমাদের দেশে জরুরী অবস্থার ভালো ও মন্দ দু-দিকই ছিল। এর ফলে সামাজিক জীবনে কিছুটা শৃঙ্খলা এসেছিল। যানবাহন ঠিকমতো চলত, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা হত, এবং অফিস আদালতের কাজ ঠিকমতো হত। কিন্তু জরুরী অবস্থায় একটা ব্যাপার আমি সমর্থন করতে পারিনি। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিককে যেভাবে জেলে আটক করা হয়েছিল তা প্রশ্নাতীত মনে করতে পারিনি।"[১৭] এরই মধ্যে ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা আর সঞ্জয়ের আবির্ভাব সমস্যা জটিলতর করে তুলল। বিরোধীদের মতে সঞ্জয় ছিলেন 'Extra Constitutional Authority'। সঞ্জয়কে কেন্দ্র করে যে যুবগোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তারা মূলত সুস্থ স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তে 'মস্তান রাজ'ই গড়ে তোলে। জরুরী অবস্থার সুযোগে তারা মানুষের উপর নানাভাবে জবরদস্তি শুরু করে।

১৯৭৭-র ১৮ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেয়। মার্চে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়। হাজার হাজার বন্দী মুক্তি পায়, জরুরী অবস্থা কিছুটা শিথিল হয়। ইন্দিরার একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলেন জগজীবন রাম, তৈরি করলেন পৃথক রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনে গঠিত হল ইন্দিরা বিরোধী একটি 'জোট'। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঘটল

এক বিরাট পরিবর্তন। কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হল এবং জনতা দল ও সহযোগীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করল। ২২ মার্চ ১৯৭৭ ইন্দিরা গান্ধী পদত্যাগ করলেন। জনতা দলে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ এবং শেষপর্যন্ত জগজীবন রামকে সরিয়ে দিয়ে মোরারজী দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী করা হল। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কেন্দ্রে এক অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হল। সাময়িকভাবে হলেও কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান ঘটল।

কেন্দ্রে জনতা সরকার বেশিদিন স্থায়িত্বলাভ করতে পারল না। দলীয় অন্তর্কলহ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় দুর্বল হয়ে পড়ল তারা। ১৯৭৯-র শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন বছরের শুরুতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। '৮০-র নির্বাচনে কেন্দ্রে আবার ফিরে এল ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচন হল ১৯৭৭-র জুন মাসে। নির্বাচনে বিপুল ভোটে বামফ্রন্ট জয়লাভ করল। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এত বেশি সংখ্যক ভোট পেল যে অন্যান্য বাম শরিক দলের সাহায্য ছাড়া একাই তারা সরকার গঠন করতে পারত। গঠিত হল বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা, মুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। সত্তরের প্রথমার্ধে কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাল সাধারণ মানুষ, তাদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। ডঃ ফুলরেনু গুহ, তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, " '৭৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হলে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম ঠিকই তবুও মনে হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার দুর্নীতি বন্ধ করে সামাজিক দিক দিয়ে যদি দেশের উন্নতি করতে পারে তবে ভালোই হয়। মার্কস-লেনিনের বই পড়েছিলাম। গোর্কির মাদার পড়েই যুগান্তর পার্টি থেকে লেবার পার্টিতে এসেছিলাম। সি. পি. এম.-এর মধ্যে সেই সাম্যবাদ কোথায়? আশা ভঙ্গের দুঃখ মনকে পীড়া দেয়।"[১৮] সাধারণ মানুষ চেয়েছিল পরিবর্তনের খোলা হাওয়ায় সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নেবার অধিকার। সুদীর্ঘ ২১ বছরে তাদের সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছিল বা হচ্ছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেবে ভাবীকাল।

রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছাপ ফেলে সমাজ জীবনে। কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রশাসকের স্বৈরাচার সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে, আরও বেশি বিপন্ন হয় মেয়েরা। '৭৭ সালের আগস্ট মাসে মহারাষ্ট্রে 'মথুরা' নামে এক সতের বছরের কিশোরীকে পুলিশের জনৈক সিপাই তুকারাম ধর্ষণ করলে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নারী সংগঠনগুলি সোচ্চার হয়ে ওঠে। সাংসদ গীতা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, '৮০ সালে যখন তিনি প্রথম পার্লামেন্টে যান, একদিন পার্লামেন্টে নোটিশ অফিসে দাঁড়িয়ে আছেন, বম্বে থেকে কিছু মহিলা আসে পার্লামেন্টে পিটিশন দিতে। মথুরা ধর্ষণ মামলায় সুপ্রীম কোর্টের বিরুদ্ধে এই পিটিশন। এই মকদ্দমায় প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্ট পুলিশের বিপক্ষে রায় দেয় কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে মামলাটি খারিজ হয়ে যায় কারণ বলা হয় মেয়েটি অসতী। গীতা মুখোপাধ্যায়কে তারা পিটিশন গ্রহণ করে পার্লামেন্টে পেশ করার অনুরোধ জানায়। এই পিটিশনের ফলেই কাস্টডিয়াল রেপের আইন পরিবর্তিত হয়। গীতা মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "সেই পিটিশনের মূলেই কিন্তু কাস্টডিয়াল রেপের আইন বদলে যায়। 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স

অ্যাক্ট' এর পরিবর্তন হল এবং 'ইন্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট-'এরও পরিবর্তন হল। ইন্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরে এই পরিবর্তন হল যে নিয়ম হচ্ছে যদি তুমি কারও বিরুদ্ধে মোকদ্দমা কর তাহলে যার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করবে, তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে দোষী কিন্তু এখানে কাস্টডিয়াল রেপের ক্ষেত্রে যে আইন আমরা পাশ করতে সমর্থ হলাম সে আইনে সেটা বদলে দেওয়া হল। যে লোকের বিরুদ্ধে কাস্টডিয়াল রেপের মোকদ্দমা হচ্ছে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে নির্দোষ। এটা একটা মস্ত বড় পরিবর্তন।"[১৯] ফলস্বরূপ ১৯৮০-তে ধর্ষণ আইনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করে পার্লামেন্টে 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেট বিল' পেশ করা হয় এবং ১৯৯৩-র সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলির প্রবল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে কোর্ট ধর্ষণ সংক্রান্ত শাস্তির অংশটুকু কঠোরতর করতে বাধ্য হয়—"সুপ্রীম কোর্টের রায়ে বলা হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৭ ধারা অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী, পুলিশ বা রেল কর্তৃপক্ষ, হাসপাতালের ডাক্তার বা কর্মী, নারী আশ্রমের কর্মী বা কর্তৃপক্ষ তাদের নিযন্ত্রণাধীন আশ্রিতা বা বন্দিনীকে ধর্ষণ করলে দোষী ব্যক্তির ন্যূনতম দশ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। এমনকি 'পারস্পরিক সম্মতিতে সহবাস' (মথুরা মামলায় নিম্ন আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট প্রথমে এরকমই রায় দিয়েছিল) করলেও দোষী ব্যক্তির পাঁচ বছর জেল হতে পারে (ভারতীয় দণ্ড বিধি, ৩৭৬ বি সি ডি)। আর সবচেয়ে বড় কথা এসব ক্ষেত্রে লাঞ্ছিতার বক্তব্যই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে (ভারতীয় সাক্ষ্য আইন ১১৩এ)"[২০]। ধর্ষণ আইনের ক্ষেত্রে এক মৌল পরিবর্তন ঘটল। আগে সে যে ধর্ষিতা হয়েছে, সেটা প্রমাণ করার দায় ছিল সেই ধর্ষিতা নারীর নিজের এবং আইনের মারপ্যাঁচে অভিযুক্ত অপরাধী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যেত। এই আইনে ধর্ষিতা নারীর বক্তব্যই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হল। মেয়েরা সমানাধিকার এবং আইনের চোখে 'মানুষ' হিসেবে সুবিচার পাবার আশায় ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। মেয়েদের সপক্ষে বিভিন্ন আইনও প্রণীত হতে লাগল। পণপ্রথার বিরুদ্ধে, বধূহত্যার বিরুদ্ধে আইন হল কিন্তু এই সমস্ত আইন সত্যিই কতটা সার্থক হয়ে উঠল মেয়েদের জীবনে! বাস্তবক্ষেত্রে এই সমস্ত আইনের সুফল কি মেয়েরা পেল! গীতা মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, পণপ্রথা, বধূহত্যার উপর অসাধারণ সব আইন পাশ হয়েছে কিন্তু সেগুলিকে কার্যকর করা বড়ই কঠিন। আইন করলেই শুধু হবে না, আন্দোলনের মাধ্যমে সেই আইনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—তবেই তার সুফল পাওয়া সম্ভব।

১৯৭৫-এ পালিত হল আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ। পরের বছর ১৯৭৬-এ 'ইকুয়াল রেমুনারেশন অ্যাক্ট' পাশ হয়ে সমান কাজের জন্য সমান মজুরীর দীর্ঘদিনের দাবি স্বীকৃতি হয়েছে। কাজের বিনিময়ে বেতন কাঠামো নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের অন্তত আইনগত দিক থেকে অবসান ঘটেছে। বাস্তবে সমস্ত ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কতটা হবে, কতদিনে হবে তা বোঝা বা জানা সত্যিই দুঃসাধ্য। তবুও আইনগত স্বীকৃতি পায়ের নীচের মাটিটাকে শক্ত করে, লড়াইয়ের ক্ষেত্রটিকে মজবুত করে তোলে। সেই প্রতিবাদী নারীর কথাই পাই আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে। ১৯৭৭-এ এই উপন্যাসটির জন্য মহিলাদের মধ্যে প্রথম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন আশাপূর্ণা দেবী। সেই সময়টাই ছিল

সচেতন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার, সংগ্রামের কাল। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নারীর অর্গল ভাঙার কাহিনী। সমাজ নামক অনড় পাঁচিলটির বাধা, পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর সুকঠোর স্থবিরত্ব বাধ্য করে মেয়েদের হেরে যেতে। তবুও তারা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে উঠে দাঁড়াতে চায়, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর জন্য পায়ের নীচে শক্ত মাটির খোঁজে লড়াই করে—পেতে চায় মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি। নারীর সংগ্রামের কাহিনীই আশাপূর্ণা দেবীকে এনে দিয়েছিল এই বিশেষ সম্মান।

প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা যায় থিয়েটারে, সিনেমায়। এর আগে একসময় দেশের কাজ করতে গিয়ে আর্ত-অসহায় মানুষের প্রয়োজনে থিয়েটারে এসেছিল মেয়েরা। ক্রমশ থিয়েটার হয়ে উঠল পেশা, জীবনের মূলমন্ত্র, নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাধ্যম। দেশভাগের পর জীবিকার প্রয়োজনে, উপার্জনের তাগিদে, অনেক মেয়েই থিয়েটারকে বেছে নিয়েছিল। জীবিকার অন্য কোন ক্ষেত্র খোলা না পেয়ে অনেক অল্প শিক্ষিত মেয়েরা অফিস পাড়ার নাটকগুলিতে অভিনয় করে উপার্জন করতে থাকে। যাত্রার অভিনয়েও এগিয়ে আসে অনেকে। ক্রমশ অভিনয়কে ভালবেসে ফেলে তারা। ষাট-সত্তরের দশক থেকে দেখা যায় উচ্চশিক্ষিত মেয়েরাও অভিনয়কে ভালবেসে কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিচ্ছে। বদলে যাচ্ছে অভিনয়ের ধরণ—শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধির ছোঁয়ায় নতুন রূপ পাচ্ছে শিক্ষিত, আধুনিক অভিনেত্রীদের অভিনয়। কলেজের অধ্যাপিকা কেয়া চক্রবর্তী শিক্ষকতা ছেড়ে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একটা সুনিশ্চিত সম্মানজনক জীবিকা ছেড়ে তিনি নাটকে এসেছিলেন নিজের ক্ষমতার শতকরা একশোভাগ দেবার জন্য। নিজের বক্তব্যকে নিজের মত করে বলার জন্য কেয়া নাটককে বেছে নিয়েছিলেন। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের নেওয়া এক বেতার সাক্ষাৎকারে, কেন নিয়মিত অভিনয় করতে শুরু করলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে কেয়া বলেছেন, "আসলে এই পড়াশুনো বা কলেজে চাকরি করার পরেও অনেকটা সময় এবং এনার্জি অবশিষ্ট থাকত।......আর যখন আমি কলেজে অধ্যাপনা করতাম, তখন সুযোগ পেলেই যে কথাগুলো বলা দরকার সেগুলো বলতাম। কিন্তু পরে প্রায়ই আমার মনে হতে থাকে যে এরকম একক প্রচেষ্টার চেয়ে নাটকে বলায় তো অনেক লোকের সাহায্য পাওয়া যায়, এবং এক ধরনের শুধু বুদ্ধির কাছে আবেদন না, আবেগের কাছেও আবেদন থাকে। নাটকের মাধ্যমেই বোধহয় সব কথা লোকের কাছে পৌঁছনো যায়। তাই আমি নাটক করতে এসেছি।"[২১] তাঁর মনে হয়েছিল এটাই সঠিক মাধ্যম, নিজেকে প্রকাশ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সমাজে মেয়েদের অবস্থা, পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান তাকে ভাবাত। একটি মেয়েকে সমাজে গোটা মানুষের মর্যাদা যে কখনও দেওয়া হয় না, এটা কেয়াকে যন্ত্রণা দিত। তাঁর অভিনীত নারী চরিত্রের মধ্যে কেয়া গোটা মানুষকে খুঁজতে চেয়েছেন। কেয়ার অভিনীত 'আন্তিগোনে' নাটকের এক জায়গায় আন্তিগোনে বলছে, "সারাটা জীবন ধরে কি আমি এই একটা ঘটনার জন্য লজ্জায় মরে যাই না যে আমি একটা মেয়ে? বাইরের এই বিরাট পৃথিবীতে আমার কোন অধিকার নেই, আমার কোন আদর্শে বিশ্বাস করার অধিকার নেই।"[২২] কেয়া বলেছেন, "পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধিকার সংকোচের বিরুদ্ধে এর চেয়ে তীব্র প্রতিবাদ আর কী হতে পারে?"[২৩] আন্তিগোনে বাস্তব, জাগতিক সুখ চায়নি। মহৎ আদর্শের সন্ধানে সে রত।

জীবনের নতুন অর্থ, অন্যতম অর্থ খুঁজতে চেয়েছিল সে। কেয়ার কথায়, "আন্তিগোনে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজতে চায়, আন্তিগোনে সুখের প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে একক প্রতিবাদ ঘোষণা করে। আন্তিগোনে বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্বপ্ন দেখে। তাই আমার আন্তিগোনেকে ভাল লাগে।"[২৪] এই বৃহত্তর মহত্তর জীবনের অন্বেষন করেছেন কেয়া তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যে। 'ভালো মানুষ' নাটকে কেয়ার অভিনীত চরিত্রের দুটি দিক শান্তা এবং শান্তা প্রসাদকে তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন একটি মেয়ের চরিত্রে। সমাজে শুধু ভাল হয়ে যে বাঁচা যায় না, 'ভালো মানুষ' নাটকে শান্তা বলে "আমি যখন মেয়ে হয়েছি নরম থেকেছি তখন কেউ আমাকে বাঁচতে দিতে চায়নি। সবাই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করতে চেয়েছে। যখন কড়া হয়েছি পুরুষের বেশ পরেছি তখন আমি বেঁচেছি।"[২৫] কেয়া নিজে বলেছেন, 'আমি এই দুটো চরিত্রের সমন্বয় চেয়েছি নারীর মধ্যে। যাকে কেউ অস্বীকার করার স্পর্ধা রাখবে না। জাঁ আনুইয়ের 'আন্তিগোনে' বহুস্তর নাটক। একটি স্তরে পুরুষপ্রধান সমাজের বিরুদ্ধে একটি মেয়ের একক বিদ্রোহ দেখতে পাই সেদিক থেকে আন্তিগোনে চরিত্র আমার চিন্তার অনেক কাছাকাছি।"[২৬] নাটকের চরিত্রের মধ্য দিয়ে কেয়া অনেক

কেয়ার নিজের কথায়, "মেয়েদের (এমনকি কখনো ছেলেদেরও) নাটকে অভিনয় করার ব্যাপারে আমাদের সমাজ খুব অনুদার, এখনও পর্যন্ত। ফলে অর্থনৈতিক চাপ ছাড়া, মানে বাধ্য না হলে মেয়েরা অভিনয় করতে আসেন না। আর শিক্ষিত মেয়েরা শুধু ভালোবেসে অভিনয় করবেন, সংসারের টাকার প্রয়োজন না থাকলেও, একথা তো কেউ ভাবতেই পারেন না।" "—কেয়া চক্রবর্তী, 'বাংলা নাটকে অভিনেত্রীর সমস্যা : একটি সাক্ষাৎকার", নিয়েছেন সুরজিৎ ঘোষ। 'কেয়ার বই' পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮২।

অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। নাটকের মাধ্যমটি তাঁর কাছে ছিল প্ল্যাটফর্মের মত। যখন অর্থনৈতিক চাপ ছাড়া সখে, ভালবেসে মেয়েদের অভিনয় করতে আসার কথা চিন্তাও করা যায় না, সেসময় অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে কেয়া এসেছিলেন নাটকের জগতে। শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত আধুনিক তরুণী নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে

কেয়ার কথায়, "আমরা যে সমাজটাতে বাস করি তা কোন সচেতন লোকের কাছেই সুস্থ বলে মনে হয় না। যে কোন সুস্থ লোকই চায় এই সমাজটা বদলাক। সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন হোক। অন্তত সচেতনতা বাড়ুক। নাটকের আবেদন মানুষের বুদ্ধি ও আবেগের কাছে। এমন নাটক যদি অভিনয় করতে পারি যাতে সমাজ-পরিবর্তনের কথা আছে, যা সত্যিকারের মানুষের মূল্যবোধকে নাড়া দিতে পারে তাহলেই আমার প্রচেষ্টা সার্থক।"—কেয়া চক্রবর্তীর শেষ সাক্ষাৎকার, নিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ সরকার, 'কেয়ার বই", পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০১।

সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখেছেন, সামাজিক ত্রুটি-বৈষম্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। নারী হিসেবে, পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, তাই 'আন্তিগোনে' তাঁর স্বপ্ন। 'ভালোমানুষ' এবং'আন্তিগোনে'তে অভিনয়ের জন্য পরপর দু'বছর (১৯৭৪—'ভালোমানুষ', ১৯৭৫—'আন্তিগোনে') নাট্য সাংবাদিকের সংস্থা 'দিশারী'র বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান কেয়া।

ষাট-সত্তরের দশকেও মেয়েরা থিয়েটারে অভিনয় করতে আসত মূলত অর্থের প্রয়োজনে, দারিদ্র্যের চাপে, কেয়া নিজেও সেকথা বলেছেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে। 'চাকভাঙা মধু'র 'বাদামী', 'বেলা অবেলা কালবেলার গল্পে'র, 'কম্যুনিস্ট জননী' চরিত্রের অভিনেত্রী মায়া ঘোষও অভিনয় করতে এসেছিলেন অভাবের তাড়নায়। ক্রমশ অভিনেত্রী মায়া ঘোষ প্রাণের তাগিদে, অভিনয়কে ভালবেসে হয়ে উঠেছেন শিল্পী—সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ সব চরিত্র। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ দর্শক যখন প্রশ্ন করে 'অভিনয়ে অমন মিশে যাওয়া কি করে সম্ভব! কী করে সম্ভব বাদামী, সুমতিদের সৃষ্টি!"[২৭] শিল্পী মায়া ঘোষ বলেন, 'শিল্পকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। তাই এমনটা সম্ভব হয়েছে।'[২৮] অর্থনৈতিক কারণে যে পেশাকে একদিন গ্রহণ করেছিলেন তার উত্তরণ ঘটেছে শিল্পের ত স্তরে। জীবন এবং শিল্প মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে—জন্ম হয়েছে শিল্পী অভিনেত্রী মায়া ঘোষের।

১ কমলা মুখোপাধ্যায়, অপ্রকাশিত দিনলিপি।
২ দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিচারের আশায় অর্চনা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫।
৩ মীনাক্ষী সেন, 'নকশাল দমনে পুলিশ কী করেছে : একটি দলিল', প্রতিক্ষণ, আগস্ট ১৯৯৭, পৃঃ ৩৯।
৪ কনক মুখোপাধ্যায়, "নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা" পৃঃ ২২৭।
৫ গৌতম নিয়োগী, 'অতীতের সঙ্গে কথোপকথন : স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস', ১৯৪৭-১৯৯৭, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয় ১৪০৪, পৃঃ ২১০।
৬ ফুলরেণু গুহ, "এলোমেলো মনে এলো", পৃঃ ৬৩।
৭ অরবিন্দ পোদ্দার।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জুলাই, ১৯৯৩।
৮ পূর্বোক্ত।
৯ মঞ্জরী গুপ্ত, 'দিকে দিকে গণ-অভিযান', 'একসাথে' বৈশাখ-১৩৮১।
১০ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৮।
১১ কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫০।
১২ কল্যাণী ভট্টাচার্য (প্রকাশক-গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পক্ষে কার্যকরী সভাপতি) ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ, পৃঃ ১০৬-১০৮।
১৩ অরবিন্দ পোদ্দার, 'ঘরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ ভিতরে', 'সাতদশক', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জুলাই ১৯৯৩, পৃঃ ৫।
১৪ পূর্বোক্ত।
১৫ জয়া মিত্র, হন্যমান, পৃঃ ১০০।
১৬ অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত।
১৭ ফুলরেণু গুহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২-৬৩।
১৮ ফুলরেণু গুহ, পৃঃ ৬৫।
১৯ গীতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৭.৪.১৯৯৮ তারিখে।

২০ দেবাংশু দাশগুপ্ত, 'মানহারা মানবী : কিছু তথ্য কিছু তত্ত্ব', "এবং এই সময়" শরৎ সংখ্যা ১৪০৫, পৃঃ ১৬৩।

২১ কেয়া চক্রবর্তীর বেতার সাক্ষাৎকার—নিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, "কেয়ার বই", সম্পাদনা : চিত্তরঞ্জন ঘোষ, পৃঃ ১৮৩-৮৪।

২২ কেয়া চক্রবর্তী, আন্তিগোনে প্রসঙ্গে', "কেয়ার বই", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৫।

২৩ পূর্বোক্ত।

২৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৬।

২৫ কেয়া চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, 'আলোর বৃত্তে : মঞ্চে', সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৮।

২৬ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬৯।

২৭ মুখোমুখি—মায়া ঘোষ—'জীবনের সঙ্গে মেশাতে হবে শিল্পকে' সাক্ষাৎকার—রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, গণশক্তি, ১০.৮.৯৩।

২৮ পূর্বোক্ত।

'৮০-র পরবর্তী—আকাঙ্ক্ষা? স্বপ্ন? নাকি অধিকার

বাঙালি মেয়েদের লেখা আত্মকথা-স্মৃতিকথায় সমকালের কথা খুঁজতে গিয়ে, মূলত উঠে এসেছে সময়ের অভিঘাতে বাঙালি মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ১৯৩০-এর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে অহিংস অসহযোগের পথে কারাবরণ-গ্রেপ্তার ছিল, তাদের অর্গল ভাঙা বা সংস্কার মুক্তির সূচনা মাত্র। তারপর '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগ, খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের এক একটি ধাক্কা—আগুনের লেলিহান শিখায় তাদের জীবনের সমস্ত বাহুল্য বিসর্জন দিয়ে নির্মেদ কঠিন বাস্তবের মাটিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আশির দশকের মেয়েরা জীবনযুদ্ধের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া, জীবনের হাত থেকে এরা ছিনিয়ে এনেছে বেঁচে থাকার অধিকার, সম্মানের অধিকার, জীবিকার অধিকার। উনিশ শতকের পুরুষ সঙ্গীর হাত ধরে অন্দরমহলের চৌকাঠ পার হওয়া, ভীত, বিনম্র নারী এরা নয়! জীবনযুদ্ধের জয়পতাকা এদের হাতে।

এতক্ষণ যা বললাম, তার কতকটা হয়ত সত্যি, কিন্তু এই একশো ভাগ সত্যের প্রতিফলন কি আজকের মেয়েদের জীবন? সত্যিই কি এই স্বাধীনতায় সুফল তারা জীবন দিয়ে অনুভব করছে? উনিশ শতকের শেষের আলোচনায় বলেছি সে যুগের নারীরা স্বাধীনতা সম্পর্কিত খণ্ডিত অস্বচ্ছ ধারণা সম্পর্কে। আজকের নারী '৮০-র মেয়েরা তো সে দোষমুক্ত। তারা জানে স্বাধীনতার অর্থ, আর্থিক স্বাধীনতা, স্বাধীন উপার্জনের অধিকার। তবু কি দেহে, মনে সত্যিই তারা নিজের অধীন? আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি সে অধিকার দিয়েছে মেয়েদের? সংবিধানের চোখে নারী পুরুষের কোন ভেদ নেই, তবুও তো আজ শিশুকন্যার তথা কন্যা-ভ্রূণের মৃত্যুর পরিসংখ্যান ভয়াবহ। দত্তক নিতে গেলে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষের মনে হয়, বেছে নেবার সুযোগ যখন আছে, ছেলেই ভাল। আজও ডাইনী সন্দেহে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে মেয়েদের। পণের কারণে বধূ হত্যা এখনও বন্ধ হয়নি। নারীকে অপমানিত করার অর্থ, ধর্ষণ—সংস্কারগত দিক থেকে তাকে অপবিত্র করে দেওয়া। ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় ধর্ষণ বিকৃত যৌন লালসার বহিঃপ্রকাশ, "তবে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন ধর্ষণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অন্যতম হাতিয়ার। সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জব্দ করার আদিম এক কৌশল। সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনে সরকার পক্ষের পুলিশ অথবা সেনারা বিদ্রোহী পরিবারের নারীর উপর বলাৎকার চালিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেবার চেষ্টা করে। আমাদের দেশে নাগাল্যান্ড, মনিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি অথবা অন্ধ্র-বিহারে পুলিশ-মিলিটারির এ ধরনের আচরণ বারবার লক্ষ্য করা গিয়েছে। এ রাজ্যেও সিঙ্গুর, বিরাটির গণধর্ষণের ঘটনায় শাসকদল তথা পুলিশের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিহিংসা নেবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সেনারাও এই একই কায়দায় কমিউনিস্ট গেরিলা পরিবারগুলির উপর নির্যাতন চালিয়েছে।"[১] তেভাগা আন্দোলনে নাচোলের কৃষক নেত্রী ইলা মিত্র, তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন, পুলিশ কোনভাবেই তাঁর স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে, তাঁকে ধর্ষণের

ভয় দেখায়। এবং শেষপর্যন্ত একসময় পুলিশের এক সেপাই বড়কর্তার হুকুমে তাঁকে ধর্ষণ করতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও বারবার দেখা গেছে, অন্য ধর্মের মেয়েদের ধর্ষণ করার মধ্যেই সাম্প্রদায়িক গুণ্ডারা সেই ধর্মের মানুষকে অপমান করার চরমতম পন্থা খুঁজে নিত। এবং ধর্ষণের পর যেভাবে ধর্ষিতাকে তার ধর্ষণের প্রমাণ দেখাতে হয় বা দিতে হয়, সেটি বোধহয় তার পক্ষে সবচেয়ে বেশি অবমাননাকর।

নারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় যে সে একটি নারী দেহের অধিকারী, সেও যে একটি মানুষ সেই পরিচয়টি নিতান্তই গৌণ হয়ে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিনোদিনী, অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র নারী হবার কারণে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন তাঁর পুরুষ সহকর্মীদের কাছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে কাননদেবীও বলেছেন একই কথা। আর বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন মেয়েরা সত্যিই এগিয়ে এসেছে বলে আমরা মনে করছি, তারা 'মেয়ে মানুষে'র অপমানজনক পরিচয়ের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দিয়ে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি, সে সময়ই '৮৭ সালের জুলাই মাসে ঘটে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। "তারকেশ্বরে মহিলা হোমগার্ড লক্ষ্মী চক্রবর্তী ধর্ষিতা হন নিজেরই সহকর্মীর হাতে" [২] —আমরা বুঝতে পারি, আইনের রক্ষক যখন নারী, তিনিও তাঁর পুরুষ সহকর্মীর কাছে হয়ে উঠতে পারেন শুধুমাত্র একজন 'মেয়েমানুষ'। ২২ অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন বেরোয়—নদীয়ার হোগলবেড়িয়া গ্রামে, বারবার ডাকাতের আক্রমণ হয়। ডাকাতরা শুধু গৃহস্থের সোনাদানা, জিনিপত্রই নেয় না, তাদের মেয়েদের উপরও অত্যাচার করে। সেই গ্রামের মেয়েদের তাই আশেপাশের অঞ্চলের মানুষ বিয়ে করতে চায় না। বিয়ে করে বৌ হিসেবে নিয়ে যাবার পক্ষে সেই নারী দেহগুলি যথেষ্ট পবিত্র নয়। এই তো আমাদের সমাজ। সবশেষে তাই মনে হয়, পরিসংখ্যান বলছে খাতায় কলমে নারী-পুরুষের কোন ভেদ নেই। জীবিকার কোন ক্ষেত্রেই মেয়েরা আজ পিছিয়ে নেই। তবুও জীবনের ক্ষেত্রে চাকুরিজীবী স্ত্রী এবং স্বামী কি একই সম্মানের, একই সুবিধার অধিকারী? তাদের সামাজিক অবস্থান কি এক? আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক নিরাপত্তা কি মেয়েদের পূর্ণ মানুষের মর্যাদা কোনদিন এনে দিতে পারবে? এ দোষ কার—পুরুষের, নারীর, না এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোটির? এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোই এক অদৃশ্য শক্তির মত নিয়ন্ত্রিত করছে নারীকে। 'Patriarchy' তো সমাজের সর্বস্তরে। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, শুধু জীবনের বিভিন্ন স্তরেই নয়, তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের মধ্যেও কিভাবে বাসা বেঁধে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতা। তাঁর নিজের কথায়, "স্বাধীনতার সময় ছাত্র আন্দোলনে একটা মস্তবড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম। এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এক শক্তিশালী সংগঠন ছিল তৎকালে। আমি বলাই বাহুল্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলাম, কমিউনিস্ট পরিষদ, রাজ্য পরিষদ, রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলাম। এখন মেয়েদের যে কিভাবে দেখেন, এমনকি এই প্রগতিশীল কমিউনিস্টরাও অনেকে, তার একটা উদাহরণ দিলে বুঝবে। সবাই যে এক রকম তা নয়, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ ছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের কনফারেন্স হবে।

কনফারেন্স হবে মানেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের নতুন সভাপতি, নতুন প্রেসিডেন্ট হবে। আমাদের ছাত্রদের দেখাশোনা করতেন পার্টির তরফ থেকে যে নেতা রমেন ব্যানার্জি—রমেনদা একদিন আমায় ডেকে বললেন গীতা রংপুরে কনফারেন্স করতে যাচ্ছ তো.............আমার ইচ্ছা যে তুমি জেনারেল সেক্রেটারী হও আর গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্ট। আমি বললাম 'দেখুন রমেনদা কে প্রেসিডেন্ট হল আর কে সেক্রেটারী হল আমার তাতে কিছু বলার নেই। আপনি যা ভাল মনে করবেন তাই করুন..........তারপর বহুকাল পর্যন্ত আমি জানি না কি হয়েছিল।' কিছুকাল আগে একদিন গৌতম আমায় হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, গীতাদি তুমি জান আমাদের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী হওয়া নিয়ে রাজ্য পরিষদে কি আলোচনা হয়েছিল?' আমি বললাম, 'না, ভাই আমি জানি না'। 'রমেনদা তো এই প্রস্তাব করলেন, তখন কিছু কমরেড তারা বললেন একজন মেয়ে সে সেক্রেটারী হতে পারবে কি?' তখন মনি সিং ছিলেন, তিনি তাদের বাপ বাপান্ত করে গালি দিলেন, বললেন 'কিসের কমিউনিস্ট আপনারা, অনেক কষ্টে একটা মেয়ে আপনাদের উঠেছে। ছাত্র আন্দোলনে যে মেয়েটি জায়গা করে নিতে পেরেছে তাকে জেনারেল সেক্রেটারী করতে আপনাদের ভয় হচ্ছে। কি কাণ্ড?' তখন সবাই চুপ করে গেলেন। মানসিকতা কি, সেটা লক্ষ্য করা দরকার।"[৩] স্বাধীনতার ঠিক আগে যখন গীতা মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র আন্দোলনে একটি পরিচিত নাম, সেসময় রংপুর কনফারেন্সে তাঁকে জেনারেল সেক্রেটারী করার কথা হলে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্যই আপত্তি জানিয়েছিলেন। একটি মেয়েকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে মনে হয়নি তাঁদের। একই ছবি স্বাধীনতার পরেও। বাইরের স্বাধীনতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মানস মুক্তিতে বিশেষ সাহায্য করতে পারেনি। গীতা মুখোপাধ্যায় নিজেও বলেছেন, "স্বাধীনতার পর একই জিনিস দেখছি। আমাদের পার্টির 'higher body' তে মেয়ে আমরা ক'জন আনতে পেরেছি?"[৪] এবং ১৯৯৮-তেও একই কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে। ২৬.১০.৯৮ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকায়, 'Geeta blasts male Comrades' শিরোনামে সংবাদদাতা বলছেন, 'Veteran CPI leader Mrs. Geeta Mukherji has said that their male Comrades are reluctant to share power with women' এবং তিনি মনে করেন "We have been able to pershade the male leadership to accept the need to promote the women to position of decision."[৬] এটি নারীর পুরুষ বিদ্বেষ নয়, কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় বেড়ে ওঠা নারীও তো সেই মানসিক জড়ত্বের উত্তরাধিকারী। আর শৈশব থেকে যে অভ্যাস তার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেই অভ্যাসই জন্ম দিয়েছে মানসিক জড়ত্বের, স্থবিরত্বের। আজও বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মেয়েরা পুরুষের হাত ধরে চৌকাঠ পেরোতেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করে—নিজের শক্তিতে, নিজের ক্ষমতায় ততটা নয়। মেয়েদের এই পরনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোরই দান। এই সমাজ কাঠামোরই ফসল বাঙালি মেয়ের মানসিক জড়ত্ব। অনেক আপাত অগ্রগতি সত্ত্বেও, যার থেকে আজও তার মুক্তি ঘটেনি, বেরনো সম্ভব হয়নি। আদৌ কোনদিন হবে কি? যে

৫০ বছরের ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করছি, যদি তার আগের ৫০ বছরের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখা যাবে—তখনকার মেয়েরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এই ১০০ বছর পরে আজও তারা সেখানেই রয়ে গেছে, এক পাও এগোয়নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে স্বাধীন মনস্ক নারী, জীবনযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী, কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখী বা তাঁদের মত আরও কেউ কেউ ছিলেন নেহাতই ব্যতিক্রম। সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে যে তাঁদের কোন যোগ ছিল না, তা আমরা আগেই দেখেছি। আজও কি ব্যতিক্রমী নারী, স্বাধীন চিন্তা চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বময়ী নারী, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মানসে নিজের স্বাভাবিক জায়গাটি খুঁজে পায়? পায় না কারণ সে যে কোন খোপেই আঁটে না। কোন প্রকোষ্ঠের মাপ মতই যে সে নিজেকে গড়ে পিটে নিতে পারে না, সে যে তার নিজের মত।

ইতিহাসের দিক থেকে, সময়ের পরিবর্তনের দিক থেকে বিচার করলে, পরবর্তী অর্ধশতক অনেক বেশি ঘটনাবহুল, ঘাত-প্রতিঘাতে সমাচ্ছন্ন। একের পর এক ধাক্কায় সামাজিক রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে অনেক বেশি বদলে দেওয়া সময়। তবুও সেই সময়, সময়ের অভিঘাত সত্যিই কতটা এগিয়ে দিতে পেরেছে মেয়েদের? নিজের সময়ের কথা বলতে গিয়ে গীতা মুখোপাধ্যায় বলছেন যে স্বাধীনতার আগে তিনি যখন রাজনীতিতে এসেছেন, সে সময় যে সমস্ত মেয়েরা রাজনীতিতে আসত তাদের নানা কথা শুনতে হত। চরিত্র নিয়ে কথা শুনতে হত। তখন মেয়েরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছে, ফলে গ্রামাঞ্চলেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবুও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গোঁড়ামি তো ছিলই, রক্ষণশীলতাও ছিল। মেয়েরা যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, যে দলে প্রবেশ করছে, সেখানে তাদের স্বীকৃতি পাওয়াও খুব কঠিন ছিল। এখনও তো তা সহজ হয়নি। "তাহলে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে পঞ্চায়েতে মহিলাদের এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের ভিতর দিয়ে দশ লক্ষ মেয়ে নির্বাচিত হয়েছিল সেটা পাশ করা গিয়েছিল কিন্তু যেখানে বড় জোর

> *"Mrs Mukherji said she advocates reservation because if there was no reservation, the parties would nominate women only to losing seats. This problem, exists in the CPI too. Geeta Mukherji—'Geeta blast male Comrades.'—The Statesman 26.10.98.*

হাজারখানেক মেয়ে নির্বাচিত হবে বিধানসভা এবং লোকসভায়, সেখানে কিন্তু পারা যাচ্ছে না। নানান কথার আমদানি হয়ে যাচ্ছে একে কেন্দ্র করে। এর আসল কারণ তো হচ্ছে নেতারা চাননা মেয়েরা ব্যাপকভাবে আসুক। আরেকটা কারণ হচ্ছে, পাছে নিজেদের সিট যায়। কিন্তু পঞ্চায়েতের সময় এটা নিশ্চয়ই আমাকে বলতে হবে এই মনোভাব প্রবলভাবে ছিল কিন্তু অন্ততপক্ষে ঐ আইনটাকে রুখে দাও, এই পর্য্যায়ে পৌঁছায়নি।"[৭] তাঁকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম যে, সংরক্ষণের মাধ্যমে এগিয়ে আসা কি মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক? তিনি বলেছিলেন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো কখনই তাদের এগিয়ে আসতে দেবে না। তাই তাদের জায়গা করে দেবার জন্য, এগিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজনে তিনি মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন

সংরক্ষণের কথা বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন, "Women have been doing excellent work in the panchayats. So why should they not be able to

'Mrs Mukherji who has been leading the movement to ensure one-third representation of women in Parliament and State Assemblies, altributed their meagre presence at the top to the patriarchial setup of the left parties and the "reluctance" of her male comrades to admit them in this decision making bodies within the CPI at the all-India level'. "Geeta blasts male Comrades" PTI—The Statesman—26.10.98.

perform with equal aplomb at the assembly and parliament levels?"[৮] পূর্ববর্তী অর্ধ শতাব্দীতে মেয়েরা জীবনসংগ্রামে ব্রতী, জীবনে প্রতিষ্ঠা চেয়েছে, অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে জীবনযুদ্ধে জয়ীও হয়েছে। কিন্তু মূলস্রোতের সঙ্গে তাদের কোন যোগ ছিল না। ১৯৮০-তে পাই সময়ের অভিঘাতে বদলে যাওয়া সংগ্রামী নারীকে। তবে '৮০-তেও তো সে মূলস্রোতে মিশতে পারে না, নিজস্বতা বজায় রেখে জায়গা করে নিতে পারে না মূল কাঠামোর অন্তরে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। সবাই যে তাকে নিজের নিজের মাপে গড়ে পিটে ঠিক করে নিতে চায়। সে নিজেও বোধ হয় স্বস্তি বোধ করে কোনও মাপ মতো নিজেকে ঘষে মেজে মানানসই করে নিতে পারলে। তার পথের সবচেয়ে বড় বাধা তার নিজের মানসিক দ্বিধা, স্থবিরত্ব। এর থেকে মুক্তি যে তার আজও ঘটেনি। বরং আজ সে সাজে-পোষাকে-আচারে-বিচারে নিজেকে চূড়ান্ত আধুনিক করে তুলতে গিয়ে ক্রমশ আরও পণ্য করে তুলেছে, করে তুলেছে বিজ্ঞাপনের সামগ্রী, commodity। মনে করে পুরুষ তাকে যতটা প্রসাদধন্য করে, ততটাই তার কাম্য, তার বেশি চাইতে সে পারে না। পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও এই মানসিকতা মেয়েদের ছিল না, নিজের জায়গা খুঁজতে গিয়ে সে হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি প্রতিবাদী। '৭০ দশকে নিজের জীবন তুচ্ছ করে, নিরাপত্তাকে অগ্রাহ্য করে তারা বেছে নিয়েছিল নতুন বিপ্লবের জীবন। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন, নতুন যুগ, নতুন প্রজন্ম, নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির যন্ত্রণা তাকে স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি—ঘর ছেড়েছিল সে, সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল, ভয় পায়নি জীবনের ঠুনকো সম্মানের। ক্রমশ পরবর্তী সত্তর ও আশির দশকে বাঙালি যুবশক্তি, তরুণ-তরুণী, কিশোর-কিশোরীরা হারিয়ে ফেলল প্রতিবাদের ভাষা, হয়ে উঠল অনেক বেশি স্বার্থ সচেতন, আত্মকেন্দ্রিক, পণ্যমনস্ক। একবিংশ শতকের দ্বারপ্রান্তে আজকের নারী তো বিজ্ঞাপনের পণ্য। পাষাণ মুক্তির স্বপ্ন অহল্যা আজ আর দেখে না। তার চোখে নেই বিপ্লবের আগুন, বুকে নেই তার জ্বালা। প্রতিবাদ, বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে, লড়াই করার পরিবর্তে অধিকার আদায়ের পরিবর্তে হয়ে উঠছে আপোষকামী। 'নারী চায় মনুষ্যত্বের অধিকার' প্রবন্ধে মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আমরা যখন পড়াশুনা করছি পঞ্চাশ-ষাটের দশকে—তখন খুব কম বিবাহিত মেয়ে ক্লাসে (স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত) দেখতাম। পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেছে, এটা আমাদের ভাল লাগত না। বেশ কয়েক বছর ধরেই পড়াতে গিয়ে দেখছি ১৬।১৭ বছরের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁরা উত্তর দিয়েছেন, দিনকাল ভাল না, মেয়ে কি করবে কি জানি? অথবা ভাল ছেলে পেয়ে

গেলাম হাতছাড়া করি কিভাবে? শুনে ভেবেছি আমরা মেয়েরা কি তাহলে বিক্রি হয়ে যাচ্ছি? ভাল বাজার দর পাওয়া গেছে এই সময় বিক্রি করে দিই, পরে আবার পাওয়া যাবে কিনা কে জানে? মেয়ে কি করবে কি জানি? কেন নিজের সন্তানকে বিশ্বাস করি না? কেন স্বাধীনভাবে নিজের জীবনসঙ্গীকে বেছে নিতে দিই না? উত্তর পাই ওরা ছোট, ওদের বুদ্ধি নেই, ওরা কি ঠিকমত বাছতে পারবে? ওরা ছোট তাই ওদের কাঁধে একটা সংসারের জোয়াল চাপিয়ে দিলাম, ঐ ছোট কাঁধ তা বহন করতে পারবে কিনা তাও ভাবলাম না।"[৯]

স্বপ্ন দেখা তবু তো বন্ধ হয় না। মনে হয় নিজস্বতা হারানো, মূল্যবোধ হারানো কৃত্রিমতার স্রোতে গা ভাসানো মৃত নারীর ধ্বংস স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মত আবার কি জেগে উঠবে না, নতুন নারী, নতুন মানুষ। গড্ডলিকা প্রবাহে গা না-ভাসিয়ে যে অন্য রকম কিছু ভাববে, নতুন কিছু করার স্বপ্ন দেখবে। ব্যতিক্রমী চরিত্র আজও আছে একটি দুটি, যারা নিজের মত করে কিছু করতে চায়। নিজের ভাবনায়, কাজের একটি আলাদা জগৎ গড়তে চায় এবং এইভাবেই তারা আঘাত হানতে চায় এই মিথ্যে দিয়ে গড়া কাঁচের স্বর্গে। জয়া মিত্র বলেছেন, নদীতে জোয়ার আসার আগে জলে যেমন একটি বিশেষ কম্পন উপস্থিত হয়, সমাজ জীবনে আবার যেন তিনি তেমনই কম্পন অনুভব করছেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের ত্রিশ বছর পর আবার যেন তারুণ্য জেগে উঠেছে অন্যপথে, অন্যভাবে। তাদের অনেকেই হয়তো ভবিষ্যৎ তৈরির ইঁদুর দৌড়ে জীবনের সমস্ত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছে, তবুও সবাই এক নয়। এখনও তারা স্বপ্ন দেখে, সমষ্টিগতভাবে আন্দোলনের পথে না গেলেও একক প্রচেষ্টায় নানাভাবে এগিয়ে আসছে তারা। তাঁর মতে এক থেকেই জন্ম হয় সমষ্টির, তাই তাদের একক ব্যক্তিগত প্রয়াস আবার একদিন সমাজটাকে নতুন করে তুলবে, বদলে দেবে ঘুনধরা কাঠামোটিকে।[১০] মেয়েরা থামবে না, তারা এগিয়ে চলবে প্রাণধর্মের স্বতস্ফূর্ততায়। এখন হাঁটতে হবে অনেক অনেক পথ। বাধা তো শুধু বাইরের নয়, বাধা যে রয়েছে তার অন্তরে, হৃদয়গত সংস্কারে, ভাবনায়—তার থেকে মুক্তি পেতে হবে তাকে। অন্বিষ্ট 'আমি' কে খুঁজে পেতে গেলে অতিক্রম করতে হবে যে নিজেকেই।

১ দেবাংশু দাশগুপ্ত, 'মানহারা মানবী : কিছু তথ্য কিছু তত্ত্ব', "এবং এই সময়", ১৪০৫, । পৃঃ ১৬৪-৬৫।
২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২।
৩ গীতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৭.৪.৯৮ তারিখে।
৪ পূর্বোক্ত।
৫ PTI, The Statesman dt. 26 October 1998.
৬ পূর্বোক্ত।
৭ গীতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২৭.৪.৯৮ তারিখে।
৮ Geeta Mukherji—Geeta blasts male Comrades—The Statesman 26.10.98.
৯ মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, 'নারী চায় মনুষ্যত্বের অধিকার', 'কোরক', শারদীয় ১৪০৪, পৃঃ ১৯৪-৯৫।
১০ জয়া মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৭.৯.৯৮ তারিখে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। আচার্য অনিল (সম্পাদক)—১৯৮০, ১৯৯৪—"সত্তর দশক" (১ম খণ্ড) অনুষ্টুপ, কলকাতা।

২। আচার্য অনিল (সম্পাদক)—১৯৮২,—"সত্তর দশক" (২য় খণ্ড)—অনুষ্টুপ—কলকাতা।

৩। আচার্য পঙ্কজ—১৯৮৩, —"নির্বাচিত রচনা"—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি—কলকাতা।

৪। Asthana Pratima—1974 "*Women's Movement in India*"—Vikas—Delhi.

৫। ইব্রাহিম নীলিমা—১৯৭৯, ১৯৮৬—"শতাব্দীর অন্ধকারে"—মুক্তধারা—ঢাকা, বাংলাদেশ।

৬। ইমাম জাহানারা—১৯৮৬, ১৯৯০—"একাত্তরের দিনগুলি"—সন্ধানী প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

৭। ইমাম জাহানারা—১৯৯১—"ক্যান্সারের সাথে বসবাস"—আফসার ব্রাদার্স—ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮। 'Introduction, Unemployment among women in West Bengal'——1958——Directorate of National Employment Service, West Bengal.

৯। ওয়াদ্দেদার প্রীতিলতা—১৯৭৪—'Long Live Revolution', "চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা", সম্পাদক—শচীন্দ্রনাথ গুহ—শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম পরিষদ—কলকাতা।

১০। ওমর বদরুদ্দীন—১৯৪৮—"ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন"—নিয়ত প্রকাশন—কলকাতা।

১১। ওমর বদরুদ্দীন—১৯৭১—"পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" (প্রথম খণ্ড),—আনন্দধারা প্রকাশন—কলকাতা।

১২। ওমর বদরুদ্দীন—১৯৮৫—"মার্কসীয় দর্শন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ"—প্রগতি প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩। কৌর অজীত—১৯৯৩—"জিপসি নদীর ধারা" অনুবাদ : জয়া মিত্র —সাহিত্য অকাদেমি—কলকাতা।

১৪। Custers Peter—1987—"*Women in The Tebhaga uprising. Rural Poor Women and revolutionary leadership 1946-47*"—Naya prakash, Calcutta.

১৫। Karlekar Malvika—1991—"*Voices from within*"—Early Personal narrative of Bengali Women—Oxford University press—Delhi.

১৬। Karlekar Malavika—1980—'*Birds in a Cage-changes in Bengal Social life as recorded in Autobiography*'.—Economic and Political weekly, vol. XXI, No. 43, Oct. 25.

১৭। Koph David—1979—"*The Brahmo Samaj and the Shaping of the modern Indian mind*", Princeton University Press—Princeton.

১৮। কায়সার পান্না—১৯৯১, ১৯৯৩—"মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে"—আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৯। কায়সার শমী—১৯৯১—"বাবার কথা"—আগামী প্রকাশনী—বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২০। খাতুন রাবেয়া—১৯৯১, ১৯৯২—"একাত্তরের নয়মাস"—আগামী প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

২১। খাতুন সৈয়দা মানোয়ারা—১৩৯৬,—'স্মৃতির পাতা'—'এক্ষণ', শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬, কলকাতা।

২২। গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতচন্দ্র—১৩৫২—"বাংলার নারী জাগরণ"—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—কলকাতা।

২৩। গুপ্ত ধ্রুব—১৯৯২—'সত্যজিৎ চলচ্চিত্রে নারী'—'নন্দন' জুলাই ১৯৯২, কলকাতা।

২৪। গুপ্ত শৈবালকুমার—১৯৯৪—"কিছু স্মৃতি কিছু কথা"—এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

২৫। গুহ ফুলরেণু—১৯৯৭—"এলোমেলো মনে এলো"—অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল মাস এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট—কলকাতা।

২৬। গুহ ফুলরেণু—১৯৮৫—"প্রসঙ্গ : নারী ও সমাজ"—'পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি'—কলকাতা।

২৭। গুহ বীণা—১৯৯৩—'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে দিনাজপুরের কৃষক মেয়েদের ভূমিকা ও তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা'—'চলার পথে', মার্চ—১৯৯৩, কলকাতা।

২৮। গুহ বীণা—১৯৯৩—'হাজং নেত্রী রাসমণি'—'চলার পথে', ১৯৯৩, কলকাতা।

২৯। গুহ নলিনীকিশোর—১৩৭৬—"বাংলার বিপ্লববাদ"—এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩০। গুহঠাকুরতা বাসন্তী—১৯৯১—"একাত্তরের স্মৃতি"—ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড—ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩১। গুহঠাকুরতা বাসন্তী—১৯৯৪—"কালের ভেলায়"—ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড—ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩২। ঘটক সুরমা—১৩৮৪—"ঋত্বিক"—আশা প্রকাশনী—কলকাতা।

৩৩। ঘটক সুরমা—১৯৯০—"শিলং জেলের ডায়েরি"—অনুষ্টুপ প্রকাশনী—কলকাতা।

৩৪। ঘোষ ইন্দুসুধা—১৩৯৫—'যে আগুন নেভে না', একসাথে—বৈশাখ-১৩৯৫—কলকাতা।

৩৫। ঘোষ কালীচরণ—"জাগরণ ও বিস্ফোরণ"—কলকাতা।

৩৬। ঘোষ চিত্তরঞ্জন (সম্পাদক)—১৯৮১—"কেয়াব বই"—নান্দীকারের পক্ষে সুব্রত পাল—কলকাতা।

৩৭। ঘোষ নির্মল—১৩৮৮, ১৪০১—"নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা কথা সাহিত্য"—করুণা প্রকাশনী—কলকাতা।

৩৮। ঘোষ শঙ্কর—১৯৭৫—"স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন"—সাহিত্য সংসদ—কলকাতা।

৩৯। ঘোষ শঙ্খ—১৯৯৭—'তিমির', 'অধুনা জলার্ক', জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৭, সম্পাদক : স্বপন দাসাধিকারী—কলকাতা।

৪০। ঘোষ শঙ্খ—১৪০১—"এখন সব অলীক"—দে'জ পাবলিশিং—কলকাতা।

৪১। ঘোষ শান্তিসুধা—১৩৯৬—"জীবনের রঙ্গমঞ্চে"—কলকাতা।

৪২। ঘোষ শোভা—১৯৮১—"আজও তারা পিছু ডাকে"—বরিশাল সেবা সমিতি—কলকাতা।

৪৩। ঘোষ শ্রবসী—১৩৯২—'দায়মালীর কারাগার ভাঙার গান'—শারদীয় অনুষ্টুপ—কলকাতা।

৪৪। চন্দ রাণী—১৯৪২, ১৯৮৩—"আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"—বিশ্বভারতী—কলকাতা।

৪৫। চন্দ রাণী—১৯৮৩, ১৯৮৭—"জেনানা ফটক"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

৪৬। চন্দ রাণী—১৯৭৮—"পথে ঘাটে"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

৪৭। Chakraborty Dr. (Mrs) Usha—1963—*"Condition of Bengali women Around the 2nd Half of the 19th Century"*—Published by author—Calcutta.

৪৮। চক্রবর্তী দীপঙ্কর, খাসনবিশ রতন (সম্পাদক)—১৯৮৯—"অনীক পঁচিশ বছর—স্মারকগ্রন্থ"—প্রকাশক—দীপঙ্কর চক্রবর্তী—খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

৪৯। চক্রবর্তী পুণ্যলতা—১৯৫৮—"ছেলেবেলার দিনগুলি"—নিউজস্ক্রিপ্ট—কলকাতা।

৫০। চক্রবর্তী রেণু—১৯৮০—"ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা—(১৯৪০-১৯৫০)", অনুবাদ—পুষ্পময়ী বোস ও মণিকুন্তলা সেন—মনীষা—কলকাতা।

৫১। চক্রবর্তী রেণু—১৯৮৭—'সুধাদি স্মরণে', 'চলার পথে', জুলাই-১৯৮৭, কলকাতা।

৫২। চক্রবর্তী সুকৃতি—১৯৯৬—'নটরাজের নাট্যশালে', 'দেশ', ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬—কলকাতা।

৫৩। চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র—১৯৭৭, ১৯৮১—"বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা" (১ম ও ২য়)—অনুষ্টুপ—কলকাতা।

৫৪। চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু—১৯৮৪—'বিস্মৃত প্রায় শ্রমিক নেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্তা', চলার পথে, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৪—কলকাতা।

৫৫। চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু—১৯৮৭—'ধাঙড় ধর্মঘট (১৯৪০) ও বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জেদা', চলার পথে, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৭—কলকাতা।

৫৬। চট্টোপাধ্যায় মঞ্জুষা, চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ—১৯৯৫—'শেষ রাতের ঘটনা ও অনেক ভালবাসার স্মৃতি', "স্মৃতিসত্তা সরোজ দত্ত", সম্পাদনা : স্বপন দাসাধিকারী।

৫৭। চট্টোপাধ্যায় মায়া—১৯৯৪—'সেই দশকের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎ', "সেই দশক", সম্পাদনা : পুলকেশ মণ্ডল, জয়া মিত্র,—প্যাপিরাস—কলকাতা।

৫৮। চট্টোপাধ্যায় শাখী—১৯৯২—'সত্যজিতের ছবিতে নারী'—'মনোরমা', মে, ১৯৯২,—কলকাতা।

৫৯। চট্টোপাধ্যায় সাবিত্রী—১৯৯২—'মঞ্চ, পর্দা ও জীবনকথায় সাবিত্রী', আলোকপাত, আগস্ট ১৯৯২—কলকাতা।

৬০। চ্যাটার্জী প্রভা—১৪০১—'তেভাগা আন্দোলনের দিনগুলিতে', 'একসাথে' বৈশাখ-১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক সংখ্যা—কলকাতা।

৬১। চৌধুরাণী অমিয়া—১৯৯২—"দিদিমার যুগ ও জীবন"—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

৬২। চৌধুরাণী অমিয়া—১৯৯৪—"প্রবাসিনী দিদিমা"—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

৬৩। চৌধুরাণী ইন্দিরা দেবী—১৩৬৫, ১৩৮০—"নারীর উক্তি"—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ—কলকাতা।

৬৪। চৌধুরাণী ইন্দিরা দেবী—১৩৯৯, ১৪০০—'জীবন কথা'—এক্ষণ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৯, ১৪০০—কলকাতা।

৬৫। চৌধুরী মতিয়া—১৩৭৯—"দেয়াল দিয়ে ঘেরা"—নবপত্র প্রকাশন—কলকাতা।

৬৬। চৌধুরাণী সরলাদেবী—১৯৭৫—"জীবনের ঝরাপাতা"—রূপা অ্যান্ড কোম্পানী—কলকাতা।

৬৭। চৌধুরী সলিল—১৯৯৬—"জীবন উজ্জীবন"—প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা

৬৮। চৌধুরী সুপ্রভা—১৯৯৬—"পুরোনো দিন পুরোনো কথা"—সমতট প্রকাশন—কলকাতা।

৬৯। চৌধুরী হেনা—১৯৯৪—'ঝাঁসি বাহিনীর রাণীরা', চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ২২ জানুয়ারি—১৯৯৪—কলকাতা।

৭০। Chapman Pricilla—1839—"Hindoo Female Education", —Published by R. B. Seeley and W. Burnside—Fleet Street, London.

৭১। জোশী (দত্ত) কল্পনা—১৯৯০—"চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান"—প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার—পাটিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী।

৭২। জোশী (দত্ত) কল্পনা—১৩৯৯—'স্মৃতিকথা'—'এক্ষণ' শারদীয় ১৩৯৯—কলকাতা।

৭৩। Jha Rama (Ed.)—1989—"*Women with a mission—Rajkumari Amrit Kaur*"—All India Women's Conference—New Delhi.

৭৪। ঠাকুর প্রতিমা—১৩৪৯—"নির্বাণ"—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়—কলকাতা।

৭৫। তুলপুলে মালিনী—১৩৬২—'গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম', 'ঘরে বাইরে" ভাদ্র ১৩৬২—কলকাতা।

৭৬। দত্ত চারুবালা—১৯৮২—"চলার পথে দিনলিপি" (প্রথম খণ্ড)—সাহিত্য সংসদ—কলকাতা।

৭৭। দত্ত সন্দীপ—১৯৯০, ১৯৯৭—"বাংলা কবিতার কালপঞ্জি" (১৯২৭-১৯৮৯) ইম্প্রেশন—কলকাতা।

৭৮। দত্ত ভার্মা উষা—১৯৯৩—"দিনগুলি মোর"—বিশ্বজ্ঞান—কলকাতা।

৭৯। দত্তগুপ্ত বেলা—১৪০৪, 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ', একসাথে বৈশাখ ১৪০৪—কলকাতা।

৮০। Das Kamala—1988, 1991—*"My Story"*—Sterling Publisher Pvt. Ltd.—New Delhi.

৮১। দাশ বীণা—১৩৫৫, ১৪০২—"শৃঙ্খল ঝঙ্কার ও অন্যান্য"—জয়শ্রী—কলকাতা।

৮২। দাশ শান্তি—১৩৫৮—"অরুণবহ্নি"—বেঙ্গল পাবলিশার্স—কলিকাতা।

৮৩। দাস সুস্নাত—১৯৮৯—"ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা"—প্রাইমা পাবলিকেশনস্—কলকাতা।

৮৪। দাস হেনা—১৯৯১—'হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সিলেটের গণনাট্য আন্দোলন', ঋক, হেমাঙ্গবিশ্বাস স্মরণ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড), জানুয়ারি-জুন ১৯৯১—কলকাতা।

৮৫। দাসাধিকারী স্বপন (সম্পাদক)—১৯৯৫—"স্মৃতি সত্তা সরোজ দত্ত"—জলার্ক প্রকাশন—বাকসাড়া, হাওড়া।

৮৬। দাসাধিকারী স্বপন (সম্পাদক)—১৯৯৭—"এবং জলার্ক"—জলার্ক প্রকাশন—কলকাতা।

৮৭। দাশগুপ্ত অলোকরঞ্জন—১৯৯৭—'স্মৃতিচর্যা ও মূল্যবোধ', 'অধুনা জলার্ক', জানুয়ারি ১৯৯৭—মার্চ ১৯৯৭—কলকাতা।

৮৮। দাশগুপ্ত (সেন) উমা—১৯৯২—'লাইম লাইটে থেকে গেলাম একটা ছবি করেই' দেশ, মার্চ ১৯৯২—কলকাতা।

৮৯। দাশগুপ্ত কমলা—১৯৫৮, ১৯৯৫—"রক্তের অক্ষরে"—সাহিত্য সংসদ—কলকাতা

৯০। দাশগুপ্ত কমলা—১৩৭০, ১৩৯৬—"স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী"—জয়শ্রী—কলকাতা।

৯১। দাশগুপ্ত দেবাংশু—১৪০৫—'মানহারা মানবী', এবং এই সময়, শরৎ সংখ্যা, ১৪০৫—কলকাতা।

৯২। দাশগুপ্ত মানসী—১৩৮১—"কম বয়সের আমি"—রামায়ণী প্রকাশ ভবন—কলকাতা।

৯৩। দাশগুপ্ত মানসী—১৯৯৫—"নানাজনের মেলায় তুমি"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

৯৪। দাশগুপ্ত মৃণালিনী—'আমার রাজনৈতিক চেতনা ও বিকাশ' (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)।

৯৫। দাশগুপ্ত রনেশ—১৯৯৪—"সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা—উত্থক প্রকাশনী—কলকাতা।

৯৬। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৪—'তেভাগা আন্দোলনই প্রথম গ্রামের নারী সমাজকে জাগিয়ে তুলেছে'—গণশক্তি ১৯ ফেব্রুয়ারি—১৯৯৪—কলকাতা।

৯৭। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী'—কালান্তর ১০.১.৯৭—কলকাতা।

৯৮। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী', আন্দোলনের সম্ভাবনা ও প্রস্তুতি'—কালান্তর ১৩.১.৯৭—কলকাতা।

৯৯। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী, দ্বিতীয় স্তর, পুঁজভাঙা'—কালান্তর ১৪.১.৯৭—কলকাতা।

১০০। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'কমিউনিস্ট পার্টি সুপ্রীম কোর্ট'—কালান্তর ১৬.১.৯৭—কলকাতা।

১০১। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'পুলিশের খুনের নেশা'—কালান্তর ১৭.১.৯৭—কলকাতা।

১০২। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—' '৪৮—'৪৯ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন'—কালান্তর ৫.৪.১৯৯৭—কলকাতা।

১০৩। দাশগুপ্ত রাণী—১৯৯৭—'তেভাগা আন্দোলনের কয়েকজন কৃষক নেত্রী'—কালান্তর ৫.৪.১৯৯৭—কলকাতা।

১০৪। দাসগুপ্ত হীরেন ও অধিকারী হরিনারায়ণ—১৯৯৩—"রাজনৈতিক পটভূমিতে ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন"—স্কুল ফর ইম্যানসিপেশন—মেছেদা, মেদিনীপুর।

১০৫। দে বীণা—১৩৩৯—'পরিচয়'—এক্ষণ শারদীয় ১৩৩৯—কলকাতা।

১০৬। দেবী অনিলা—১৪০১—'যে স্মৃতি ভোলার নয়'—একসাথে বৈশাখ—১৪০১—কলকাতা।

১০৭। দেবী কানন—১৩৯৭—"সবারে আমি নমি"—এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১০৮। দেবী জ্যোতির্ময়ী—১৯৯৪—"জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন"(২য়) সম্পাদক—গৌরকিশোর ঘোষ—দে'জ পাবলিশিং—কলকাতা।

১০৯। দেবী নিরুপমা—১৪০১—"আমার জীবন"—এক্ষণ, শারদীয় ১৪০১—কলকাতা।

১১০। দেবী প্রতিমা—১৩৫৯—"স্মৃতিচিত্র"—সিগনেট প্রেস—কলকাতা।

১১১। দেবী মহাশ্বেতা (সম্পাদক)—১৯৮২—"অপরাজেয়া"—ন্যাশনাল পাবলিশার্স—কলকাতা।

১১২। দেবী শান্তা—১৯৮৩—"পূর্বস্মৃতি"—প্যাপিরাস—কলকাতা।

১১৩। দেবী সরযূবালা—১৯৮৫—'আমার ছেলেবেলা'—আনন্দবাজার পত্রিকা—২২.১২.৮৫—কলকাতা।

১১৪। দেবী সাহানা—১৩৭৭—"মৃত্যুহীন প্রাণ"—মিত্র ও ঘোষ—কলকাতা।

১১৫। দেবী সাহানা—১৩৯৭—'স্মৃতির খেয়া'—এক্ষণ—শারদীয় সংখ্যা—কলকাতা।

১১৬। দেবী হেমন্তবালা—১৯৯২—'হেমন্তবালা দেবী রচনা সংকলন', সাধারণ সম্পাদক—সুবীর রায়চৌধুরী—দে'জ পাবলিশিং—কলকাতা।

১১৭। নন্দী রমা, পৈত ভবেশ—১৯৯৭—'আমাদের সময়'—অধুনা জলার্ক—জানুয়ারি—মার্চ '৯৭—কলকাতা।

১১৮। Pal Rina—1996—"Women of Midnapore in Indian Freedom Struggle"—Ratna Prakashan—Calcutta.

১১৯। পালচৌধুরী অপর্ণা—১৯৯০—"নারী আন্দোলন : স্মৃতিকথা"—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি—কলকাতা।

১২০। পোদ্দার অববিন্দ—১৯৯৩—'ঘরের বাইরে মুক্তিযুদ্ধ ভিতরে', 'সাতদশক', আনন্দবাজার পত্রিকা—২৮ জুলাই ১৯৯৩—কলকাতা।

১২১। বন্দ্যোপাধ্যায় করুণা—১৯৯২—'আমাদের নিয়ে কাজ করেছেন'—'দেশ', বিশেষ সত্যজিৎ সংখ্যা ২৮ মার্চ—কলকাতা।

১২২। বন্দ্যোপাধ্যায় কণিকা—১৯৯৮—"আনন্দধারা"—আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১২৩। বন্দ্যোপাধ্যায় বেলা—১৪০৩—'আমার স্মৃতিতে সাতাশে এপ্রিল'—কালান্তর ১৪ বৈশাখ—কলকাতা।

১২৪। বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেশকুমার (সম্পাদক)—১৯৯৭—"স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর"—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১২৫। Banerji Sumanta—1980—*"In the wake of Naxalbari, a history of the Naxalite Movement in India."*—Subarnarekha—Calcutta.

১২৬। বসু প্রতিভা—১৪০০, ১৪০১—"জীবনের জলছবি"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১২৭। বসু সাধনা—১৯৬৩—"শিল্পীর আত্মকথা", অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থপ্রকাশ—কলকাতা।

১২৮। বাগল যোগেশচন্দ্র—১৩৬১—"জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী"—বিশ্বভারতী—কলকাতা।

১২৯। বাগল যোগেশচন্দ্র—১৩৬৭—"মুক্তির সন্ধানে ভারত"—অশোক পুস্তকালয়—কলকাতা।

১৩০। বিশ্বাস কালীপদ—১৯৬৬—"যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়"—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী—কলকাতা।

১৩১। বিশ্বাস প্রণব (সম্পাদক)—১৯৯১—"ঋক", হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণ সংখ্যা (প্রথম খণ্ড), জানুয়ারি—জুন—কলকাতা।

১৩২। বিশ্বাস বনানী—১৪০১—'মাতৃক্রোড় থেকে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল', একসাথে, বৈশাখ ১৪০১—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি—কলকাতা।

১৩৩। বেগম মালেকা—১৯৮৬, ১৯৯৭—"ইলা মিত্র"—আগামী প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩৪। বেগম মালেকা—১৯৮৫—"নারীমুক্তি আন্দোলন"—বাংলা একাডেমী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩৫। বেগম নুরুন নাহার—১৯৯২—"স্মৃতিতে ১৯৭১" —আগামী প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩৬। বেগম হামিদা—১৯৯০—"জীবনস্মৃতি"—নওরোজ কিতাবিস্তান—বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩৭। বিনোদিনী—১৩৯৪—"নটী বিনোদিনী রচনা সমগ্র", সম্পাদনা · আশুতোষ ভট্টাচার্য—সাহিত্য সংস্থা—কলকাতা।

১৩৮। ভট্টাচার্য কল্যাণী—১৯৫১—"জীবন অধ্যয়ন"—অবিনাশচন্দ্র মজুমদার—(প্রকাশক)—

১৩৯। ভট্টাচার্য জয়ন্ত—১৯৯৬—"বাংলার তেভাগা—তেভাগার সংগ্রাম"—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি—কলকাতা।

১৪০। ভট্টাচার্য প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ—১৯৮৬, ১৯৮৯—"মুক্তির সন্ধানে ভারত"—তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ—কলকাতা।

১৪১। ভট্টাচার্য প্রণতি—১৪০৪—'বাংলার তেভাগা আন্দোলনে নারী'—একসাথে—বৈশাখ ১৪০৪—কলকাতা।

১৪২। ভৌমিক তাপস, সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)—"কোরক" সাহিত্য পত্রিকা স্বাধীনতার ৫০ বছর, শারদীয় ১৪০৪—কলকাতা।

১৪৩। ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ—১৯৭৭—গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি—পশ্চিমবঙ্গ —কলকাতা।

১৪৪। মজুমদার চারু—১৯৯৭—"চারু মজুমদার রচনা সংগ্রহ"—নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী—উত্তর ২৪-পরগণা।

১৪৫। মজুমদার লীলা—১৯৮৬, ১৯৯৩—"পাকদণ্ডী"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৪৬। মজুমদার লীলা—১৩৭৪, ১৩৯৫—"আর কোনোখানে"—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড—কলকাতা।

১৪৭। মজুমদার রমেশচন্দ্র—১৯৮২—"বাংলাদেশের ইতিহাস" (১৯০৫—১৯৪৭), (চতুর্থ খণ্ড)—জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৪৮। মজুমদার স্বপন—১৯৯২—'বাঙলা ছায়াছবির নবযুগ ও সত্যজিৎ রায়'—'দেশ', বিশেষ সত্যজিৎ সংখ্যা মে—১৯৯২—কলকাতা।

১৪৯। মণ্ডল পুলকেশ, মিত্র জয়া (সম্পাদক)—১৯৯৪—"সেই দশক"—প্যাপিরাস—কলকাতা।

১৫০। মহলানবিশ নির্মলকুমারী—১৩৬৭—"বাইশে শ্রাবণ"—মিত্র ও ঘোষ—কলকাতা।

১৫১। মির্যা যোবায়দা—১৯৮৪—"সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি"—মুক্তধারা—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৫২। Mill John Stuart—1869, 1989—"*The Subjection of Women*", Cambridge University Press—Cambridge.

১৫৩। মিত্র ইলা—১৯৯৭—'আমার জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ'—চলার পথে, আগস্ট ১৯৯৭, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা—কলকাতা।

১৫৪। মিত্র জয়া—১৩৯৬—"হন্যমান"—অন্যধারা—কলকাতা।

১৫৫। মিত্র জয়া—১৯৯৭—'তোমার গানকে বোমার মতো', "যুদ্ধজয়ের গান", সম্পাদনা . স্বপন দাসাধিকারী—এবং জলার্ক—কলকাতা।

১৫৬। মিত্র তৃপ্তি—১৯৯২—"তৃপ্তি মিত্র"—শূদ্রক—কলকাতা।

১৫৭। মিত্র শাঁওলী—১৯৯২—"দিদৃক্ষা"—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৫৮। মিত্র সুচিত্রা—১৯৯৫, ১৯৯৭—"মনে রেখো"—আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৫৯। মিত্র সুচিত্রা—১৯৯১—"পঞ্চাশ বছরের সঙ্গীত জীবন", ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন ও সাউন্ড উইং রেকর্ড কোম্পানি আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশ—ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন—কলকাতা।

১৬০। মুখোপাধ্যায় কনক—১৯৯৩—"নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা"—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৬১। মুখোপাধ্যায় কমলা—১৯৯৫—'১৯২৯-৩১ সাল—কিছু স্মৃতি'—চতুষ্পর্ণী, বর্তমান ২১ জানুয়ারি '৯৫—কলকাতা।

১৬২। মুখোপাধ্যায় কমলা—১৯৯৭—'স্বাধীনতার ৫০ বছর : কী আশা করতে পারে দেশবাসী?'—চতুষ্পর্ণী বর্তমান ৯ আগস্ট '৯৭—কলকাতা।

১৬৩। মুখোপাধ্যায় কমলা—১৯৯৮—'ভারত ছাড় আন্দোলনে মেয়েরা'—চতুষ্পর্ণী—বর্তমান ৮ আগস্ট ১৯৯৮—কলকাতা।

১৬৪। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার—১৯৬৫—"ভারতে জাতীয় আন্দোলন"—গ্রন্থম্—কলকাতা।

১৬৫। মুখোপাধ্যায় মাধবী—১৯৯২—'সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে মাধবী মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার'—নন্দন জুলাই ১৯৯২—কলকাতা।

১৬৬। মুর্শিদ গোলাম—১৯৮৫—"সংকোচের বিহ্বলতা"—বাংলা একাডেমী, —ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬৭। Murshid Ghulam—1983—"*Reluctant Debutante* : Response of Bengali Women to Modernization 1849—1905"—Sahitya Sansad, Rajshahi.

১৬৮। মৈত্র জ্ঞানেশ—১৯৮৭—"নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য"—ন্যাশনাল পাবলিশার্স—কলকাতা।

১৬৯। রায় অমিত (সংকলক)—১৯৮৯, ১৯৯৭—"অন্তরঙ্গ চারু মজুমদার"—র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন—কলকাতা।

১৭০। রায় বিজয়া—১৩৯৯—'নিজের কথা'—এক্ষণ শারদীয় ১৩৩৯—কলকাতা।

১৭১। রায় রুদ্র—১৯৯০—"সমাজে নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ"—পিপলস্ বুক সোসাইটি—কলকাতা।

১৭২। রায় রুমা (সংকলক ও অনুবাদক)—১৯৯১—'দীর্ঘ ১৭০ বছরেরও বেশি সময়ের ঘটনা পরম্পরায় ভারতে নারী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক'—শারদীয় বিভাব ১৯৯১—কলকাতা।

১৭৩। রায় রেবা—১৩৭১—'আনন্দ গান ও সুরের চরণ'—'দেশ' ২১ কার্তিক—১৩৭১—কলকাতা।

১৭৪। রায় রেণুকা—১৯৯৪—"স্মৃতিকথা", অনুবাদ—অশোক মিত্র—উত্থক প্রকাশনী—কলকাতা।

১৭৫। রায় হীরেন্দ্রকুমার—১৯৯৩—'গণনাট্যে অভিনেত্রীর মর্যাদা'—গ্রুপ থিয়েটার ১৫ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা—কলকাতা।

১৭৬। লতিফ নূরহাসনা—১৯৯০—"পাকিস্তানে আটক দিনগুলি"—আগামী প্রকাশনী—ঢাকা—বাংলাদেশ

১৭৭। লাহিড়ী অঞ্জলি—১৯৯১—'আমাদের হেমাঙ্গদা'—"ঋক", হেমাঙ্গ বিশ্বাস—স্মরণ সংখ্যা—জানুয়ারি-জুন ১৯৯১—কলকাতা।

১৭৮। শঙ্কর মমতা—১৯৯২—'আমার দেখা সত্যজিৎ রায়'—নন্দন জুলাই '৯২—কলকাতা।

১৭৯। শেখ হাসিনা—১৯৯৩—'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম'—আগামী প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৮০। শর্মা ইরা—১৪০১—'কিছু স্মৃতি কিছু কথা'—একসাথে, বৈশাখ ১৪০১—কলকাতা।

১৮১। শর্মা সাগরিকা—১৪০২, ১৪০৩, ১৪০৪, ১৪০৫—'পূর্বাচলের পানে তাকাই' -'রূপান্বয়' পত্রিকা—কলকাতা।

১৮২। শফী (বেগম) মুশতারী—১৯৮৯—"স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন"—অনুপম প্রকাশনী—ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৮৩। সরকার নির্ঝরিনী—১৯৯১—"রচনা সংগ্রহ", সম্পাদনা : চিত্রা দেব—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৮৪। সরকার পবিত্র—১৩৯২—"ভাষা দেশ কাল"—জি. এ. ই. পাবলিশার্স—কলকাতা।

১৮৫। সরকার শিপ্রা—১৯৯৩—'অস্থিরতায় দিন এল'—আনন্দবাজার পত্রিকা,—২১ জুলাই ১৯৯৩—কলকাতা।

১৮৬। সরকার সরলাবালা—১৯৮৯—"সরলাবালা রচনা সংগ্রহ"—আনন্দ পাবলিশার্স—কলকাতা।

১৮৭। সফিউন্নিসা—১৯৯৫—'সারাজীবন সবাইকে ভালবেসে চলে গেলেন ইন্দুসুধা ঘোষ'—বর্তমান, চতুষ্পর্ণী, ১৪ অক্টোবর '৯৫—কলকাতা।

১৮৮। সিংহ স্বপন (সম্পাদক)—১৯৯৪—"বন্দী নারী"—লোকোন্নয়ন—দক্ষিণ ২৪-পরগণা।

১৮৯। সেন অপর্ণা—১৯৯২—'পুরনো আলাপ'—সানন্দা ১৫ মে '৯২—কলকাতা।

১৯০। সেন অমিতা—১৯৭৯—"শান্তিনিকেতনে আশ্রম কন্যা"—টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট—কলকাতা।

১৯১। সেন অমিতা—১৯৮১—"আনন্দ সর্বকাজে"—টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট—কলকাতা।

১৯২। সেন আশালতা—১৯৯০—"সেকালের কথা"—ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৯৩। সেন কল্পনা—১৯৯১—'পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা'—বিভাব অক্টোবর '৯১—কলকাতা।

১৯৪। সেন মমতা—১৪০১—'হারানো দিনগুলি'—একসাথে বৈশাখ ১৪০১—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি—কলকাতা।

১৯৫। সেন মণিকুন্তলা—১৯৮২—'সেদিনের কথা'—নবপত্র প্রকাশন—কলকাতা।

১৯৬। সেন মীনাক্ষী—১৯৯৭—'নকশাল দমনে পুলিশ কি করেছে : একটি দালল —প্রতিক্ষণ

১৯৭। সেন মীনাক্ষী—১৯৯৩—"জেলের ভেতর জেল, পাগলবাড়ি পর্ব" স্পন্দন—কলকাতা।

১৯৮। সেন মীনাক্ষী—১৯৯৪—"জেলের ভেতর জেল, হাজতি নম্বর মেয়াদি নম্বর"—প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

১৯৯। সেন শোভা—১৯৯৩—"স্মরণে বিস্মরণে নবান্ন থেকে লালদুর্গ"—এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড—কলকাতা।

২০০। সেনগুপ্ত অমলেন্দু—১৯৮৯—"উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব"—পার্ল পাবলিশার্স—কলকাতা।

২০১। সেনগুপ্ত অমলেন্দু—১৯৯৭—"জোয়ার ভাটায় ষাট সত্তর"—পার্ল পাবলিশার্স—কলকাতা।

২০২। সেনগুপ্ত কিরণশঙ্কর, সরকার পবিত্র (সম্পাদক)—১৯৯১—"আগুনের অক্ষর : সোমেন চন্দ"—সোমেন চন্দ ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি—কলকাতা।

২০৩। সেনগুপ্ত দেবাশিস (সম্পাদক)—১৯৯৭—"প্রগতির পথিকেরা ১৯৩৬—১৯৫০"—একুশে সংসদ—কলকাতা।

২০৪। সেন বসু কমল—১৪০৪—'পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা', একসাথে—বৈশাখ—পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি—কলকাতা।

২০৫। হোসেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত—১৯৭৩, ১৯৮৪—"রোকেয়া-রচনাবলী"—বাংলা একাডেমী—ঢাকা—বাংলাদেশ।

যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি

			সাক্ষাৎকারের তারিখ
১।	অপরাজিতা গোপ্পী	:	১৮.৪.৯৮
২।	ইলা মিত্র	:	২১.৫.৯৮
৩।	কৃষ্ণা রায়	:	১৩.৮.৯৩
৪।	গীতা মুখোপাধ্যায়	:	২৭.৪.৯৮
৫।	বিদ্যা মুন্সী	:	১.৬.৯৮
৬।	মৃণালিনী দাশগুপ্ত	:	৩১.১২.৯৭, ৬.৬.৯৮
৭।	জয়া মিত্র	:	১৭.৯.৯৮